মানুষের রহস্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

কলিকাতা
পুস্তকালয়
লিমিটেড

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

মানুষের রহস্য

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড থেকে শ্রীমণীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরুণ দাস ছবি একেছেন। ৬৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের শ্রীকালী প্রেস থেকে শ্রীপরমানন্দ সিংহরায় ছেপেছেন। বই বাধিয়াছেন বীরেন এণ্ড কোং।

মূল্য পাঁচটাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন

জগৎ সংসার জুড়ে চলেছে মানুষের জীবনের অন্তহীন কলরব। মানুষ সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলেছে, এক ভাঙছে আবেক নূতন ক'রে গড়ছে; জীবনযাত্রাকে সহজ সুন্দর সমৃদ্ধ করার কামনায় তার সকল চেষ্টা নিয়োজিত। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, ধর্ম বিশ্বপ্রেম—সবই তার জীবনের জয়যাত্রার প্রতীক। আজকের মানুষের বিচিত্র উপকরণসমৃদ্ধ জীবনের দিকে তাকিয়ে একথা চিন্তা করতেও অদ্ভুত মনে হয় যে, এক সময়ে মানুষ অরণ্যচারী পশুর মতই জীবন যাপন করত উন্মুক্ত আকাশের তলে, বৃক্ষশাখায়, পাহাড়পর্বতের অন্ধকার গুহায়। অদ্ভুত মনে হলেও একথা সত্য।

মানুষের অগ্রগতির কাহিনী বিস্ময়কর সন্দেহ নাই কিন্তু তার চেয়েও বেশী বিস্ময়কর মানুষের মন। মন দিয়ে তার খেলার অন্ত নাই। মনের ভিতর যে কামনা-বাসনার আলোড়ন জাগছে অহরহ, তাকে মানুষ কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, কিভাবে প্রকাশ করে, কিভাবে তার দ্বারা চালিত হয় তা বুঝলে মানুষের সকল আচরণের অর্থ পাওয়া যাবে। মানুষের মনের খবর না রাখলে তার সম্বন্ধে কোন খবরই রাখা হল না। আমরা এই বইখানিতে যথাসম্ভব সহজ সরল ভাষায় মানুষের মনের এই বিচিত্র দিকটির আলোচনা করেছি। শিশু কিভাবে শৈশব, বাল্য, কৈশোর পার হয়ে বিভিন্ন মানসিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বয়স্ক ব্যক্তিসত্তা লাভ করে তাও দেখান হয়েছে।

দিনের পর দিন শিশু কিভাবে আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে ওঠে, কিভাবে বিভিন্ন বয়সে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তা পর্যবেক্ষণের ফল এই পুস্তকে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যাপারে যিনি সোৎসাহে প্রেরণা জাগিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই তাঁর নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

এই পুস্তকের কিছু কিছু অংশ 'প্রবাসী', 'দেশ' ও 'শিক্ষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝে মাঝে গুণগ্রাহী পাঠক ও অভিভাবকবর্গের নিকট থেকে এ ধরণের বই লেখার তাগিদ পেয়েছিলাম কিন্তু কলিকাতা পুস্তকালয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টার সোদরতুল্য শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর ঐকান্তিক আগ্রহ ব্যতীত এত শীঘ্র এ বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

আমার সহকর্মী সুহৃদ শ্রীপার্বতীকুমার রায়পালধি, বি. এ, বি. টি এই পুস্তক রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ও মুদ্রণ ভ্রমসংশোধন ব্যাপারে সাহায্য করেছেন এবং শ্রীআশুরঞ্জন ভট্টাচার্য, বি. এ, বি. টি পুস্তকখানির বিষয়সূচী প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পুস্তকখানি নিভুল ক'রে ছেপে বের করার কামনা করেছিলাম কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও বিলাতী বইএর মত নিখুঁত ক'রে ছাপানো সম্ভব হয়নি, সামান্য কিছু ছাপার ভুল র'য়ে গেছে। তবে তা মারাত্মক নয়।

যাঁরা নিজের মন জানতে চান এবং তার আলোকে অপরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে চান তাঁরা এ বইতে আনন্দের উপকরণ পাবেন ব'লে বিশ্বাস করি। এ বইয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুধীজনের প্রস্তাব ও উপদেশ সাদরে গৃহীত হবে।

টাকী গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল
আশ্বিন, ১৩৬০

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

পূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চন্দ

শ্রীচরণেষু

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সেক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো॥
তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি' নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমিষেই মনে হোলো মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম॥

—রবীন্দ্রনাথ

There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.

—Charles Darwin *Origin of Species*

সৃষ্টির রহস্য

আমাদের বাসভূমি বসুন্ধরার যে রূপ আজ আমরা দেখতে পাই, চিরদিন এমনটি ছিল না। লক্ষকোটি জীব বক্ষে নিয়ে, তরুলতা ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে পৃথিবী এখন স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিতা কিন্তু এর বাল্যরূপ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। সূর্য থেকে পৃথিবীর জন্ম। সূর্যের অগ্নিময় দেহ থেকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে এসে সূর্য-নন্দিনী মহাশূন্যে আবর্তন করতে করতে তার পিতৃদেবকে প্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে; এরূপ প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া চলেছে কোটি কোটি বছর ধ'রে। ভূ-তত্ত্ববিদ্ বলেন প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল একটি আগুনের গোলক; এই অগ্নিময় যুগ চলেছিল অনেক কাল। বাইরের অগ্নি কিছুটা প্রশমিত হলে পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত হ'য়ে ভূস্তর গঠিত হল, আর তাকে ঘিরে যে বাষ্প ও গ্যাস মহাশূন্যে বিরাজ করছিল, তা পরিণত হল জলে। পৃথিবী তখন প্রলয়-পয়োধি-জলে আবৃত; চারিদিকে কেবল জল আর জল। অভ্যন্তরের আলোড়নের ফলে ক্রমে ধীরে ধীরে এখানে সেখানে উঁচু হয়ে পাহাড় মাথা তুলতে লাগল; জল গেল এদিক ওদিকে স'রে। তখনকার দিনে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অগ্নি আর গ্যাসের যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তার ফলে মাটি ফেটে আগুন ও ভিতরকার গলিত পদার্থের নির্গমন হত প্রায়ই। আগুন নিয়ে খেলার এই যুগে পৃথিবীর কোথাও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর ছিল না।

সৃষ্টির মধ্যে প্রাণের প্রথম প্রকাশ কোথায় কিভাবে হয়েছিল তা কেউ জানে না। তবে ইহা সত্য যে, সৃষ্টির লীলায় প্রাণের প্রথম আবির্ভাব অত্যন্ত সরল হলেও একেবারে আকস্মিক নয়। জীবতত্ত্ববিদ বলেন, জীবনের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল জলে। প্রথম জীব আমাদের জানা-শোনা জীবের মত ছিল না; তা ছিল অত্যন্ত সরল এককোষবিশিষ্ট জীব, চোখমুখ নাক কান তার ছিল না। কিন্তু এই এক কোষ-ওয়ালা জীব কিভাবে বহুকোষযুক্ত প্রাণীতে পরিণত হ'য়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলল তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। জলের মধ্যে শ্যাওলার মত ক্ষুদ্র একটি কণিকার মত পদার্থ অবলম্বন ক'রে প্রাণের সূত্রপাত হল পৃথিবীতে। ক্রমিক

বিবর্তনের পথে এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু তৃণ, তরুলতায় পরিণত হ'য়ে ভূভাগ শ্যামল আস্তরণে ঢেকে দিল; প্রাণ-প্রবাহই জলচর, স্থলচর, খেচর প্রাণীর ভিতর দিয়ে জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলল; বসুমতী হলেন জীবধাত্রী জননী।

একটি বালিকা যখন কাদামাটি দিয়ে পুতুল গড়তে সুরু করে তখন প্রথম প্রথম তার পুতুলগুলি হয় কিন্তূতকিমাকার। এদের দেহের গড়নের পারিপাট্য থাকে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য থাকে না। খেয়ালের বশে সে পুতুল গড়ে আর ভাঙে। ক্রমে পুতুল তৈরিতে তার নিপুণতা আসে; তার সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। প্রকৃতির রাজ্যে জীবসৃষ্টির পুতুল খেলাতেও এমনি ভাঙাগড়া চলেছিল বহু যুগ ধ'রে। সৃষ্টির আদিপর্বে প্রকৃতির কাঁচা হাতে-গড়া জীবজন্তুর চেহারা ছিল এমনি অদ্ভুত। তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুসমঞ্জস ছিল না। তাদের দেহ ছিল বিশাল কিন্তু সে অনুপাতে মস্তিক ছিল নিতান্ত কম। জীবন-সংগ্রামে তারা টিকতে পারেনি। কিন্তু একবার ক্ষুদ্র একটি জীবকোষ অবলম্বন ক'রে যে প্রাণ আবির্ভূত হয়েছে সৃষ্টির মধ্যে, প্রাণীর জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার দরুণ তা লোপ পায়নি। অদৃশ্য কোন শক্তির বলে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এই জীবন-প্রবাহ জয়ী হয়ে এসেছে; এর জন্য জীবজন্তুকে যে কত রকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। কত জীব ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, কত প্রাণীর দেহাকৃতি এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, তার পূর্ব পুরুষের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে প্রাণ-লীলার এরূপ বিস্ময়কর প্রকাশ হয়েছে কিনা বিজ্ঞানী তা বলতে পারেন না। তবে আমাদের চতুর্দিকে তৃণে, লতায়, কীটে, পতঙ্গে প্রাণিজগতে, এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র এই যে বিচিত্র প্রাণের স্পন্দন চলেছে এ সবই যে অতি সামান্য একটি সূত্র থেকে ক্রমে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে তা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত না হ'য়ে পারা যায় না। চিন্তাশীল লোকের মনে কতকগুলি প্রশ্ন ভীড় ক'রে আসে—অগ্নিময় ধাতুপিণ্ড এই পৃথিবীর বাইরেকার উত্তাপ শীতল হ'লে কখন এবং কিভাবে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হল? একি সম্পূর্ণ আকস্মিক, না এর মধ্যে কোন অদৃশ্য মহাশক্তির পরিকল্পনা আছে? অতি ক্ষুদ্র সামান্য একটি বস্তুকে অবলম্বন ক'রে জীবনের প্রথম স্পন্দন জেগেছিল এই পৃথিবীর বুকে; তার মধ্যে এমন অপরিসীম

শক্তি কে সঞ্চার করল যার বলে কালক্রমে তা পৃথিবীকে অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত ক'রে বিচিত্র জীবন-লীলার নিকেতন ক'রে তুলল ?

এই ধরণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। বিভিন্ন দেশের পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থে এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কাহিনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক যুগের মানুষ এগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেনি। বৈজ্ঞানিকগণ ভূপৃষ্ঠ থেকে, প্রকৃতির মধ্য থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ ক'রে পৃথিবীর অতীত যুগের কাহিনী গ'ড়ে তুলছেন। এ কাহিনী কাল্পনিক নয়। পৃথিবীর উৎপত্তিকাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নানাপ্রকার জীবজন্তু ও গাছপালার যে প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ পাওয়া গেছে মাটির স্তরের মধ্যে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে ধরণের জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেখি তা কারো ইঙ্গিতে বা নির্মাণ-কৌশলে একদিনেই তৈরি হয়নি ; বহুলক্ষ বছরের জীবন-সংগ্রাম ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এরা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। সুদূর অতীত থেকে যে প্রাণি-জগৎ বিনাশ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভিতর দিয়ে সীমাহীন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে তার চমকপ্রদ অভিযানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি মূল তথ্য নজরে পড়ে। এর মধ্যে প্রধান হ'ল জীবনের দুর্জ্জেয় এবং অপরাজেয় শক্তি যা আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তার সাধনের জন্য একান্ত ব্যাকুল ; দ্বিতীয় হ'ল এই উদ্দেশ্য অর্থাৎ আত্মবিস্তার সাধনের জন্য জীবের আকৃতির ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন সাধনের ক্ষমতা ; তৃতীয় হল প্রকৃতির গোঁড়ামি বা সংরক্ষণশীলতা। কোন উদ্ভিদ বা প্রাণী সহসা তাদের বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে না ; এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের মজ্জায় মিশে। উদ্ভিদ ও জীবকূল বংশবিস্তারের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা করে।

'চেষ্টা করে' কথাটি এখানে প্রয়োগ করা চলে কিনা আলোচনা করা যাক্। সাধারণতঃ ইচ্ছা-চালিত প্রয়াসকে আমরা চেষ্টা ব'লে থাকি। ইচ্ছা মনের একটি শক্তি। কাজেই জীবজন্তু এমন কি উদ্ভিদেরও আত্মবিস্তারের চেষ্টা আছে বললে তাদেরও ইচ্ছাশক্তি এবং মন আছে ধ'রে নিতে হয়। কিন্তু সর্বোচ্চস্তরের প্রাণী মানুষ ছাড়া প্রাণি-জগতে অন্য কারো যে মন আছে বা মনন শক্তি আছে তা স্বীকৃত হয়নি। অথচ দেখা যায় প্রকৃতির রাজ্যে কীটপতঙ্গ থেকে সুরু ক'রে তরুলতা পর্যন্ত সবকিছুর মধ্যেই বংশবিস্তারের

প্রয়াস নানা ভাবে প্রকাশ পায় ও সার্থকতা লাভ করে। এই প্রয়াসের মূলে কি কোন সজ্ঞান বাসনা অলক্ষ্যে বিরাজ করে ? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে এইটুকু বলা যায়, উদ্ভিদ ও জীবজগতে এক দুর্নিবার প্রেরণা সর্বদা অত্যন্ত প্রবলভাবে সক্রিয় রয়েছে, যার ফলে যেন কোন অন্ধ আবেগের বশবর্তী হ'য়ে বৃক্ষ ফুলফল বিকাশ ক'রে তার মাধ্যমে আত্মবিস্তার করতে চায় ; পশুপক্ষী সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির পরিকল্পনাকে সার্থক করে।

উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের বংশ বিস্তার করার অন্তরালে একটি প্রবল কামনা সর্বদা জাগরূক রয়েছে। কবির ভাষায় প্রকৃতির সবকিছুর অন্তরেই যেন এই কথা ধ্বনিত হচ্ছে ঃ

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

এই পৃথিবী থেকে কেউ চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে যেতে চায় না ; সবাই চায় বাঁচতে, চিরজীবী হ'তে। কিন্তু দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই ফল ও সন্তানের ভিতর দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীসকল যেন নব নব জীবন ধারণ ক'রে নিজেদের বিস্তার ক'রে চলেছে। এই কাজে প্রকৃতির মধ্যে যে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় তা একান্ত বিস্ময়কর। বীজের মধ্যে গাছ তার সকল বৈশিষ্ট্য নিহিত ক'রে রাখে। উপযুক্ত জলমাটি পেলে বীজের ভিতরকার ঘুমন্ত বৃক্ষশিশুটি তার বংশের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হ'য়ে ওঠে। অশ্বত্থবীজ দেখতে ছোট কিন্তু এর ভিতরই মহান বনস্পতির সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে ; বিভিন্ন ফলের বীজের ভিতর তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য—গাছের আকৃতি, ফলের রঙ, গন্ধ, স্বাদ সবকিছু—বিরাজ করছে। প্রাণিজগতেও চলেছে এমনিভাবে সন্তান সন্ততির ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকার অন্তহীন প্রয়াস ; এমনি ধারাতেই জীবের বংশগত স্বভাব সন্তানে সঞ্চালিত হচ্ছে। কোকিলের ডিম কাক তা' দিয়ে ফুটিয়ে শাবক উৎপাদন করে, নিজের বাচ্চাদের সঙ্গে একই প্রকার খাদ্য দিয়ে পুষ্টকরে কিন্তু কণ্ঠ স্বরে ও স্বভাবে কোকিল-শাবক কোকিল হয়েই বেড়ে ওঠে, কাক হয় না।

* * *

ডারুইন প্রাণিজগতে সৃষ্টিলীলার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে তাঁর 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থে সর্বশেষ যে মন্তব্য করেছেন তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি ঃ

'জলাশয়ের তীর, নানাজাতীয় গাছপালায় ঢাকা ; ঝোপেঝাড়ে পাখীরা গান করছে ; নানাজাতীয় কীটপতঙ্গ চলাফেরা করছে, স্যাঁতসেতে মাটিতে কিল্‌বিল্ ক'রে চলেছে—এরূপ একটি চিত্র মানস চক্ষুর সম্মুখে রেখে যদি চিন্তা করা যায় যে, এসব বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট তরুলতা, প্রাণিকুল পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং আমাদের চারিদিকে যে নিয়ম কাজ ক'রে চলেছে তারই ফলে এদের উৎপত্তি হয়েছে তবে খুবই অদ্ভুত লাগবে সন্দেহ নাই। যে নিয়ম বা সূত্র অবলম্বন ক'রে বিচিত্র সৃষ্টিলীলা চলেছে তা হ'ল—উৎপাদন ও বংশবৃদ্ধি, বংশগতি বা বংশের ধারাবহন, জীবনের পথে চলতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন, অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধি ও টিকে' থাকার জন্য সংগ্রাম ; এর ফলে চলেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন, উন্নততর জীবের আবির্ভাব, ধরাপৃষ্ঠ থেকে দুর্বলের বিলোপ। এইভাবে প্রকৃতির রাজ্যে সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর ভিতর দিয়েই উচ্চস্তরের প্রাণীর ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের এই পৃথিবীগ্রহ মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে মহাশূন্যে ছন্দে ছন্দে আবর্তন ক'রে চলেছে, আর বিশ্বস্রষ্টা প্রথমে অল্প কয়েকটির মধ্যে কিম্বা মাত্র একটির মধ্যে যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন তাই বহুধা বিভক্ত এবং বহুবিচিত্র হ'য়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে ; কত বিচিত্র উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর উদ্ভব হয়েছে এবং এখনো চলেছে সৃষ্টির কাজে। পৃথিবীতে জীবন বিকাশের এই ধারাটি মহিমান্বিত।'

জীবন-প্রবাহের উৎস সন্ধানে গিয়ে আমরা এক প্রাণবিন্দুর গঙ্গোত্রীক্ষেত্রে উপনীত হই। সেখান থেকে প্রাণপ্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হ'য়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সজীব যাবতীয় কিছুই মানুষের শরিক, কেননা সকলেরই আদিপুরুষ এক। সকলের ভিতরেই জীবন বিকাশের বিপুল অন্ধ আবেগ বর্তমান। মানুষের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম নাই। প্রাণিজগতে নিম্নস্তরের জীবের সন্তানে আর তার জনকে বিশেষ পার্থক্য নজরে পড়ে না ; আকৃতিতে এবং স্বভাবে সন্তানকে জনকজননী থেকে অভিন্ন ব'লে মনে হয়। এই দৈহিক আকৃতি ও স্বভাবগত সাদৃশ্য নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে যেমন দেখা যায়, মানুষের ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। মানব-সন্তান দেহাকৃতিতে প্রায়ই হুবহু পিতামাতার মত হয় না ; তার বুদ্ধি, মননশক্তি, কণ্ঠস্বর, সাধারণ স্বভাব—এতেও কত প্রভেদ। প্রকৃতি যেন জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে অফুরন্ত বৈচিত্র্য ঢেলে দিয়েছে। তবে একটু লক্ষ্য করলেই

দেখা যায়, এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে অনেকগুলি মূলগত ঐক্য। ফল্গুর অন্তঃশীলা প্রবাহের মত সকল মানুষের অন্তরেই প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে সহজাত প্রবৃত্তি ও হৃদয়াবেগ। কারো অন্তরে এর বেগ প্রবল, কারো অন্তরে বা কিছুটা মন্দীভূত। মানুষের মনের গহনে ভাবের যে আলোড়ন ও নিত্যস্ফুরিত নীরব কলরব চলেছে, তা যেমন জটিল তেমনি বিস্ময়কর। মনের রহস্যময়তার দিক দিয়ে মানুষ অন্য সকল প্রাণীকে পিছনে ফেলে বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে গেছে। মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে এই জটিলতা নাই। দেহাতিরিক্ত যে শক্তির বলে মানুষ অন্য সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে,—যেমন মন, বুদ্ধি, বিবেক, মনের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি—তা কি ভাবে মানবশিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে এবং তার ফলে কিভাবে ক্ষুদ্র মানবশিশু শৈশব, বাল্য কৈশোর অতিক্রম ক'রে বয়স্ক ব্যক্তিসত্ত্বা লাভ করে সে কাহিনী অভিনব এবং রহস্যময়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা মানুষের এই বিচিত্র কাহিনী নিয়ে আলোচনা করব।

মানবদেহ

মানুষের দেহযন্ত্রটি বড়ই অদ্ভুত ও বিচিত্র ; অত্যন্ত জটিল অথচ অত্যন্ত সরল। অঙ্গের গঠনই বা কি সুন্দর! প্রতিটি অঙ্গ পৃথক পৃথক ক'রেই দেখা যাক্ কিম্বা দেহটিকে সমগ্রভাবেই দেখা যাক এর মধ্যে কার্যকারিতা ও সৌন্দর্যের মিলন সুস্পষ্ট—যেন কারুশিল্পের সঙ্গে চারুশিল্পের সমন্বয় ঘটেছে। যেখানে ঠিক যে অঙ্গটি থাকলে এবং যেরূপ আকার হলে ভাল হত, সেখানেই ঠিক সেটি রয়েছে এবং তার আকারও হয়েছে প্রয়োজনের উপযোগী। মনে হয় কোন শিল্পী কারিকর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অতিশয় যত্ন ও নিপুণতার সঙ্গে তৈরি করেছেন মানুষের দেহ। কোন কোন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে ভগবান নিজের দেহের গড়ন অনুযায়ী গড়েছেন মানবদেহ। বিজ্ঞানী প্রমাণ দিয়ে বলেন, মানুষ পূর্ণরূপ ধারণ ক'রে একদিনে ভগবানের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেনি ; তার বর্তমান আকার পেতে তাকে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে কত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ; প্রকৃতি—তাকে ভগবানই বলো আর আদ্যাশক্তিই বলো—মানুষকে জীবনযুদ্ধে জয়ী ক'রে এনেছে তার যে অঙ্গের যেরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন তাই সাধন ক'রে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিটি অংশ তাই কাজের তাগিদে গঠিত, এদের আকারও নির্দিষ্ট হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই।

দেহের গঠনকৌশল ও ক্রিয়াপদ্ধতি বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা দেহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে তাদের স্বরূপ জানবার চেষ্টা করতে পারি, যেমন দেহের কাঠামো, দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রসমূহ, দেহের বাইরেকার আবরণ।

কাঠামো ঃ

সম্পূর্ণ দেহগঠনে ছোট বড় মাঝারি দুশো ছয়খানা অস্থি রয়েছে। এদের আকৃতি সকলের এক রকম নয়। অস্থি দেহকে করেছে দৃঢ়, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে ও চলতে ফিরতে সক্ষম। টুকরা অংশগুলি জোড়া দিয়ে সংবদ্ধ করায় দেহ হয়েছে নমনীয় ; এরূপ না হ'লে মানুষের চলাফেরা সম্ভব হ'ত না।

অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি ঃ

দেহের ভিতরকার যন্ত্রসমূহ কাঠামো দিয়ে এমনভাবে সুরক্ষিত যাতে হঠাৎ সহজে এদের কোন ক্ষতি হতে না পারে। দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রগুলি নিয়ত কার্যশীল রয়েছে ; এক মুহূর্তের জন্য এদের বিশ্রাম নাই ; এরা যেন একটি জটিল নিখুঁত কারখানার স্বয়ংক্রিয় অংশ—প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ কাজ ক'রে চলেছে যার ফলে মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছে। মানুষকে যদি চেষ্টা ক'রে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হ'ত তবে তার বাঁচা হ'ত না। খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক ক'রে তা থেকে খাদ্যসার গ্রহণ করার জন্য যদি আমাদের সচেষ্ট থাকতে হ'ত তবে সে ঝকমারি সহ্য ক'রে কয়জন বেঁচে থাকত ?

প্রকৃতি মানুষকে এই ঝকমারির হাত থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। মানুষের দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের জন্য তাকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতে হয় না ; পুষ্টির উপাদানটুকু দেহের কারখানায় পেঁাছে দিয়েই সে খালাস। ভিতরের যন্ত্রগুলো গোপনে এবং সুশৃঙ্খলভাবে তা দিয়ে গড়ে তুলছে দেহ, কার্যক্ষম রাখছে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যতদিন মানুষ পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী থাকে ততদিন সে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্র সম্পর্কে কোন খেয়ালখবরই রাখে না।

স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করবার বিষয়। মানুষ ইচ্ছা করলেই এর বৃদ্ধি রোধ করতে পারে না, বা বৃদ্ধির বেগ বাড়িয়ে দিতে পারে না ; একটি ছোট্ট শিশু যখন বেড়ে উঠতে থাকে, তখন তার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পুষ্ট হ'তে থাকে সমভাবে এবং দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পা দুটি ঠিক সমান দীর্ঘ ও পুষ্ট হয়, হাত দুটির দৈর্ঘ্য বাড়ে ঠিক অনুরূপভাবে। মজার বিষয় এই যে, সব অঙ্গ একই সঙ্গে বাড়তে থাকলেও সকলের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান নয়। হাত পা যে পরিমাণে বাড়ে, নাকও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকলে নাসিকা মানুষের এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, লালাগ্রন্থি প্রভৃতি থেকে রস নির্গত হ'য়ে খাদ্য-দ্রব্যের পরিপাক ঘটায় ; থাইরয়েড ও পিটিউটারি গ্রন্থি থেকে অনুরূপভাবে রস নিঃসরণের ফলে দেহের বৃদ্ধি হয় সুসমঞ্জস। থাইরয়েড বা পিটিউটারি গ্রন্থির রস উপযুক্ত পরিমাণ থেকে কম বা বেশী হ'লে দেহের বিকৃতি ঘটে। সেটি হল প্রকৃতির কার্যে অস্বাভাবিকতা।

বহিরাবরণ ও বহিরিন্দ্রিয়

ত্বক দিয়ে সর্বদেহ ঢাকা; ত্বক থেকে অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ুতন্তু গিয়ে পৌঁছেচে মস্তিষ্কে। বাইরের যাবতীয় সাড়া এই পথে মস্তিস্কে উপনীত হয়। চোখ, কান, নাকের মাধ্যমেও মস্তিস্ক খবর সংগ্রহ করে। এগুলি যেন দেহচালকের পক্ষে বাইরের থেকে সংবাদ সংগ্রহের নিউজ এজেন্সি! মস্তিষ্কের নীরব নির্দেশেই দেহস্থ যন্ত্রগুলি সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চালায়; দেহের সর্বাঙ্গীন ও মোটামুটি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেহই করে, অন্যের ওপর নির্ভর করে না।

আত্মরক্ষার প্রেরণা প্রাণের প্রধানতম ধর্ম। গাছপালার মধ্যে এ প্রেরণা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে চলেছে; পশুপক্ষীর আচরণের মধ্যে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ চোখে পড়ে, মানুষ বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে নানা উপায় উদ্ভাবন করেছে এর সমাধানের জন্য। নিম্নস্তরের প্রাণীর জীবনে মনের প্রভাব নাই, স্থূলদেহ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়; মানুষ মনের শক্তি প্রয়োগ ক'রে দেহকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে। দেহ তখন হয় মনের লীলাভূমি। যোগী সাধক যখন দেহমধ্যস্থ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়ে তোলেন তখন দেহ হয় চিৎশক্তির আধার: এরূপ মানুষ দেহধারী হ'য়েও হয় দেহাতীত। শ্রীচৈতন্য, পরমহংসদেব, বারোদীর ব্রহ্মচারী, ত্রৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি সাধকপুরুষের জীবনে দেহাতীত এই অবস্থার পরিচয় মেলে। দেহ এদের কাছে মনপাখীর খাঁচা মাত্র; এর খোলা দরজা দিয়ে যখন খুসী বেরিয়ে যাওয়া যায়, আবার ফিরে আসা চলে; দেহ তখন মনের বশীভূত।

দেহের মধ্যে আছে আনন্দের উৎস; অঙ্গের উদ্যানে ফোটে পুলকের কুসুম; কল্পনা নিয়ে আসে অপরূপ সৌন্দর্যের সুষমা, হর্ষের শিহরণ অঙ্গে অঙ্গে যেন প্রদীপের আলোকমালা জ্বালিয়ে তোলে। এই পুলক অনুভূতির উল্লাসে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন:

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণুপরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

তারে মোহন মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন
সে যে কত রঙের রসের ধারায় কতই হল মগ্ন।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তার অকারণের হর্ষ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

ক্রমবিকাশের পর্যায়ে জীবজগতে মানুষ রয়েছে সকলের শীর্ষস্থানে। তার দেহ হয়েছে সুঠাম; দেহমধ্যস্থ যন্ত্রগুলি হয়েছে জটিল অথচ সুনিয়ন্ত্রিত। মন, বুদ্ধি, কল্পনা আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা মানুষকে এমন শক্তি দিয়েছে যা অন্য কোন জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর হয়নি। দেহাতিরিক্ত এই সকল শক্তির বলে মানুষ প্রাণিজগতে তার ঠিক পূর্ববর্তী পুরুষ থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। জীবনের এই জয়যাত্রার কাহিনী বর্ণনা ক'রে ডারুইন বলেছেন: প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে জীব ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে; দৈহিক ও মানসিক গুণসম্পদ মানুষকে যে এক সময়ে চরম পরিপূর্ণতায় নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মানবশিশুর রহস্য

সৃষ্টির আদিপর্বে যার মধ্যে প্রথম প্রাণের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছিল সে ছিল নিতান্ত সরল এককোষবিশিষ্ট প্রাণী; এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। জেলি জাতীয় সে প্রথম প্রাণবিন্দুকে প্রাণী আখ্যা দিলে বর্ণনায় অতিরঞ্জন হয় কিন্তু তাকে জীবন্ত কোন কিছু বলতেই হবে, কেননা তা থেকেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের উৎপত্তি। শুধু জীবজগৎ নয়, তরুলতা তৃণগুল্মাদি যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তিও এই ক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু থেকে। একথা চিন্তা ক'রে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাশোভিত অরণ্য, বিবিধ পুষ্পসমৃদ্ধ তরু, নানা জীবজন্তু--এক কথায় এই বৈচিত্র্যময় পরিবেশের দিকে তাকালে মনে হয়, কোন মহাযাদুকর একেবারে 'কিছুই না' থেকে এই রূপরসগন্ধভরা অপূর্ব সুন্দর বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কোন যাদুভরা কাঠির ছোঁয়ায় এক নিমিষের মধ্যে এ সব পরিবর্তন ঘটেনি; বহুলক্ষ বছরের নীরব অথচ সুশৃঙ্খল ক্রম বিবর্তনের ভিতর দিয়ে জীবকুল এসে উপস্থিত হয়েছে বর্তমান অবস্থায়। কিরূপে এই বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এইটেই হ'ল বড় প্রশ্ন। ব্যাঙ বা টিকটিকি কিরূপে বাঘ, ভালুক, গণ্ডার কিংবা জিরাফে পরিণত হল, কেমন ক'রেই বা এদের কোন শাখা বানর, বনমানুষ এবং অবশেষে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছল এই অসীম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেবে কে? লামার্ক এবং ডারুইন প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যে সকল তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন জীবতত্ত্ব আলোচনার তাই হ'ল বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

লামার্ক

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ লামার্ক বলেন, প্রাণিজগতের নিয়ম এই যে, পিতার গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য সন্তানে বর্তে; সন্তান পিতার অনুরূপ হ'য়ে গড়ে ওঠে, তবে সম্পূর্ণ তাঁর অনুরূপ হয় না—কতকটা গুণ সে নিজেও অর্জন করে। এই অর্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য সে আবার তার নিজের সন্তানে সঞ্চালিত ক'রে যায়। এইরূপে পুরুষ পরম্পরায় অর্জিত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের ফলে জীবের মধ্যে পিতৃগুণের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অবশেষে সে জীব এমন অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন অনেককাল আগেকার আদিপুরুষের সঙ্গে তার

বিশেষ কোন মিল থাকে না; তাকে তখন আদিপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র জীব ব'লে মনে হয়।

লামার্ক-তত্ত্বের মূল কথা হল দুটি ঃ প্রথম, সন্তান পিতার স্বভাব ধর্মের অধিকারী হয়; জীব যেন সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকেই নূতন ক'রে প্রচার ও প্রসার করছে। দ্বিতীয়, একপুরুষের অর্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় সূত্রটি স্বীকার করলে এ কথা মানতে হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব যে অঙ্গের বেশী ব্যবহার করে তা ক্রমে পুষ্টিলাভ করে এবং সেই অর্জিত শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সন্তানেও প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, ব্যবহারের অভাবহেতু কোন অঙ্গ ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে একেবারে লোপ পাওয়াও অসম্ভব নয়। এই যুক্তির বলে লামার্ক জীবের ক্রমপরিণতির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, রূপান্তরিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে যাওয়ার ফলে জীবকে নানারূপ চেষ্টা করতে হয়েছে। এই চেষ্টার ফলে তার দৈহিক যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তা প্রতিফলিত হয়েছে সন্তানে। এইভাবে ক্রম-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বানর যে নরে পরিণত হবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু লামার্কের এই মত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি।

ডারুইন

লামার্কের পরে ডারুইন। ডারুইন লামার্ক তত্ত্বের প্রথম সূত্রটি স্বীকার করেন। তিনিও বলেন, সন্তান পিতার স্বভাব ও গুণগুলি পায়। বৃক্ষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ যেমন বীজের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় নিহিত থাকে, জীবের বিশেষ লক্ষণ ও গুণগুলিও তেমনি সন্তান উৎপাদনকারী বীজের মধ্যে অবস্থান করে। কালক্রমে এগুলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। এ পর্যন্ত লামার্ক ও ডারুইন উভয়েই একমত। কিন্তু সন্তান যদি হুবহু পিতার অনুরূপই হ'তে থাকে, সন্তানকে যদি পিতার অপরিবর্তনীয় নূতন সংস্করণ বলা চলে, তবে জীবের ক্রমপরিণতি প্রমাণ করার উপায় কি? টিকটিকি তবে চিরদিন টিকটিকি হয়েই রইল না কেন? এ উত্তরে ডারুইন বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনই জীবের অভিব্যক্তি বা ক্রমোন্নতির কারণ। কথাটি একটু স্পষ্ট করে বলা যাক্।

এই পৃথিবীতে জলে স্থলে যত জীবজন্তু বৃক্ষ তৃণলতা রয়েছে এদের সকলের উপযোগী প্রচুর খাদ্য পৃথিবীতে নাই। বাঁচতে হ'লে একজনের পক্ষে অপরকে হত্যা ক'রে উদর পূরণ করা ছাড়া উপায় নাই। যে সবল সে দুর্বলকে ভক্ষণ ক'রে বেঁচে আছে; শুধু তাই নয়, সবলতরের আক্রমণ থেকে তাকে আত্মরক্ষাও করতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বিশ্বসংসার একটি বিরাট রণরঙ্গভূমি। এখানে প্রতি মুহূর্তে চলেছে তীব্র জীবন মরণ সংগ্রাম। প্রাণীমাত্রেরই প্রধান কামনা বেঁচে থাকা। সেই প্রেরণার বশে তাদেরকে অর্জন করতে হয়েছে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকবার উপযোগী শক্তি। এ শক্তি সকলের একরকম নয়। বাঘের ধারালো দাঁত নখ, হরিণের দ্রুত পলায়ন-ক্ষমতা, বরাহের দাঁত, মহিষের শিং, গিরগিটির দেহের রঙ পরিবর্তন ক'রে অপরকে ফাঁকি দেবার কৌশল—এ সবই জীবন সংগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। কেউ গায়ের জোরে অপরকে মেরে বেঁচে আছে; কেউ পালিয়ে আত্মরক্ষা করার উপায় গ্রহণ করেছে, কেউ বা বুদ্ধির দ্বারা পূরণ ক'রে নিয়েছে দৈহিক শক্তির অভাব। এই টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় যে অপারগ, তার বাঁচবার কোন অধিকার নাই, সে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই। যে শক্তিমান কেবল তাকেই প্রকৃতিদেবী বাঁচবার যোগ্য ব'লে নির্বাচন ক'রে নিচ্ছেন। এই হ'ল প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ডারুইন আর এক প্রকার নির্বাচনের কথা বলেছেন; তা হ'ল যৌন নির্বাচন। সন্তান উৎপাদন ক'রে বংশ বিস্তারের কামনা জীবের স্বভাব ধর্ম। বয়স্ক পুরুষজীব তার সমজাতীয় স্ত্রীজীবের সঙ্গ-কামনা করে। স্ত্রীকে লাভ করতে গিয়ে তাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয় অন্য পুরুষদের সঙ্গে। দেহের শক্তিতে সে যদি অন্য প্রতিযোগীদের পরাভূত করতে পারে তবেই সে উৎপাদনের সুযোগ লাভ করে; দুর্বল যে, প্রকৃতি তাকে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিতে নারাজ; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

স্ত্রীলাভের জন্য প্রতিযোগিতার ফলে পুরুষজীব হয়েছে বেশী শক্তিশালী তার সমজাতীয় স্ত্রীর চেয়ে, পুরুষ সিংহের কেশর অন্য প্রতিযোগীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার একটি উপায়স্বরূপ। পুরুষ পাখী নেচে' গান ক'রে, দেহের সৌষ্ঠব ও পালকের রঙের বাহার দেখিয়ে স্ত্রীর মন জয় ক'রে নিতে চায়। প্রাণিজগতে যৌননির্বাচন চলেছে সমভাবেই। পর্যবেক্ষকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বাঘিনীকে লাভ করার জন্য দুটি বাঘের মধ্যে চলে

ভয়ংকর যুদ্ধ। চরম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই থামে না, বাঘিনী অদূরে ব'সে দুই বীরের সংগ্রাম লক্ষ্য করে। যুদ্ধ একদিনে না মিটলে কয়েকদিন ধ'রে চলে। অবশেষে একটি রণে ভঙ্গ দিয়ে দাবী ছেড়ে পালায় আর না হয় প্রাণ দেয়। বাঘিনী তখন এসে আহত বিজয়ী যোদ্ধার ক্ষতস্থান লেহন ক'রে তার কাছে করে আত্মসমর্পণ। এই জয়দৃপ্ত পুরুষ হয় সন্তানের জনক।

লক্ষ লক্ষ বছর ধ'রে জীবনযুদ্ধের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করার ফলে জীব আত্মরক্ষার তাগিদে দেহের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে করতে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। এই সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি; যতদিন ধরাপৃষ্ঠে জীব আছে ততদিন চলবে। প্রশ্ন হ'তে পারে—আমরা এ পরিবর্তন দেখতে পাইনে কেন? উত্তরে বলা যায়, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানুষের পরমায়ু কত অল্প! কয়দিন সে পৃথিবীতে বাস করে? দীর্ঘকাল ধ'রে প্রকৃতি যে পরিবর্তন সাধন ক'রে চলেছে তার সঙ্গে সমান তালে চ'লে পর্যবেক্ষণ করার সময় কোথায় মানুষের? ডারুইন বলেন:

রূপক প্রয়োগ ক'রে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সর্বত্র সামান্যতম পরিবর্তনটুকুও পরখ ক'রে যাচাই ক'রে দেখছে; যা খারাপ তা বাতিল ক'রে দিয়ে যা ভাল তা টিকিয়ে রাখছে, তার পরিমাণ বাড়াচ্ছে; যখনই এবং যেখানেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তুলনায় জীবনের কিছুটা উন্নতি সাধন সম্ভবপর হচ্ছে, তা করা হচ্ছে নীরবে এবং একান্ত নিশ্চিত-ভাবে। এই ধীর পরিবর্তন আমাদের চোখের ওপরই চলেছে কিন্তু কতক যুগ পার না হওয়া পর্যন্ত এগুলি আমরা লক্ষ্য করতে পারি নে; পৃথিবীর অতীত যুগ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি এত অসম্পূর্ণ যে, আমরা কেবল এইটুকুই লক্ষ্য করি যে, আমরা যেসব জীবজন্তু দেখি অতীত যুগের জীবজন্তুর সঙ্গে তাদের চেহারার মিল নাই।

লামার্ক এবং ডারুইনের প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা মানবশিশুর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করার আগে শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, সন্তান পিতার গুণ ও স্বভাবধর্ম উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ ক'রে পূর্বপুরুষের ধারাকে বহন ক'রে চলেছে। এই গুণ বা স্বভাবধর্মের যেগুলি জীবের একান্ত মজ্জাগত সেগুলিই সন্তানে সংক্রামিত হয়; আকস্মিকভাবে অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য

পিতার নিকট থেকে সন্তান পায় না, যেমন ইঁদুরের লেজ কেটে দিলে তার বাচ্চাদের লেজ কাটা থাকে না ; আকস্মিক কারণে কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি হ'লে তার সন্তানে সে অঙ্গের বিকলতা দেখা যায় না। জীবের স্বভাবধর্ম যে বীজকণিকার মধ্যে নিহিত থাকে তা এমন সূক্ষ্ম এবং বাইরের প্রভাব থেকে এমন যত্নসহকারে রক্ষিত যে, অকস্মাৎ এতে কোন পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর নয়। প্রকৃতি দেবী এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া। জীবের বৈশিষ্ট্যগুলি তিনি যেন গোপনপুরে মণিকোঠায় শ্বেতস্তম্ভের অভ্যন্তরে হীরা-বাঁধানো কৌটার মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখেছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, একদিকে যেমন মানুষের অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ—যথা বিদ্যা, শিল্পে নিপুণতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি সন্তানে আপনা আপনি সঞ্চারিত হয় না, অন্যদিকে তেমনি গুণহীনতা বা ব্যবহারগত দোষও সন্তানকে স্পর্শ করে না। সন্তানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতি জীবের মৌলিক ধারাটিই প্রবাহিত রাখতে চান ; শুধু যে-পরিবর্তন জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন তাই সাধিত হয় ধীরে, অতি ধীরে।

ইতর প্রাণিজগতে জীবের পৈতৃক ধারাবহন সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। এখানে পিতা এবং সন্তানে বিশেষ কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না ; যাদের মধ্যে দেহবর্ণের কোন পার্থক্য নাই, সকলেরই গায়ের রঙ একই প্রকার, তাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া আরো কঠিন। সন্তান যেন পিতারই নব রূপায়ণ ; জনকই যেন সন্তানদের ভিতর নূতন ক'রে দেহধারণ করেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় এরূপ হুবহু মিল দেখা যায় না। পিতা এবং সন্তানে দৈহিক পার্থক্য ত কিছু-না-কিছু থাকেই, বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তিতেও তারতম্য দেখা যায়। কেন এমন হয় তা জানার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

মানবশিশুর স্বভাবে বৈচিত্র্য

মানুষের স্বভাবে বৈচিত্র্য দেখা যায় কেন তা বুঝতে হ'লে শিশুর জন্মের মূল রহস্যটি জানা দরকার। প্রাণিজগতে মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত জীব। অন্যান্য জীবের মত মানুষেরও রয়েছে কতকগুলি স্বাভাবিক জীবধর্ম—যেমন বাঁচবার বাসনা, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন, কামক্রোধ, প্রজনন, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের মধ্যে সাধারণ

জীবধর্ম যেমন ক্রিয়াশীল রয়েছে, তেমনি মন বুদ্ধি ও বিবেক এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছে মহত্তর কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার ক'রে। মানুষের মাঝে তাই জীব ও শিবের মিলন ঘটেছে। জীবধর্ম ত সকলের মধ্যেই বিদ্যমান; তবে ব্যক্তিগতভাবে যাঁর মধ্যে শিবধর্ম অর্থাৎ উন্নততর প্রভাব যতবেশী প্রবল তিনি তত উন্নত স্তরের মানুষ।

কাজেই দেখা যায়, জীবধর্ম অনুসারে সকল মানুষ একই প্রকার হলেও ধী-শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি, ভাবপ্রবণতা প্রভৃতির তারতম্য হেতু তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্নিহিত পার্থক্য থাকে। সন্তান তার পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকেই এই শক্তিগুলি লাভ করে। সন্তানের মধ্যে যেন দুটি স্রোতের ধারা এসে মিশেছে। এই এক একটি স্রোতে এসে পড়েছে—আবার অন্য কত স্রোত। এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানুষ তার দেহমনের উপাদান লাভ করে কত বিভিন্ন সূত্র থেকে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি কি ভাবে ধরা পড়ে দেখা যাক্।

পিতা ও মাতার দেহনিঃসৃত জার্মসেল বা জীবকোষের মিলন থেকেই শিশুর জন্ম। যে মুহূর্তে দুইটি বীজকণিকা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল তখন থেকেই সুরু হল শিশুর জীবন-লীলা। এই মুহূর্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হ'য়ে গেল: তার দেহের গড়ন কেমন হবে, হাত-পা, চোখ-মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন হবে, কি পরিমাণ মেধা, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মানসিক সম্পদের মূলধন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করবে তাও নির্ধারিত হ'য়ে গেল ঐ সময়েই। তখন হ'তে নিষিক্ত বীজকোষটি ধীরে ধীরে পুষ্ট হ'তে থাকে। পুষ্টির জন্য জরায়ু সংলগ্ন ফুলের ভিতর দিয়ে মাতৃদেহ থেকে রসগ্রহণ করলেও শিশু ভ্রূণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল নয়; বৃক্ষের একটি পরিপক্ক বীজকে কোমল, আর্দ্র, অংকুর উদগমের পক্ষে অনুকূল মাটিতে বপন করলে বীজের অভ্যন্তরস্থ ঘুমন্ত বৃক্ষশিশুটি জেগে ওঠে এবং মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ ক'রে আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বেড়ে উঠতে থাকে। মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশুও বৃক্ষশিশুর মতই। বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জলমৃত্তিকা আলোবাতাসের দাক্ষিণ্য; শিশুর পক্ষে প্রয়োজন মাতৃদেহ থেকে আহৃত পুষ্টিকর রসধারা। খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ শিশু-দেহের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হ'তে পারে, প্রতিকূলও হ'তে

পারে কিন্তু এতে তার দেহমন গঠনের মূল উপাদানে কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এখন প্রশ্ন হল: এই মূল উপাদানের স্বরূপ কি? এর ভিতরই যদি শিশুর ভবিষ্যতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে তবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে হয়ত একদিন ইচ্ছামত-গুণসম্পন্ন মানবসৃষ্টি সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করা ছাড়া মানুষের কোন উপায় নাই।

পিতা এবং মাতার দেহজাত যে-দুইটি জীবকোষের মিলনে শিশুর উৎপত্তি, তা গঠিত হয়েছে চব্বিশ জোড়া অতি মিহি সূতার মত ক্রোমোসোম দ্বারা। দুইটি জীবকোষের মিলনের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দাঁড়াল আটচল্লিশ জোড়া। প্রকৃতির অতি নিভৃত কারখানায় জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন্ দুর্জ্ঞেয় নিয়মে কে জানে, এই আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের ভিতর থেকে মুহূর্তের মধ্যে বাছাই কাজ সমাধা হ'য়ে যায়। প্রতি জোড়া থেকে একটি ক'রে ক্রোমোসোমসূত্র খসে বাতিল হ'য়ে বাদ পড়ে যায়। তার ফলে সংমিশ্রিত জীবকোষের ভিতরেও শেষ পর্যন্ত চব্বিশ জোড়া ক্রোমোসোমই ঠিক থাকে। এই সংমিশ্রিত জীবকোষটিই শিশুর দেহমন, প্রকৃতি, স্বভাব সব কিছুর মূল উপাদান। এই উপাদানের অর্ধেক আসে পিতার নিকট থেকে এবং আর অর্ধেক মায়ের নিকট থেকে পাওয়া। পিতা এবং মাতার বংশের দুইটি পৃথক ধারা এসে একত্র মিলিত হয়েছে। দুই দিক থেকে আগত চব্বিশ জোড়া ক'রে আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের বংশগতি একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে কতক বাদ দিয়ে কতক গ্রহণ করা হল। আটচল্লিশ জোড়া ক্রোমোসোমসূত্র হতে চব্বিশ জোড়া বাছাই করে নিতে গেলে লক্ষ লক্ষ রূপ ভিন্ন প্রকারে সংমিশ্রণ করা সম্ভবপর। এই সংমিশ্রণ ইচ্ছামত সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

ইহা ছাড়া জীবকোষ দুটির মিলনেও প্রতিযোগিতার ব্যাপার আছে। উপযুক্তকালে একটি ডিম্বকোষ পুরুষের স্পার্মাটোজন বা জীবকোষের মিলন প্রতীক্ষায় অবস্থান করে জরায়ুর মধ্যে। পুরুষের দেহ হ'তে একবারে লক্ষ লক্ষ জীবকোষ জরায়ুতে প্রবেশ ক'রে সাঁতার কেটে ছুটে চলে ডিম্বকোষটির দিকে। যে আগে গিয়ে রাণীকে ছুঁতে পারবে তারই জিৎ।

যেটি সবল সে বীজকোষটিই আগে গিয়ে ডিম্বকোষ স্পর্শ করে। সঙ্গে সঙ্গে সে তার উপাদান আটচল্লিশটি ক্রোমোসোমের মধ্যে চব্বিশটি ফেলে দিয়ে ডিম্বকোষে ঢুকে পড়ে; ডিম্বকোষও ঝেড়ে ফেলে দেয় তার চব্বিশটি ক্রোমোসোমসূত্র এবং মুহূর্তের মধ্যে তার উপরের আবরণটি এমন হ'য়ে যায় যে, অন্য বীজকোষগুলি, যারা দৌড়—প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'তে পারেনি, তারা ডিম্বকোষের মধ্যে আর প্রবেশ করতে পারে না। এ যেন উপকথার গল্প ঃ রাজপুরীর মধ্যে রয়েছে রাজকন্যা, তার পণ, যে দূর থেকে ছুটে গিয়ে আগে রাজপুরীর দরজায় পোঁছতে পারবে তাকেই দেবে বরমাল্য। সব রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে রাজপুরী অভিমুখে; সবল ভাগ্যবান রাজকুমার উন্মুক্ত সিংহদরজায় গিয়ে উপনীত হল সকলের আগে; ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে, ঘোড়া আর ঢাল তলোয়ার কিছু কিছু বাইরে ফেলে দিয়ে সে প্রবেশ করল রাজপুরীর ভিতরে; সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। অন্যান্য কুমারগণ পোঁছে দেখল প্রবেশের আর কোন উপায় নেই; রাজপুরীতে তখন সুরু হয়েছে নূতন জীবন গঠনের আনন্দময় উৎসব।

উপকথা ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। জীবকোষের উপাদান ক্রোমোসোমগুলির মধ্যেই মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পিতার কিছু বৈশিষ্ট্য এবং মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়েই সুরু হয় শিশুর জীবন। পিতা এবং মাতার দিক থেকে কোন্ বৈশিষ্ট্য সে পাবে বা কোন্‌টি পাবে না—তা কেউ নির্ধারণ ক'রে দিতে পারে না। এখানে দৈবই একমাত্র ভাগ্যবিধাতা।

শিশু ও বৃক্ষজাত ফল

মাতৃদেহের অভ্যন্তরে নীরবে ধীরে ধীরে সংমিশ্রিত জীবকোষটি পুষ্টিলাভ করতে থাকে। মাতৃজঠরস্থিত শিশুর বৃদ্ধি ও জন্মলাভের সঙ্গে বৃক্ষজাত ফলের ক্রমপুষ্টিলাভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। গাছে ফল ফুটলে মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ এসে জোটে মধুপান করতে। এরা এক ফুলের রেণু নিয়ে যায় অন্য ফুলে। এইভাবে পুষ্পের পুংকেশর থেকে রেণু বা পরাগ স্ত্রী-পুষ্পের গর্ভকেশরে নীত হয়। পরাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয় ফল। ফল বোঁটাতে লেগে থাকে। অবশেষে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হ'লে

ফলটি আপনা থেকেই হয় বৃন্তচ্যুত। বৃক্ষের সকল বৈশিষ্ট্য বীজের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়ে, শিশুবৃক্ষের খাদ্যস্বরূপ কিছু মূলধন ফলের মধ্যে স্থাপন ক'রে বৃক্ষ যেন নিজ সন্তানকে নূতন ক'রে বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য পাঠিয়ে দিলে। ফলের মধ্যে বৃক্ষের সন্তান ঘুমিয়ে রয়েছে।

মানবশিশুরূপে ফলটিও মাতার জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ ক'রে যথাকালে পরিপক্ক বৃন্তচ্যুত ফলের মত ভূমিষ্ঠ হয়। বৃক্ষ একাধারে ফলের পিতা ও মাতা। কারণ একই বৃক্ষে স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়; কখনও বা একই ফুলে থাকে পুংকেশর ও গর্ভকেশর। কাজেই ফলের মধ্যে কেবল একটি বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যই নিহিত থাকে। কিন্তু মানবশিশুর মধ্যে এসে মিলেছে পিতৃবৃক্ষ ও মাতৃবৃক্ষের দুইটি পৃথক ধারা। তাই শিশুর জীবনে এত বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের পরাগ-মিলনের ফলে উৎপন্ন হয় যে ফল, তা থেকে জাত বৃক্ষে দেখা দেয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য; প্রকৃতির মধ্যে এরূপে মিলন ঘটে থাকে। মানুষও ইচ্ছা করে মিলন ঘটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে।

মানুষের জীবনে দেখি একই পিতামাতার সব কটি সন্তান সব বিষয়ে একই রূপ হয় না। দেখা যায়, সন্তান হয়ত মায়ের গায়ের রঙ, পিতার মত চোখ, ঠাকুরদাদার মত দেহের গড়ন পেয়েছে। কণ্ঠস্বরে কেউ সম্পূর্ণ একপ্রকার নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তান পিতামাতার দৈহিক অবয়ব ও মানসিক গুণগুলির অধিকারী হয়। গুণের পরিমাণে অবশ্য তারতম্য থাকতে পারে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তাই দেখি সাহিত্য, সংগীত, গণিত বা চিত্রকলা প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ সকল ভাইবোনের একরকম হয় না; এ সকল আয়ত্ত করার মত মানসিক শক্তিও সকলের সমান থাকে না। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়, কবির ছেলে সাহিত্যরসে বঞ্চিত, চিত্রশিল্পীর ছেলে রঙকানা, গণিতজ্ঞের ছেলে অঙ্কশাস্ত্রে নিরেট মূর্খ। আবার ঠিক এর বিপরীত অবস্থাও বিরল নয়।

এর কারণ নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয়, শিশুর জীবন সুরু হওয়ার মুহূর্তে পিতা ও মাতার জীবকোষের ক্রোমোসোমগুলির মধ্য থেকে যে বাছাই সম্পন্ন হয় তারই উপর নির্ভর করে সবকিছু। শিশু মায়ের নিকট থেকে অর্ধেক এবং বাবার নিকট থেকে অর্ধেক মূলধন নিয়ে আরম্ভ করে তার জীবন। তার পিতামাতা উভয়েই আবার তাঁদের বাবা ও মায়ের

নিকট থেকে অর্ধেক পরিমাণ ক'রে উপাদান নিয়ে গঠন করেছিলেন নিজেদের জীবন ; তাঁরা আবার তাঁদের বাবা ও মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন অর্ধেক পরিমাণ ক'রে জীবনের উপাদান। কাজেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া উপাদনের ভিতর দিয়ে পিতামহ ও মাতামহের এক চতুর্থাংশ ও প্রপিতামহ ও প্রমাতামহের এক অষ্টমাংশ ক'রে দেহমনের উপাদান লাভ করে। এইভাবে পিতা ও মাতার দিক থেকে আগত দুইটি ধারা অবলম্বন ক'রে পূর্বপুরুষের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পিতামাতা ও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে আমরা দেহমনের উপাদান পেয়ে থাকি। এই উত্তরাধিকারকে বলা হয় বংশগতি। এখানে একটি প্রধান লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণ বা মানসিক শক্তি ও প্রবণতার অভাব থাকতে পারে কিম্বা কোন কোন গুণ এবং মানসিক শক্তি একেবারেই নাও থাকতে পারে, কিন্তু কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। এগুলিকে বলি স্বাভাবিক বা সহ-জাত প্রবৃত্তি। এগুলি মানুষের জীবধর্ম। কোন ইমারতের গঠনাকৃতি পৃথক হতে পারে, এর দেয়ালের কারুকার্যে এবং বর্ণে নূতনত্ব থাকতে পারে কিন্তু মূল উপাদান সকলেরই এক—ইট কাঠ-লোহা-পাথর। তেমনি বিভিন্ন মানুষের গায়ের রঙে পার্থক্য আছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যে ও সৌষ্ঠবে ইতরবিশেষ আছে, মানসিক শক্তির কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচুর্য্য আছে, অভিনবত্ব আছে—এ সকল বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মানুষের জীবধর্মে একের সঙ্গে অন্যের কোন পার্থক্য নাই। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ অর্থাৎ ভাবাবেগ সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে সক্রিয়। শিশুর ক্রমবিকাশের গতিপথ জানতে হলে, কিভাবে ক্ষুদ্র অসহায় মানব শিশু বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম ক'রে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় তা বুঝতে হলে সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের স্বরূপ কি তা জানা দরকার। এগুলিই মানুষের জীবন-প্রেরণার উৎস।

আমাদের আচরণের গোপন উৎস

মানুষে মানুষে চেহারার পার্থক্য আমরা চোখ মেললেই দেখতে পাই। জগতে এমন দুটি মানুষ পাওয়া ভার যারা সকল বিষয়ে হুবহু একই রকমের— আকৃতিতে, কণ্ঠস্বরে, স্বভাবে, আচরণে, মেধায়, মননশক্তিতে। চেহারায় যেমন কিছুনা-কিছু পার্থক্য, মানসিক শক্তিতে ও আচরণে তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্য। নিজের মনখানিকে নিয়ে প্রত্যেক মানুষ রচনা করেছে এক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, সেখানে সে একা। তার নিজেকেই তার কাছে মনে হয় এক অজানা বিস্ময়। তার ভিতর থেকে নানা ভাবের আলোড়ন, নানা কামনা বাসনার আবেগ জেগে উঠছে অহঃরহ। যেন নিত্য-প্রবাহী উৎস থেকে সর্বক্ষণ উৎসারিত হ'য়ে উঠছে নানা কামনার রঙে রঙিন জলধারা। কোনটি লাল, কোনটি সবুজ; কোনটি শুভ্র, কোনটি গৈরিক। এই কামনা বাসনা প্রবৃত্তির তাগিদে মানুষ প্রবৃত্ত হয় কাজে; তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে চোখের-আড়ালে-থাকা এই প্রবৃত্তি; দক্ষ বাজিকর পর্দার আড়ালে থেকে অদৃশ্য সূতা টেনে যেমন পুতুল নাচায় তেমনি। প্রবৃত্তিগুলির জোর সকল মানুষের মধ্যে সমান থাকে না। যার মধ্যে যেটি প্রবল সেটি প্রভাব বিস্তার করে তার জীবনে; আচরণে বৈচিত্র্য আসে এইজন্যই।

অনৈক্যের মাঝে ঐক্য

আচরণের বৈচিত্র্য হল বহিরঙ্গ; মানুষের জীবনের মূল প্রেরণা রয়েছে অন্তরে। আত্মরক্ষার চেষ্টা, ভয়, কৌতূহল, ক্রোধ, যৌন কামনার প্রকাশ শুধু মানুষ কেন উচ্চস্তরের প্রাণীর মধ্যেও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। মানুষের অন্তর-ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে আরো কতকগুলি ভাবের মিলন ঘটায় সৃষ্টি হয় নানা জটিলতার। এ জটিলতা মানুষের চেয়ে নিম্নতর প্রাণীর জীবনে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমরা পরে করব। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মধ্যেই একই প্রকার প্রবৃত্তি সক্রিয় রয়েছে এবং প্রবৃত্তিগুলির দৈহিক প্রকাশের রীতি একই প্রকার। আফ্রিকার নিগ্রো, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী কিম্বা যে কোন উন্নতদেশের সভ্যমানুষ—এদের দেহমধ্যস্থ যন্ত্রাদি ও গড়নের কোন পার্থক্য নাই। জীবন-প্রেরণার মূল উপাদান যে প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ তাও

এ সকলের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে একই ভঙ্গীতে। তাই যাদের ভাষা জানিনে ও সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত নই তাদেরও চোখ মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না তারা ভয় পেয়েছে, না ক্রুদ্ধ হয়েছে, না বিস্ময় প্রকাশ করছে। অন্য একজনের ভাষা বুঝি বা না বুঝি, তার মুখে হাসি দেখলে হাসির ভাব জেগে ওঠে, অট্টহাসি শুনলে অনুরূপ হাসির উদ্রেক হয়, দুঃখবেদনা দেখলে মনে জাগে ব্যথা ও সহানুভূতি। ক্রোধ, ভয়, বিরক্তি, কৌতূহল, গর্ব, উল্লাস, পরাভব, প্রীতি, সোহাগ সকল দেশের সকল জাতির মানুষ প্রকাশ করে একই ভাবে। তাদের চোখ মুখের ভাব, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গি দেখে সহজেই বোঝা যায় তাদের মানসিক অবস্থাটি। মানবজীবনের মূল উপাদানগুলির ভিতর দিয়ে মানুষে মানুষে মিল আছে বলেই একে অন্যকে বুঝতে পারে, তা সে নিজের দেশেরই হোক্ বা ভিন্ন দেশেরই হোক। তাইত এক দেশের কবি, সাহিত্যিক নিজেদের সাহিত্যে যে সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার অনুভূতিকে রূপদান করেন, যে কোন দেশের লোকের পক্ষেই তা উপলব্ধি করতে, নিজের মনে ক'রে নিতে বাধে না। সকল মানুষেরই মনের উপাদান এই প্রকার। যে প্রবৃত্তি মানুষের সকল কাজে শক্তি যোগায়, মনের ওপর তাদের প্রতিক্রিয়া সকল মানুষের পক্ষে হয় একই ধরণের। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: সব বালিসের ভিতর একই তূলা, পার্থক্যটা কেবল খোলের রঙে। ৮

সহজাত প্রবৃত্তি ও তাদের স্বরূপ

একটু চিন্তা ক'রে দেখলে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, বিশ্বে উদ্ভিদ থেকে কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলের মধ্যে এক অদৃশ্য রহস্যময় শক্তি কাজ ক'রে চলেছে শৃঙ্খলার সঙ্গে। এ শক্তি হল দুর্জয় প্রাণশক্তি, আত্মবিকাশের শক্তি। কে এই শক্তি চালু করল, কেন চালু করল, কি ভাবে প্রতিমুহূর্তে এর লীলা চলেছে তা সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা বা তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। এই শক্তির ফলে নিয়মিত কালে গাছে ফুল আসে, ফল হয়, উদ্ভিদ বংশ বিস্তার করে। এই শক্তিই প্রাণি-জগতে ব্যাপ্ত রয়েছে অন্ধ আবেগ বা সহজাত সংস্কাররূপে। ইতর প্রাণীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় কি অদ্ভুত নিষ্ঠার সঙ্গে এরা নিজ নিজ সংস্কারমত আচরণ ক'রে যাচ্ছে। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গের মধ্যে সহজাত

প্রবৃত্তির বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এদের জীবন যাত্রায়, আচরণে, খাদ্যসংগ্রহের প্রণালীতে, বাসা তৈরিতে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সন্তানগণ তা তাদের পিতামাতার নিকট থেকে শেখেনি ; জন্মকাল থেকেই এগুলি তারা লাভ করেছে। এদের পূর্ববর্তী বংশধরেরা যে অবস্থায় যেরূপ আচরণ করেছে, এরাও ঠিক সেইরূপই ক'রে থাকে। মৌমাছি মৌচাক নির্মাণ ক'রে, মধু সংগ্রহ করে ; মাকড়সা জাল বোনে, শিকার ধরার জন্য চুপ ক'রে বসে থাকে ; পিপড়ে ঘর তৈরি-করে, দল বেঁধে বাস করে ; কাচপোকা আরসোলা দেখতে পেলে তার ঘাড়ে হুল ফুটিয়ে দিয়ে তাকে অবশ ক'রে ফেলে তারপর সেটিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত টেনে নিয়ে যায় মাটির বাসার মধ্যে। সেখানে ডিম পেড়ে তার কাছে অবশ আরসোলাকে রেখে বাসার মুখ দেয় বন্ধ ক'রে ; ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে ঘরে বন্দী করা আরসোলার মাংস খেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে। মৌমাছিকে মৌচাক তৈরি করার, মাকড়সাকে জাল বোনার, কাচপোকাকে ভাবী বাচ্চার খাদ্য সংগ্রহ করার কৌশল কে শেখাল ? কেউ শেখায়নি। এতে যে তারা বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে এমনও নয়। স্বভাব বা সহজাত সংস্কারের বশেই এরা নির্দিষ্টরূপ আচরণ ক'রে চলেছে।

জীবজগতে দেখা যায় এক এক প্রজাতি বা গোষ্ঠীর সব প্রাণীর আচরণ ও জীবনযাত্রা একই ধরণের ; আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি করার সহজাত প্রবৃত্তি এককভাবে ও সমষ্টিগতভাবে তাদের সব আচরণের মূলে। যেমন দেখা যায়, শিয়ালের স্বভাব ; দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, শিকার ধরে ও একত্রে কাড়াকাড়ি ক'রে খায় ; নিজেদের মধ্যে যৌনমিলনে মিলিত হয়, এ নিয়ে কলহ বাধে ; বাচ্চাদের পালন করে, নিরিবিলি স্থানে সন্তান ও সঙ্গিনী নিয়ে বাস করতে ভালবাসে ; আগুন দেখলে, উচ্চ শব্দ শুনলে ভয় পেয়ে পলায়, অদ্ভুত জিনিস দেখে কৌতূহলী হয়। তেমনি প্রত্যেক প্রাণিগোষ্ঠীরই এক এক নির্দিষ্ট ধরণের জীবনযাপন প্রণালী আছে। এদের সকলেরই দুটি প্রধান কামনা— আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। তাদের যাবতীয় চেষ্টা ও কার্যকলাপ এই দুটি প্রবৃত্তিকে সফল করার জন্য নিয়োজিত। তারা সবাই যে প্রায় একইরূপ আচরণ ক'রে যাচ্ছে এর জন্য তাদের ট্রেনিং নিতে হয়নি ; প্রকৃতি তাদের স্বভাব একই ছাঁচে গড়ে দিচ্ছেন। জীবন-সংগ্রামে সকল জীবই বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয় ; যার যে পরিমাণ বুদ্ধি সে সেই অনুপাতে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ ক'রে থাকে।

কীটপতঙ্গ ও ইতর প্রাণিজগতে জীবের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট বিপুল আবেগ বর্তমান থেকে প্রাণীদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে, মানুষের মধ্যেও আমরা সেইরূপ প্রবৃত্তির খেলা দেখতে পাই ; কারণ মানুষও জীব ; জীবধর্ম তার মধ্যেও সক্রিয় ; তবে মানুষের জীবনে প্রবৃত্তিগুলি যেভাবে প্রকাশ পায় তার মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে, মনোহারিত্ব আছে। যে দুর্জ্ঞেয় অন্ধ আবেগ বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষীর জীবনে সরল স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মানুষের জীবনে তা হয়ে ওঠে বিচিত্র। অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে, তার ভয়, ক্রোধ, কৌতূহল আছে ; যৌনকামনা ও অপত্য স্নেহ তার মধ্যেও প্রবল। এ ছাড়া আছে সঞ্চয় করার বাসনা, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের কামনা, সৃষ্টির উদ্দীপনা, সমবেদনা ও হাসির প্রবণতা। মানুষ প্রবৃত্তিগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এগুলিই তার সকল চিন্তা ও কর্মের মূলশক্তি এবং প্রেরণার উৎস। বুদ্ধি ও মানসিক অন্যান্য গুণের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে আনে বৈশিষ্ট্য, মানুষের চরিত্র গ'ড়ে তোলে ও তার ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করে।

মানুষের জীবনে

প্রবৃত্তি জীবের মজ্জাগত। মানবমনের কোন্ গোপন কক্ষে এদের অবস্থান তা বলা সহজ নয়। তবে বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সাড়া দিয়ে কোন প্রবৃত্তি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন এর স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা সজাগ অবস্থায় থাকে না ; সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগরিত হয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার মধ্যে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যায়—যেমন (১) অবগতি (২) আলোড়ন (৩) প্রকাশ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

আত্মরক্ষার বাসনা জীবমাত্রেরই সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তি। জীবন যুদ্ধে এ প্রবৃত্তি বর্তমানের জীবকে এ পর্যন্ত জয়ী ক'রে এসেছে। এ প্রবৃত্তি দুর্বল হলে সে টিকতে পারত না। আত্মরক্ষার প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন নিশ্চয়ই কোন শত্রু আছে যার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কাজেই প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার প্রথম ধাপ হল শত্রুর বিপদ সম্বন্ধে অবগতি। বিপদের সম্ভাবনা বা আশংকা প্রথমে জীবের এই প্রবৃত্তিকে কাজের তাগিদ দেয়। বহিরিন্দ্রিয় বিপদের বার্তাটি পৌঁছিয়ে দেয় প্রবৃত্তির সদর আফিসে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ

আশংকা থাকলে সীমান্তে অবস্থিত রক্ষিদল যেমন শত্রুর আগমনবার্তা তার-যোগে বা বেতার যোগে প্রধান সমর দপ্তরে জানিয়ে দেয়, তেমনি।

দ্বিতীয় অবস্থা হল মানসিক আলোড়ন বা প্রস্তুতি। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি জেগে উঠলে জীব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়; দেহের মধ্যে যেন সাজ সাজ আলোড়ন পড়ে যায়; যে-যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ কাজের উপযোগী সেখানে দ্রুত রক্ত সঞ্চালিত হতে থাকে।

তৃতীয় ধাপ হল এই আলোড়নের প্রকাশ। অকস্মাৎ রক্ত সঞ্চালনের ফলে আত্মরক্ষার্থে যে-যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আয়োজন তাদের মাংসপেশী স্ফীত ও সতেজ হয়ে উঠে। জীব তখন যুদ্ধের জন্য, অথবা শত্রু প্রবল হলে, পলানোর জন্য প্রস্তুত।

প্রবৃত্তির মূলকেন্দ্র দেহের অভ্যন্তরে হলেও দেহের বহিরঙ্গে ও আচরণের ভিতর দিয়ে এর প্রকাশ বুঝতে পারা যায়। প্রবৃত্তি শুধু মানসিক প্রক্রিয়া নয়; শুধু দৈহিক প্রক্রিয়াও নয়—দুয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে এর প্রকাশে; একে তাই বলা চলে মনোদৈহিক প্রক্রিয়া।

সহজাত প্রবৃত্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল জীবের আত্মরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির কাজে সহায়তা ক'রে তাকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করা। দেহের উপরিভাগে অবস্থিত ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের খবর ভিতরে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য সজাগ রয়েছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চেন্দ্রিয় রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের ভিতর দিয়ে বহির্জগতের বার্তা দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। এদের বলা চলে প্রবৃত্তির চর বা বার্তা-সংগ্রাহক। যে-বার্তা এরা ভিতরে বয়ে নিয়ে যায়, তাই যে কোন না-কোন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলবে এমন নাও হতে পারে। বহিরিন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ চোখে পড়ছে, নানা শব্দ কানে যাচ্ছে, বিভিন্ন স্পর্শানুভূতি হচ্ছে, তবু সব সময়েই ত এরা কোন-না-কোন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে না। দেখা যায়, বহিরিন্দ্রিয়ের আবেদন ও সক্রিয়তার সঙ্গে আরো একটি বিষয় থাকা দরকার। সেটি হল অনুভূতি বা বিচার বোধ। যেমন—এক ব্যক্তি হয়ত পুকুরপাড়ে ব'সে জলের মধ্যে মাছের চলাফেরা দেখছে; কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে, দেখে আনন্দ পাচ্ছে। অকস্মাৎ একটি বিষধর সাপ কাছে এসে ভেসে উঠল; দেখা মাত্র তার মনে ভয়ের সঞ্চার হল এবং তৎক্ষণাৎ সে সেখান থেকে পিছিয়ে গেল। এতক্ষণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল তাতে আত্মরক্ষার জন্য

পলানো প্রবৃত্তিকে জাগানোর মত কিছু ছিল না। সাপ দৃষ্টিপথে পড়া মাত্র সুপ্ত প্রবৃত্তি জেগে উঠল এবং নিমেষের মধ্যে ঘটে গেল তার আলোড়ন ও প্রকাশ।

বহিরিন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে বাইরের বস্তুতে সাড়া দেবার যে তাগিদ আসে তাই প্রধানতঃ প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে। বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে মানুষ এই তাগিদ নিয়ন্ত্রণ করে। ইতরপ্রাণীও অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তি-জাগানো তাগিদের তারতম্য বুঝতে পারে। উচ্চ শব্দ জীব মাত্রেরই ভয় উৎপাদন করে। কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ ক'রে উচ্চ শব্দ পলায়ন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে; তার ফলে দেখা যায় ভয়ের প্রকাশ। কিন্তু প্রাণী যখন বারংবার পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারে যে, এরূপ কোন এক ধরণের উচ্চ শব্দের সঙ্গে দৈহিক কষ্ট বা আঘাতের কোন সংযোগ নাই তখন সে-উচ্চশব্দ শুনে তার পলায়ন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় না। গর্জন ক'রে রেলগাড়ী ছুটে চলেছে; তার কাছে রেল লাইনের পাশে তারের ওপর অনেক সময় দেখা যায় নিঃশঙ্কচিত্তে পাখী বসে রয়েছে। এরা গাড়ীর শব্দ শুনে আর ভয় পায় না। অনেক সময় দেখা যায় মোটরগাড়ীর হর্ণের বিরাট আওয়াজ শুনেও সহরের গরু ঘোড়া মোটেই বিচলিত হয় না কিন্তু পাড়াগেঁয়ে ঐরূপ শব্দ প্রথম শুনলে দড়ি ছিঁড়ে, গোয়াল্‌রে বেড়া ভেঙ্গে গরু, ঘোড়া ছুটে পালাতে চেষ্টা করবে। অতএব দেখা যায়, ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে এবং কিছুটা বুদ্ধি খাটিয়ে জীবজন্তু ও বুঝতে পারে কোন্‌ সাড়াটি প্রবৃত্তি জাগানোর পক্ষে অনুকূল। অন্য কথায় বলা চলে, প্রবৃত্তি যেন কোন বিশেষ বিষয়ে অবস্থানুষঙ্গ (conditioned) হ'য়ে যায়।

কীটপতঙ্গ ও নিম্নতর পশুপক্ষীর জীবনে সহজাত সংস্কার অন্ধ আবেগের সঙ্গে এদের আচরণ পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। উচ্চতর প্রাণীর জীবনে বুদ্ধি প্রয়োগের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবু কোন নির্দিষ্ট প্রবৃত্তি জাগরিত হলে সকল জীবজন্তুই তাতে প্রায় একই রূপ সাড়া দিয়ে থাকে। যত কিছু বৈচিত্র্য মানুষের আচরণে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার ও তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ব্যাপারে কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়ঃ

(১) প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি জাগাবার উপযোগী কতকগুলি স্বাভাবিক উপাদান আছে; জীবমাত্রেই এতে সাড়া দেয়। কিন্তু মানুষের

কোন প্রবৃত্তি জাগ্রত করতে স্থূল উপাদান না হলেও চলে; এর অনুরূপ অন্য কোন উপাদান কিম্বা শুধু এর ভাব চিন্তাই মানুষের প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। একে এক কথায় বলা যায় ভাব-অবগতি।

(২) ইতর প্রাণিজগতে দেখা যায় প্রবৃত্তি জাগরিত হলে সকল প্রাণীই নির্দিষ্টরূপে দৈহিক আচরণের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তির দৈহিক প্রকাশ তার বিচার বুদ্ধি, আত্মসম্মানবোধ, ধর্মবোধ প্রভৃতি দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, অনেক সময় বাইরের আচরণ দেখে সে-প্রবৃত্তির আসল প্রকাশ মোটেই বুঝতে পারা যায় না। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি মানুষের প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রকাশকে সংযত এবং নিয়ন্ত্রিত করে।

(৩) স্থূল উপাদান ছাড়াও অনুরূপ জিনিস বা ভাব-কল্পনা দ্বারা মানুষের প্রবৃত্তি জাগানো সম্ভবপর ব'লে অনেক সময় মানব-হৃদয়ের একাধিক প্রবৃত্তি যুগপৎ সজাগ ও সক্রিয় হয়ে থাকে।

(৪) মানুষের প্রবৃত্তি চালিত প্রবণতাগুলি সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়ের ভাব অবলম্বন ক'রে নির্দিষ্ট পথেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে।

বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক্। সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে কার্যে প্রকাশ ঘটাতে তিনটি ধাপ-যেমন অবগতি, আলোড়ন ও প্রকাশ, লক্ষ্য করা যায়; একথা বলা হয়েছে। মানুষের প্রবৃত্তির লীলাতেও ইহা সত্য, তবে মানুষ কল্পনা, ভাব-চিন্তা ও অনুভূতির স্মৃতি প্রয়োগ ক'রে স্থূল বিষয়বস্তু ছাড়াই কোন প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ত আছেই, মন মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কাজ করে। সাধারণ প্রাণীর এই সুবিধা নাই। যে-বস্তু দৃশ্যতঃ চোখের সম্মুখে নাই বা কোন বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, ইতর প্রাণীর কাছে তার কোন আবেদন নাই।

প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ব্যাপারে মানুষ যেমন সংযম ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়, ইতর প্রাণীর জগতে তেমন দেখা যায় না। কিন্তু প্রবৃত্তি জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন ঘটে, মানুষ ইচ্ছা করলেও তা বন্ধ করতে পারে না। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। যেমন, ক্রোধ প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলে সাধারণ জীব তা যেভাবে প্রকাশ করে, বুদ্ধিমান মানুষ তেমনভাবে দৈহিক

আচরণ করবে না সত্য কিন্তু তার দেহের ভিতর এ প্রবৃত্তির আলোড়ন হবে অন্যান্য যে কোন জীবের মতই। তার হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তসঞ্চালনী শিরা উপশিরা, বিভিন্ন গ্রন্থি আভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠে; প্রবৃত্তিটিকে পরিপূর্ণ, প্রকাশের জন্য আবেগ জেগে উঠে মনের মধ্যে। মানুষ কল্যাণকৃৎ শুভবুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তির নগ্ন এবং অশোভন প্রকাশকে চেপে রাখে; কখনও বা তাকে এমন অভিনব রূপ দিয়ে প্রকাশ করে যে, সে-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রকাশের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায় কোন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পাওয়ার পথে যে তিনটি ধাপ রয়েছে, মানুষের মধ্যে তার প্রথম ও শেষটিতে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ভিতরের আলোড়নে অন্য জীবের সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ

প্রবৃত্তিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবকে বাঁচিয়ে রাখা। বিভিন্ন প্রবৃত্তি সাড়া দেয় বিভিন্ন অবস্থায়; এদের প্রকাশও তাই বিভিন্ন ধরণের। প্রবৃত্তি জেগে উঠলে দেহের মধ্যে যে আলোড়ন ঘটে, যে ভাবের আবেগ অনুভূত হয়, বাইরের আচরণে যে নূতনত্ব প্রকাশ পায় তাকে বলা হয় প্রক্ষোভ। ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির প্রক্ষোভের মধ্যে তফাৎ আছে। প্রক্ষোভ দেখে ভিতরের আলোড়ন বুঝতে পারা যায়।

পলায়ন প্রবৃত্তি :: প্রক্ষোভ-ভয়

জীবের যতগুলি প্রবৃত্তি আছে, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হল আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। বিপদের কবলে পড়লে পিছিয়ে যাওয়া, ছুটে পালানো প্রাণরক্ষার তাগিদেই প্রয়োজন। বিপদ অনুভূত হলে সেখান থেকে পালানর জন্য ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, প্রকাশ পায় ভয়। পালানোর জন্য দেহে তখন অতিরিক্ত বলের সঞ্চার হয়। শোনা গেছে বিপদের মুখে প'ড়ে লোকে প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে লাফ দিয়ে এমন গর্ত পার হয়ে গেছে, এমন উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে গেছে স্বাভাবিক অবস্থায় যা ডিঙানো তাদের পক্ষে অসাধ্য।

ভয় দেহে অকস্মাৎ অতিরিক্ত বল ও ক্ষিপ্রতা জুগিয়ে দিয়ে পালিয়ে বাঁচতে সাহায্য করে বটে কিন্তু ভয়ের মাত্রা যদি হয় অত্যধিক তবে এর

বিপরীত অবস্থা ঘটে। দারুণ ভীতির সঞ্চার হলে দেহের স্নায়ুমণ্ডল তার উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না; এরূপ অবস্থায় অন্যান্য জীবজন্তুর মত মানুষের ও চলার শক্তি থাকে না; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে আসে, জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। বনের মধ্যে বাঘের সামনে প'ড়ে হার্টফেল ক'রে লোক মারা গেছে, বাঘের গর্জন শুনে ভয়ে শরীর অবশ হয়ে যাওয়ায় গাছের ওপর থেকে নীচে প'ড়ে গেছে বাঘের সামনে, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।

আত্মরক্ষার জন্য পালানোর সঙ্গে আর একটি ক্রিয়া দেখা যায়। ছুটে পালাতে গিয়ে আড়াল পেয়ে জীব যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সেখানে লুকায়। আড়ালে লুকানো মানুষের কাছেও কিছুটা আরামদায়ক মনে হয়। শিশুরা অনেক সময় ভয়ে দরজার আড়ালে বা বিছানায় লেপের নিচে গিয়ে লুকায়; বয়স্ক ব্যক্তিও কখন কখনো এরূপ আচরণের পরিচয় দিয়ে থাকে। ভয়ের তীব্রতা বেশী হলে হাতে পায়ে খিচনি ওঠে, শরীর থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে, কারো বা হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কেন এরূপ হয় তার কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, বিপদ থেকে ছুটে পালানো এবং আশ্রয় পেলে লুকানো জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনুরূপভাবে সাড়া দেয়; উত্তেজনা খুব বেশী হলে হৃদ্‌যন্ত্র অতি দ্রুত চলতে চলতে হঠাৎ যেন থেমে লুকিয়ে পড়তে চায়, তখন তার কাজ যায় থেমে।

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে জাগানোর জন্য স্বাভাবিক কতকগুলি বিষয় আছে, যা দেখলে বা অনুভব করলে সহজেই সে প্রবৃত্তি সাড়া দেয়। বিপদের আশংকাই ভয় জাগানোর স্বাভাবিক উপাদান। অকস্মাৎ উচ্চ শব্দ, অতি গম্ভীর নীচু আওয়াজ, অপরিচিত অদ্ভুত জীবজন্তু প্রভৃতি জীবমাত্রেরই ভয় জাগিয়ে তোলে। পূর্বে-পাওয়া আঘাতের কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই এগুলি মনে ভয়ের সঞ্চার করে। ক্রমবিবর্তনের পথে চলতে জীবকে এগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছে; এগুলির স্মৃতি যেন দেহের অণুতে পরমাণুতে মিশে আছে, তাই এ থেকে নূতন ক'রে আঘাত পাবার আগেই আত্মরক্ষার প্রেরণা জেগে ওঠে। মানুষ সমাজে বাস করে, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বাইরের প্রকৃতির ওপর অনেকখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে; শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ-জীবনে ভয়ের স্থান আগের মত অতখানি নাই তবু ভয় মানুষের মজ্জাগত হয়ে রয়েছে ঠিক তার আদি পুরুষের মতই। অপরিচিত, অপ্রাকৃত বিষয় মানুষের

বিস্ময়মিশ্রিত ভয় উৎপাদন করে ; বুদ্ধিপ্রয়োগ ক'রেও যখন সে তার স্বরূপ বুঝতে পারে না তখন তার প্রতি গোপন ভয় অন্তরে থেকেই যায়। আদি মানব সভ্যতার পথে অনেক দূর এগিয়ে আসার আগে ভয় ও বিস্ময়ের বশে প্রকৃতির পূজা সুরু করেছিল ; সূর্য, আগুন, ঝড়বিদ্যুৎ রুদ্ররূপ নিয়ে তাদের ভয় উদ্রেক করেছিল। বুদ্ধিমান সভ্য মানুষ এই ভয়কে বিশুদ্ধ ভয় রূপে প্রকাশ করে না ; এই গোপন রহস্যময় ভয়কে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে মানুষেয় ধর্মমত। ধর্ম মূলতঃ মানবমনের সুগোপন ভয়ের ওপর স্থাপিত। ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা মানুষের জটিল মনে নানাভাবের সঙ্গে মিশে ভক্তিরসে পরিণত হয়ে এক অভিনব রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ভয়ের প্রকৃতি

মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জীবনে ও আচরণে ভয় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একবার পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হলে ভয় গভীর দাগ রেখে যায় মনের ওপর। কৌতূহল, যৌনকামনা, প্রীতি, ক্রোধ প্রভৃতি একাধিক প্রবৃত্তি একসঙ্গে সক্রিয় থাকতে পারে কিন্তু ভয় জাগ্রত হলে অন্য সব চাপা প'ড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ভয় একবার পেয়ে বসলে সহজে ছাড়ে না। অন্যান্য প্রবৃত্তি জাগ্রত হলে কিছুক্ষণ পরে তার নিবৃত্তি ঘটে কিন্তু ভয় ঘুরে ফিরে আসে ; ঘুমের মধ্যে এবং জাগ্রত অবস্থাতে ও বিভীষিকার স্মৃতি নিয়ে ভয় হানা দেয়। কথায় বলে এবং কার্যতঃ ও দেখা যায় 'আগুনে-পোড়া গরু লাল মেঘ দেখে ভয় পায়', 'চূণ খেয়ে মুখ পুড়লে দই দেখে ভয় হয়।'

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবনগঠনে ভয় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। দমনকারী শক্তি হিসাবে ভয়ের প্রভাব ব্যাপক। দৈহিক শাস্তির ভয়ে, মৃত্যুর ভয়ে মানুষ আদিকাল থেকেই নিজের আচরণ সংযত করতে শিখেছে ; সভ্যসমাজেরও শাস্তির ভয়ে দুষ্ট অনেকখানি শিষ্ট হয়ে থাকে।

শিশুমনে ভয়

ভয় একবার মনের মধ্যে শিকড় চালিয়ে শক্ত হয়ে বসলে তাকে সরানো বড় কঠিন। একথা বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যতখানি খাটে, শিশুর জীবনে খাটে তারচেয়ে অনেক বেশী। বিচারবুদ্ধির অভাবে ভীতি শিশু মনে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। কল্পনাপ্রবণ শিশু বাস্তব আর

অবাস্তবের তফাৎ বুঝতে পারে না। মিথ্যা জুজুর ভয়ে তাকে ভীত ক'রে তুললে তার ছাপ থেকে যায় শিশুর মনের তলায়। বয়স বাড়লে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে সে বুঝতে পারে জুজুর ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয় কিন্তু তবু বাল্যে-পাওয়া ভয়ের দাগ মুছে ফেলতে পারে না। বহুদিন-আগে-পাওয়া দারুণ ভয় মনের তলায় লুকিয়ে থেকে জটিল মানসিক রোগের সৃষ্টি করেছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। শিশুকে মানুষ ক'রে তোলার ব্যাপারে, শিশুর সঙ্গে আচরণে বয়স্কব্যক্তিকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ হতে হয়। পিতামাতা যদি নির্ভীক হন শিশু সাহসী ভয় শূন্য হয়েই গড়ে ওঠে ; তাঁরা যদি কোন বিষয়ে ভয় প্রকাশ করেন, শিশুর মনে তা সংক্রামিক হয় তাঁদের অজ্ঞাতসারেই।

অপসারণ প্রবৃত্তি :: প্রক্ষোভ—বিরক্তি

বিপদের মুখে পড়লে ছুটে পালানোর তাগিদ ওঠে। অপসারণ প্রবৃত্তি যেন পলায়ন প্রবৃত্তির ছোট ভাই ; উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—দেহকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচানো। শত্রু তেমন প্রবল না হলে, কিম্বা একেবারে গায়ে এসে পড়লে এ প্রবৃত্তির বশে দেহ তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। পচা, বিস্বাদ, তুর্গন্ধ কোন কিছু মুখে পুরে দিলে জিভ তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেয় ; বমির ভাব আসে ; দেহ যেন সংকুচিত হয়ে হানিকর পদার্থ টুকু শরীর থেকে নিঃশেষে বের ক'রে দিতে চায়। চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিরক্তির প্রকাশ।

নরম, পিছল, লিক্‌লিকে কোন পদার্থ হঠাৎ গায়ের সঙ্গে লাগলে গায়ের মধ্যে ঝাঁকানি দিয়ে মাংসপেশীগুলি সংকুচিত হয়ে ওঠে, সে-জিনিসটিকে ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত দেহে একটা অস্বস্তিকর চঞ্চলতা অনুভূত হয়। খালি গায়ের ওপর যদি একটি টিকটিকি হেঁটে বেড়ায় বা কেঁচো চলাফেরা করতে থাকে তবে যে কেমন বিরক্তি এবং অস্বস্তি বোধ হবে, তা আমরা কল্পনা ক'রে অনুমান করতে পারি।

কৌতূহল প্রবৃত্তি :: প্রক্ষোভ—বিস্ময়

কৌতূহল প্রবৃত্তি কেবল মানুষের মধ্যে এবং উচ্চস্তরের জীবজন্তুর মধ্যে দেখা যায়। নিম্নস্তরের ইতরপ্রাণীর কৌতূহল বোধ নাই। কোন নূতন জিনিস—ভীতি উৎপাদনকারী নয় অথচ সম্পূর্ণ পরিচিতও নয়—এমনি

ধরণের জিনিস কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। নূতন জিনিসটি কি দেখবার বাসনা সে বস্তুর দিকে আকর্ষণ করে; চোখে মুখে কৌতূহলের স্বাভাবিক দীপ্তি ফুটে ওঠে, একে আমরা বলতে পারি বিস্ময়। কৌতূহলের সঙ্গে কিছুটা অজানার ভয় মিশানো থাকে বলে এ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জীব একবার এগিয়ে যায় ভাল করে পরখ করে দেখতে আবার পিছিয়ে আসে ভয় পেয়ে কিন্তু ভয়টা প্রবল না হওয়ায় ছুটে পালায় না। গরু, ঘোড়া, হরিণ বানর প্রভৃতির কৌতূহল প্রবল। এদের হাবভাবে তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। লেজ পিঠের ওপর তুলে, কান খাড়া ক'রে গলা টান ক'রে বিস্ময়প্রকাশক চোখে এরা যখন কোন নূতন কিন্তূত কিমাকার জিনিস পর্যবেক্ষণ করে তখন এদের দেখাদেখি আর যারা কাছাকাছি থাকে তারাও এসে যোগ দেয়। বন্যজন্তুর কৌতূহল প্রবৃত্তির সুযোগ নিয়ে অনেক সময় শিকারী অদ্ভুত জিনিস দিয়ে আকৃষ্ট ক'রে শিকারকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে আসে।

ইতর প্রাণীর পক্ষে কৌতূহল প্রবৃত্তিটি একান্ত প্রয়োজনীয় বা উপকারী না হলেও মানুষের পক্ষে এটি বিশেষ মূল্যবান। সকল মানুষেরই কৌতূহল আছে কিন্তু এর প্রবলতা সকলের সমান নয়। কৌতূহল মানবমনের সজীবতার পরিচয় দেয়; যার কৌতূহল কম, নূতন বিষয়ের রহস্য জানবার আগ্রহ যার নাই তার মনে তেজের অভাব; বেশীকিছু সে শিখতে চায় না, পরেও না। কৌতূহল যার অদম্য সে যেদিকে আকৃষ্ট হয় তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়; এর জন্য দুঃখকষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত নয়। এই ধরণের মানুষ মানবজাতির জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেন। নূতন দেশ দেখার নেশায় এঁরা মরুকান্তার, সাগরপর্বত পার হয়ে দূরদূরান্তরের খবর সংগ্রহ করেন, প্রকৃতির রাজ্যের রহস্যসন্ধান করতে সারাজীবন সাধনায় ডুবে থাকেন, ধর্মের মূলতত্ত্ব জানতে, ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করার বাসনায় এঁরা জাগতিক সুখভোগ বিসর্জন দিয়ে দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেন। প্রথমোক্ত দলে আমরা নাম করতে পারি মঙ্গোপার্ক, লিভিংস্টোন, বার্ক, আয়ার, কলম্বাস, ক্যাপ্টেন কুক, হেবন হেডিন, স্কট, আমুণ্ডসেন প্রভৃতি দেশ আবিষ্কারকের; দ্বিতীয় দলে পড়েন নিউটন, ফ্যারাডে, জগদীশচন্দ্র, রমণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক; তৃতীয় দলের উল্লেখ করলে বলতে হয় বুদ্ধ, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতির কথা।

কৌতূহল জ্ঞানরাজ্যের দ্বারস্বরূপ। কৌতূহল প্রবল হলে মনে যে অনুসন্ধিৎসা জন্মে তা সার্থক করার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধি ও নিষ্ঠার। যার যে পরিমাণ মানসিক শক্তি এবং বাধাবিপত্তি অতিক্রম ক'রে কৌতূহল নিবৃত্ত করার ক্ষমতা, সে সেই পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী।

লড়াই প্রবৃত্তি :: প্রক্ষোভ—ক্রোধ

অন্যান্য প্রবৃত্তির কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দীপক উপাদান আছে যা সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু লড়াই প্রবৃত্তির তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট উপাদান নাই; কোন প্রবৃত্তি সার্থকতার পথে বাধা পেলে লড়াই প্রবৃত্তি চাঙা হয়ে উঠে; বাধা, প্রতিবন্ধক চূরমার ক'রে প্রাণী তার কাম্য উদ্দেশ্য সফল করার জন্য উদ্যোগী হয়; তার চোখেমুখে, আচরণে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রোধের চিহ্ন। প্রাণিজগতে দেখা যায়, খাদ্য বস্তু লাভে কেউ বাধা দিলে, যৌনমিলনে অন্য পুরুষ প্রাণীর কাছ থেকে বাধা পেলে, নিজের প্রাণনাশের আশংকা বা সন্তানের বিপদের সম্ভাবনা ঘটলে জীব রুখে উঠে লড়াই করতে প্রবৃত্ত হয়। বিপদে পড়লে ইঁদুরের মত ভীরু প্রাণীও যখন দেখে পালাবার উপায় নাই, তখন সে রুখে দাঁড়ায় শত্রুর দিকে। পাখীর বাচ্চা খাওয়ার জন্য সাপ বাসার দিকে গেলে নিরীহ পাখীও তাকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না। পশুজগতে লক্ষ্য করা যায়, লড়াই প্রবৃত্তি স্ত্রী-জাতির চেয়ে পুরুষ প্রাণীর মধ্যেই বেশী প্রবল।

ক্রোধ জেগে উঠলে মানুষও অন্যান্য প্রাণীর মত লক্ষণ প্রকাশ করে থাকে। দেহে রক্ত সঞ্চালন দ্রুততর হয়; চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে, নাসিকা ঈষৎ স্ফীত এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হয়; আঘাত করার জন্য হাতের মাংসপেশীতে উত্তেজনা আসে, ওষ্ঠ কাঁপতে থাকে; দাঁতে দাঁত চেপে ধরে; ভারী গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে হুংকার। এসবই জৈব লক্ষণ। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে বা কোন কাজে বাধা পেলে মানুষের মনে এ প্রবৃত্তি জেগে ওঠে কিন্তু সাধারণ পশুর মত ক্রোধের নগ্ন প্রকাশ সে দেখায়

ক্রোধের লক্ষণ-

না। স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা বিবেচনা ক'রে সে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। বক্তা তার কণ্ঠস্বর একমাত্রা চড়িয়ে, টেবিলে আঘাত ক'রে, প্রকাশ করে মনের রুদ্ধ ভাব। অবস্থা বিশেষে ক্রোধের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায় মানুষের জীবনে; কোথাও রুদ্র, কোথাও মৃদু উষ্ণ, কোথাও স্নিগ্ধ এবং দৃঢ়। আকাশের বিদ্যুৎ বাজ হয়ে ধ্বংস সাধন করে; যন্ত্রের মধ্যে বাঁধা প'ড়ে এ কাজ করে দৈত্যভৃত্যের মত। একে দিয়ে মানুষের মৃত্যুঘটানো যায়, আবার গাড়ি টানানো, পাখা ঘুরানো, ঘরে আলো জ্বালানোও চলে। ক্রোধশক্তিটিকে মানুষ সেইভাবে ব্যবহার করতে শিখেছে।

ক্রোধের রূপান্তর

সকল মানুষের ভিতরই লড়াই প্রবৃত্তি আছে; তবে সকলের মধ্যে সমান ভাবে তীব্র নয়। পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে এ প্রবৃত্তি স্বভাবতই কম। সভ্য মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছে তাতে মানুষকে সাধারণ পশুর মত খাদ্য সংগ্রহের জন্য পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতে হয় না; সহধর্মিনী লাভ করার জন্যও তাকে মল্লযুদ্ধে নামতে হয় না। তার পক্ষে জীবন সংগ্রামের রূপ গেছে বদ্‌লে। যশঃ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য এখন মানুষকে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে হয়। নিজের উন্নতি সাধনের জন্য যেমন রয়েছে ব্যক্তিগত জেদ্ বা প্রতিযোগিতা, সমগ্র জাতির উন্নতি ও প্রতিপত্তি স্থাপনের জন্য চলেছে সমষ্টিগতভাবে প্রতিযোগিতা। এ সকলের মূল শক্তি হল মানুষের অন্তর্নিহিত লড়াই প্রবৃত্তি।

ক্রোধ মানুষের মনে যে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চার করে তাকে দেহের আস্ফালনে বৃথা ব্যয় না ক'রে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা নিয়োজিত করে বাধাবিপত্তি জয় করার প্রচেষ্টায়। ক্রোধ তখন মানুষের মনে দীপ্তি পায় দৃঢ় সংকল্পরূপে। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, উদ্দেশ্য সাধনের কঠোর পণ—এ সবই ক্রোধ থেকে উৎপন্ন। লড়াই-প্রবৃত্তিবিহীন অর্থাৎ ক্রোধশূন্য মানুষ নিজের উন্নতি সাধন করতে পারে না; বাধা জয় করার শক্তি ও মানসিক বলের অভাবে সে কেঁচোর মত সকলের নী'চে পড়ে থেকেই তৃপ্ত। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাসনা তার নাই, থাকলেও তা সফল করার সামর্থ্য তার নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপদেশ-ছলে বলতেন: হাটে গরু কিনতে গিয়ে বলদের লেজে হাত দিয়ে দেখবে। কতক বলদ লেজে হাত দিলে ছট্‌ফট ক'রে ছোটে, কতক আবার সেখানেই শুয়ে পড়ে।

ছট্‌ফট করা গরুর রাগ বেশী, ওগুলি কাজের। যেগুলি শুয়ে পড়ে, সেগুলি অকেজো। মানুষের মধ্যেও অমনি কতকের আছে ভারি জেদ; যাতে হাত দেয় তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। বিবেকানন্দকে তিনি বলতেন এই শ্রেণীর জেদী মানুষ।

আত্ম-জাহির প্রবৃত্তি

যে সকল জীব দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে ভালবাসে তাদের মধ্যে কতক সাথীসঙ্গীদের কাছে নিজেদের জাঁক দেখিয়ে থাকে। সাধারণতঃ যৌনমিলনের সময়েই এ প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাদের আচরণে, হাবভাবে তখন গর্বের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবুতর বুক ফুলিয়ে নাচে, ময়ূর পেখম ধ'রে রঙের বিচিত্র বিকাশ ঘুরে ঘুরে দেখায়। ভাবখানা যেন এইরকম—ত্যাখো তো আমার মত কে আছে!

আগেকার দিনে স্বয়ম্বর সভা বসত, রাজরাজড়া সাজগোজ ক'রে উপস্থিত হত রাজকন্যাকে লাভ করবার জন্য; ঘোষক তাদের শৌর্যবীর্য কীর্তিকাহিনীর বিবরণ শোনাত। সকলেই যেন মনে মনে রাজকন্যাকে বলত—আমার দিকে চেয়ে ত্যাখো! রাজকুমারী একজনের গলায় দিত বরমাল্য। তারপর প্রায়ই স্থুরু হত লড়াই; সকলেরই আক্রোশ গিয়ে পড়ত যে জিতেছে তার ওপর।

প্রাণিজগতে এখনও স্বয়ম্বর প্রথার বিলোপ হয়নি। বর্ষার প্রারম্ভে ডোবার খালে প্রথম বৃষ্টির জল জমলে সেখানে স্থুরু হয় কোলাব্যাঙের সংগীত প্রতিযোগিতা। ইন্দ্রনীল কণ্ঠ ফুলিয়ে, গুরুগম্ভীর আওয়াজ বের ক'রে ব্যাঙদের যে প্রতিযোগিতা চলে, তা আত্মজাহির ক'রে সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করার প্রয়াস। স্ত্রী মাকড়সার চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাণিপ্রার্থী পুরুষ মাকড়সা যে নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করে তারও উদ্দেশ্য একই।

চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া আত্মজাহির করে বিশেষ দর্শনীয় ভাবে। যৌনমিলনকালেই এ প্রকাশ দেখা যায় সবচেয়ে বেশী। লেজ চামরের মত উঁচু ক'রে তুলে, ধনুকের মত স্থঠাম ভঙ্গিতে, গ্রীবা বাঁকিয়ে, চার পা দৃঢ় ক'রে লাফিয়ে লাফিয়ে চ'লে সে আনন্দময় উচ্ছলতা প্রকাশ করে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উল্লাস, চলাফেরায় গর্ব ফেটে পড়ে।

আত্ম-জাহিরের বিপরীত প্রবৃত্তি আত্ম-দীনতাও দেখা যায় প্রাণীর আচরণে। যে দুর্বল, শক্তিমানের কাছে সে সংকুচিত হয়ে পড়ে; তার হাবভাবে ফুটে ওঠে দীনতার লক্ষণ। সেই হয়ত তার চেয়ে যে-দুর্বল, তার কাছে জাহির করে নিজের বাহাদুরি। একটি বড় শক্তিশালী কুকুরের সঙ্গে ছোট দুর্বল কুকুরের সাক্ষাৎ হলে পাশাপাশি এ দুটি প্রবৃত্তির বাস্তব প্রকাশ দেখা যায়। বড়টি লেজ পিঠের ওপর বাঁকিয়ে, মাথা উঁচু ক'রে বীরের মত দাঁড়ায়; দুর্বলটি লেজ নীচু ক'রে গুটিয়ে পেটের নীচে নিয়ে, মাথা নীচু ক'রে একপাশে হেলিয়ে, মাটিতে প্রায় শুয়ে প'ড়ে দীননয়নে তাকিয়ে থাকে সবলটির দিকে। সে যেন দীনতার জীবন্ত চিত্র; হাবভাবে বুঝি এই কথাটি বুঝাতে চায়—আমি তোমার দাসের দাস, তোমার পায়ের ধূলা; তুমি প্রভু, আমি ভৃত্য; তোমার সঙ্গে কি আর আমার তুলনা সাজে!

আত্মজাহির ও আত্ম-দীনতা প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে দেখা যায় অতি শিশুকাল থেকেই। এ দুটিই সামাজিক প্রবৃত্তি। অন্যের সংস্পর্শে এলে তবে এর প্রকাশ ঘটে। শিশু যখন প্রথম একপা, দু'পা ক'রে চলতে শেখে, নূতন কিছু আয়ত্ব করে, তখন অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা পেলে সে খুশি হয়; নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সে গর্ববোধ করে; অনাদর বা উপেক্ষা পেলে মনে মনে ক্ষুন্ন হয়, কখনও বা হাত পা ছুড়ে, চিৎকার ক'রে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অপরিচিত বয়স্ক ব্যক্তির সামনে তার আচরণে প্রকাশ পায় আত্ম-দীনতার ভাব। মায়ের কোলে মাথা রেখে বা আঁচল ধ'রে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে আড়চোখে চেয়ে দেখে অপরিচিত লোকটিকে। যদি অপরিচিত ব্যক্তির চেহারায় গাম্ভীর্য, পোষাক পরিচ্ছদে জাঁকজমক থাকে, তবে সেই অনুপাতে শিশুর আত্মদীনতার প্রকাশও কম-বেশী হয়ে থাকে। শিশুকে নূতন জামাকাপড় পরিয়ে দিলে সে তার সাথীদের দেখাতে উৎসুক হয়; দেখিয়ে গর্বমিশানো তৃপ্তি অনুভব করে। ভাবখানা যেন এই রকম—দ্যাখো আমার কেমন সুন্দর জিনিস; আমাকে কেমন সুন্দর মানায়! বয়োজ্যেষ্ঠদের সে বোঝাতে চায় তার চেয়ে বয়সে যারা ছোট তাদের তুলনায় সে অনেক বেশী জানেশোনে, অনেক বেশীকিছু করতে পারে। সাথীদের কাছে বাহবা এবং বড়দের কাছে প্রশংসা লাভ করলে খুশীতে তার মন ভ'রে ওঠে। এর জন্য তার চেষ্টার অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' পুস্তকের 'বিজ্ঞ' খোকন তার ছোট-বোনের বোকামির পরিচয় পেয়ে এবং সেই

মানুষের জীবনে

সঙ্গে তার নিজের বুদ্ধির তুলনা ক'রে রীতিমত গর্ব বোধ করে। মাকে সে ডেকে বলে—

খুকি তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা
খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ।
ও ভেবেছে তারা উঠছে বুঝি
আমরা কখন উড়িয়েছিলেম ফানুস।

আমি যখন খাওয়া-খাওয়া খেলি
খেলার থালে সাজিয়ে নিয়ে নুড়ি,
ও ভাবে বা সত্যি খেতে হবে
মুঠো ক'রে মুখে দেয় মা পুরি'।

* * *

তোমার খুকি চাঁদ ধরতে চায়
গণেশকে ও বলে যে মা গানুশ।
তোমার খুকি কিচ্ছু বোঝে না মা,
তোমার খুকি ভারি ছেলেমানুষ॥

—'বিজ্ঞ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড

শিশু যেভাবে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও কৃতিত্বের বড়াই করে, শৈশব পার হয়ে বাল্য উপনীত হলে সে আর ও-ভাবে আত্ম-গৌরব প্রকাশ করে না। তখন বালকের বুদ্ধি কিছুটা বেড়েছে, তার পরিচিত মহলের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, নিজের মুখে নিজের গৌরব বাখানি করতে সে লজ্জা বোধ করে। অপরে প্রশংসা করুক তা সে চায়। বালক ক্রমবৃদ্ধির পথে কৈশোরে উপনীত হয়। তখন সে নিজের প্রকৃত কৃতিত্ব দেখিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করতে চেষ্টা করে। এইভাবে দেখা যায় বয়স এবং জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আত্ম-জাহির করার রীতিতে রূপান্তর ঘটে। শিশুর মধ্যে যে প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়, বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যেও রয়েছে সেই প্রবৃত্তি; কেবল বয়সভেদে এর প্রকাশে নূতনত্ব দেখা দেয়। এইটুকু তফাৎ।

অপত্যস্নেহ

সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অন্যান্য প্রবৃত্তির মত এটি ও প্রাণীর মজ্জাগত ; এটি যেন প্রকৃতির সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকারিণী শক্তি। পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-জাতির অন্তরেই সন্তান-স্নেহ বেশী প্রবল। সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীর উদ্বেগের অন্ত নাই ; সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে দুঃখকষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করতে এমন কি প্রাণ দিতেও সে কুণ্ঠিত নয়। উদ্ভিদ থেকে উচ্চতম স্তরের প্রাণী পর্যন্ত সকলেরই মধ্যেই এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই যেখানে সন্তানের জন্য জননী নিজের জীবন দান করে।* কতক উদ্ভিদ ফল পাকলে ম'রে শুকিয়ে যায়। এইরূপ ওষধিজাতীয় গাছ-গুলি বীজরূপ সন্তানদের পুষ্ট ক'রে পাকিয়ে তুলতে নিজেদের দেহের শেষবিন্দু রস পর্যন্ত দান ক'রে মৃত্যু বরণ করে। ধান, গম, কলাই, সরষে, কলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর আত্মদানকারী উদ্ভিদ।

কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর মধ্যে সন্তান-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল। সন্তান পালনের জন্য যে এরা বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্ট বরণ ক'রে নেয় তা নয়, প্রবৃত্তির বশেই তারা সন্তান রক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকে। পিঁপড়ে মৌমাছির সমাজে স্ত্রীর সংখ্যা খুব কম। এরা সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ নিজেরা করে না ,কর্মীরা ধাত্রীর কাজ ক'রে থাকে। কর্মী পিঁপড়েরা ডিমের যত্ন নেয়, রোদে দিয়ে শুকায়, দরকার হলে এক বাসা থেকে অন্যত্র ব'য়ে নিয়ে যায়, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে তাদের পরিচর্যা করে। কর্মী মৌমাছিরাও সন্তানদের জন্য ঘর তৈরি, খাবার সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে সারাদিনমান ব্যাপৃত থাকে। এক ধরণের কাঁকড়া বিছা নিজের পিঠে ডিম ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে বিছার পিঠের মাংস খেতে সুরু করে এবং সকলে মিলে জননীর দেহ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ ক'রে অন্য খাবারের সন্ধানে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পশুপক্ষীর জীবনেও দেখা যায় সন্তা-

ইতর প্রাণিজগতে

---

* এই অংশ যেদিন লেখা হয়েছে সেদিনকার সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশিত হয় : মুর্শিদাবাদের জনৈকা মহিলার শিশুসন্তানের জামাকাপড়ে হঠাৎ আগুন ধ'রে যায়। তিনি সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনে পু'ড়ে মারা যান ; সন্তানটি রক্ষা পায়।

নের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। কতক পাখী ডিমে তা'দিতে ব'সে বাচ্চা ফুটে বের না হওয়া পর্যন্ত বাসা ছেড়ে ওঠে না। বানরের মধ্যে সন্তানপ্রীতি এত প্রবল যে, বানরী তার বাচ্চাকে অনেকদিন পর্যন্ত সর্বদা কোলে ক'রে রাখে, আদর যত্ন করে ; একবারের জন্যও তাকে চোখের আড়াল করে না, এমনকি বাচ্চা কোন কারণে ম'রে গেলেও তার গলিত মৃতদেহ বুকে ক'রে ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়। সন্তান উৎপাদন ও প্রতি পালনের সাধনায় যারা অকৃতকার্য হবে তাদের পক্ষে জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়ে টিকে থাকা সম্ভবপর হবে না।

মানবজীবনে মাতৃস্নেহের মত পবিত্র এবং মহিমান্বিত আর কিছু নাই। নারীর পক্ষে সন্তান-প্রীতি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতই চিরস্থায়ী ও সদাক্রীয়াশীল।

মানুষের জীবনে

সন্তানকে বক্ষে চেপে ধ'রে আদর করবার, নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার বিপুল আগ্রহ জননীর অন্তরে যেমন প্রবল, তেমন আর কারো অন্তরে নয়। সন্তান তার চিরসাধের সামগ্রী ; বাল্যের পুতুল খেলায় কৈশোরের শিবপূজায়, যৌবনের মোহমায়ায় শিশু নারীর অন্তরের নিত্যসঙ্গী, কল্পনার আনন্দ। শিশু ভিন্ন নারীর জীবন বৃথা ; মাতৃত্বের প্রকাশ থেকে বঞ্চিত নারীর অন্তরমাধুর্যের একটি দিক রিক্ত থেকে যায়।

নারীর অন্তরে অপত্য স্নেহ কি ভাবে বিকশিত হ'য়ে ওঠে এবং আচরণে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মকথা' কবিতায়। শিশু কোথা থেকে তার মায়ের কোলে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তরে—

মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে,
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে ॥
ছিলি আমার পুতুল-খেলায়, প্রভাতে শিবপূজার বেলায়
তোরে আমি ভেঙে ছি আর গড়েছি।
তুই আমার ঠাকুরের সনে ছিলি পূজার সিংহাসনে,
তাঁরি পূজায় তোমার পূজা করেছি ॥

* * *

যৌবনেতে যখন হিয়া উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মতো মিলায়ে,
আমার তরুণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।

সন্তান 'ইচ্ছা হয়ে ছিল' জননীর মনের মাঝারে। সে যখন কায়া ধ'রে তার কোলে এল, মায়ের অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠল পুলকের উচ্ছ্বাসে; সেই সঙ্গে কখন্ সন্তানের অমঙ্গল ঘটে এই আশংকা উদ্বেগ সৃষ্টি ক'রে সর্বদা জেগে রইল মায়ের মনে।

হারাই হারাই ভয়ে গো তাই বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে,
জানিনে কোন্ মায়ায় ফেঁদে বিশ্বের ধন রাখ্‌ব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহু দুটির আড়ালে॥

এই হল মাতৃস্নেহের আসল রূপ। সন্তানকে ঘিরে জননীর নিবিড় স্নেহ দানা বেঁধে ওঠে। অন্যের কাছ থেকে সন্তান যদি স্নেহ, আদর-যত্ন পায়, জননীর স্নেহ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, মন তার খুশিতে ভ'রে ওঠে। পক্ষান্তরে, অপর কেউ সন্তানের অনিষ্ট করলে মাতৃহৃদয়ে রোষ ওঠে দীপ্ত হয়ে। সন্তানকে অন্যে অবজ্ঞা বা সামান্য হেলা তাচ্ছিল্য করলেও জননীর অন্তর তার প্রতি বিরূপ না হয়ে পারে না।

অনেক স্নেহ বৎসলা জননীর মনে ক্ষুদ্র শিশু এমনি গভীর মমতা জাগিয়ে দেয় যে, কচি ক্ষুদ্র সবকিছুই তাঁর মনে অপত্যস্নেহের উদ্রেক করে। এরূপ মহিলা গাছের কচি চারা, কুকুর বিড়াল ইঁদুর ছানা, এমন কি ছোট্ট আকৃতির বই, খেলনা টেবিল চেয়ার প্রভৃতির ওপরও মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বিতরণ ক'রে থাকেন। ক্ষুদ্র আকারের জিনিসের প্রতি অনেকের প্রীতি মাখানো নিগূঢ় আকর্ষণ আছে। অন্তর-স্থিত অপত্যস্নেহ এর ভিতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে।

অপত্যস্নেহের রূপান্তর

পূর্বে বলা হয়েছে, কোন প্রবৃত্তি সার্থকতার পথে বাধা পেলে ক্রোধ জেগে ওঠে; ক্রুদ্ধ জীবের মনে তখন প্রতিহত প্রবৃত্তিকে সফল করার জন্য অতিরিক্ত তেজের সঞ্চার হয়। সন্তানকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য জননী নিজের বিপদ ও দুঃখকষ্টের কথা ভুলে যায়, আক্রমণকারী বা অনিষ্টকারী তখন তার কাছে গণ্য হয় শত্রু ব'লে। সন্তানের অনিষ্টকারী যদি এমন কোন শক্তি হয় যার সঙ্গে শত্রুতা করা সম্ভবপর নয়, যার সঙ্গে স্নেহের বস্তু রক্ষা করার জন্য লড়াই করা চলে না, তবে জননীর নিষ্ফল রোষ দুঃখ শোক, আর্তনাদের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সন্তান মারা গেলে, রোগ বা অদৃষ্টের ওপর রোষ

প্রকাশ করে কোন লাভ নাই ; অন্তরের রুদ্ধ ব্যথা তখন দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুধারারূপে নির্গত হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি জেনেশুনে, পরিকল্পনা ক'রে সন্তানের প্রাণহানি ঘটালে জননীর অন্তর তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নেবার কামনা জাগে সন্তানহারা মায়ের মনে। অন্যায়কারী শক্তিমান হলে বা অন্য কারণে শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলেও শোকাতুরা জননীর অভিসম্পাৎ থেকে সে রেহাই পায় না।

অপত্যস্নেহ নারীর, বিশেষ করে সন্তানবতী নারীর অন্তরে প্রবল হলেও পুরুষের মন এ স্নেহপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়। অল্পসংখ্যক এমন পুরুষ অবশ্য সকল সমাজেই আছে যাদের হৃদয়ে স্নেহপ্রবৃত্তি তেমন কোমলতা আনতে পারেনি ; এরা কঠোরহৃদয়, নির্দয় প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সমাজের বেশীর ভাগ লোকই দয়া, মায়া, মমতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেদের সন্তানসন্ততি নিয়ে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে। এদের মনে স্নেহপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক মাত্রায় কাজ ক'রে চলে। কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখলে স্নেহশীল ব্যক্তির অন্তরে নৈতিক ক্রোধ জেগে ওঠে ; প্রতিবাদ স্বরূপ তারা তা বন্ধ করতে বা প্রাণীকে উদ্ধার করতে উদ্যত হয়। একটি অসহায় নিরপরাধ নিরীহ প্রাণীকে যদি কেউ নির্যাতন করতে থাকে, তবে তা অনেকের কাছেই প্রীতিপ্রদ মনে হয় না ; কেউ মানবশিশুকে অন্যায়ভাবে যন্ত্রণা দিলে বা তার জীবননাশ করলে উত্তেজিত জনতা অপরাধীকে শাস্তি দেবার জন্য বিচারের ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সহরের রাজপথে মোটরের নীচে চাপা প'ড়ে পথচারী বালক মারা পড়লে মোটর চালকের পক্ষে জনতার আক্রমণ থেকে সুস্থদেহে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়। এরূপ অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায়, দর্শকদের ক্রোধ পড়ে মোটর চালক ও তার গাড়ির ওপর। গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, চালককে মারধোর ক'রে তারা এর প্রতিশোধ নেয়। এরূপ আচরণের মূলে রয়েছে মানুষের স্নেহপ্রবৃত্তি আহত হওয়ার দরুণ অকস্মাৎ-সঞ্জাত দীপ্ত নৈতিক রোষ।

মানুষের সমাজব্যবস্থায় অন্যায়কারীকে শাস্তিদানের বিধান সুদূর অতীত যুগ থেকে চলে আসছে। 'দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ'— এই ছিল অনিষ্টকারীর ওপর প্রযোজ্য শাস্তির প্রথম বিধান। সভ্যমানবের সুশৃঙ্খল সমাজে আইন আদালতের মারফৎ দুষ্টের শাস্তিদানের যে ব্যবস্থা চালু

রয়েছে তা সমর্থন লাভ করছে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে। কাজেই দেখা যায়, যে-অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তি জীবের প্রাণ রক্ষা করতে ব্যগ্র, তাই আবার রুদ্ররূপ ধরণ ক'রে অনিষ্টকারীর প্রাণসংহার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে বিসদৃশ মনে হলেও এটি সত্য যে, প্রাণ রক্ষার জন্য মমতাপূর্ণ ব্যাকুলতা এবং দুষ্কৃতকারীকে শাস্তিদানের জন্য নির্মম কঠোরতা একই প্রবৃত্তির দুইটি বিশিষ্ট রূপ।

অপত্যস্নেহের আর একটি করুণাঘন রূপ দেখা যায় বিশ্ব মানবের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ভিতরে। মানুষের দাসত্বপ্রথার বিলোপ সাধন, অনাথ আশ্রমে অসহায় শিশুদের প্রতিপালন, শিশু ও ইতর প্রাণীর প্রতি নির্দয় আচরণ বন্ধ করার আন্দোলন, হাসপাতাল স্থাপন প্রভৃতি মানবকল্যাণকর কাজের ভিতরে মানবমনের অপত্যস্নেহের বিচিত্র প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

পিতৃস্নেহ ও তার স্বরূপ

মানুষের মন সীমাহীন গহন অরণ্যের মতই রহস্যময়; কোথায় এর আরম্ভ আর কোথায়ই বা এর শেষ কিছুই বুঝবার উপায় নেই। এ অরণ্যের ভিতর সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না, কাজেই স্পষ্ট ক'রে কিছু প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর নয়। শুধু অন্তঃসন্ধানী আলো নিক্ষেপ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে নিজের নিজের মনের যে অংশটুকু দেখা যায় তা অবলম্বন করেই মানুষ অপরের মনঃপ্রকৃতি সম্বন্ধেও অনুমান ক'রে নেয়। নিজের মনের ওপর আত্মানুসন্ধানের আলো ফেলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মানব-মনের কত দুর্জ্ঞেয় রহস্যের খোঁজখবর সংগ্রহ করেন। মানুষের প্রতিটি কথার, প্রতিটি আচরণের উৎস সন্ধান করতে গেলে মনের নিবিড় গহনে প্রবেশ করতে হবে। যে নদী আমাদের ঘরের কাছ দিয়ে কুলুকুলু স্বরে ব'য়ে যায়, তার উৎস সন্ধান করতে হলে যেতে হবে বহু দূরের তুষারক্ষেত্রে; যে শতদল জলের ওপর পাপড়ি বিকাশ ক'রে সৌরভে বাতাস মন্থর ক'রে দেয়, তার মূল খুঁজতে হবে জলের তলায়, মাটির নীচে। তেমনি আমাদের আচরণও অদৃশ্য সংযোগ সূত্রে মনের বিভিন্ন ভাব-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত। আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-নৈরাশ্য, কল্পনা বাসনার যে ভাব-বুদ্বুদ নিরন্তর মনের তলায় আলোড়ন তুলছে, তারই বহিঃপ্রকাশ মানুষের আচরণে। এই ভাব-কামনাগুলির তীব্রতা কম বেশী থাকলেও সকল মানুষের মানসক্ষেত্রেই এগুলি বিরাজ করে। তাই আমরা নিজের মন দিয়ে অপরের মন বুঝতে পারি, নিজের ভাবাবেগের অনুভূতি থেকে অনুরূপ অবস্থায় অপরের ভাবাবেগ কিরূপ হতে পারে, তা অনুমান ক'রে নিই। এ অনুমান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সত্য হয় এইজন্য যে, মনের মৌলিক উপাদানগুলি সকলেরই এক; একই রূপ সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ বা ভাবাবেগ মনের গভীরে থেকে মানুষকে নানা আচরণে উদ্বুদ্ধ করছে। এদের স্বরূপ বুঝতে পারলে জীবের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞাননেত্র খুলে যায়; তখন অন্যের মনের গহনেও সে আলোকপাত করতে পারে।

স্নেহের উৎস কোথায়

সন্তানের প্রতি প্রবল আকর্ষণ একটি সহজাত প্রবৃত্তি, জীবের রক্তের সঙ্গে এ মিশে আছে। অপত্যস্নেহ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যে এই সন্তান বাৎসল্য এমন মাত্রায় দিয়েছেন যাতে তারা সন্তানসন্ততি বাঁচিয়ে রেখে সৃষ্টির ধারা

অব্যাহত রাখতে পারে। অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে পশুমাত্রেই সন্তান পালন করে। যাদের পালনী শক্তি কম তাদের সন্ততির সংখ্যা দেখা যায় প্রচুর। মাছ ব্যাঙ প্রভৃতি নিম্নস্তরের প্রাণীর অসংখ্য ডিম হয়—এক একটি মাছ বা ব্যাঙের ডিমের পরিমাণ হবে কয়েক কোটি! এদের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানদের রক্ষার ব্যবস্থা এরা করে, কিন্তু এই সংগ্রাম-সংকুল জীব-জগতে বেঁচে থাকা বা শৈশব পার হয়ে আসা অতি অল্প সংখ্যকের পক্ষেই সম্ভব হয়। ইতর প্রাণীদের জগতে দেখা যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-জাতীয়দের মধ্যেই বেশী প্রবল। জনকের কবল থেকে সন্তানদের বাঁচাতে জননী ব্যাকুল হয়ে ওঠে; শিশু সন্তান নিয়ে সে কিছুকাল লুকিয়ে কাটায়—প্রাণিজগতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সন্তানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জীবের সত্তায় মেশানো রয়েছে; বাইরে থেকে এ প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিতে হয় না। সন্তানের জন্ম হলে স্বাভাবিক নিয়মে জনক-জননীর মনে এর স্ফুরণ ঘটে। তখন সন্তানকে অবলম্বন করেই এই আদিম প্রবৃত্তি একটি নূতন রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। সন্তান লাভের পূর্বে অপত্যস্নেহ পুরুষের মনে নিবিড়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে না। স্ত্রী-লোকেরক্ষেত্রেও একথা খাটি, তবে তাদের মন স্বভাবতই কোমল বলে এদিকে প্রবণতা বেশী, এবং সন্তানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে সন্তানকে কোলে পাবার আগে থেকেই বাৎসল্যরসে তাদের মন স্নেহসিক্ত হ'য়ে ওঠে।

অপত্যস্নেহ মাতৃহৃদয়ে কতকগুলি প্রবল প্রেরণা জাগিয়ে তোলে; তাদের মধ্যে প্রধান হ'ল সন্তানকে রক্ষা করার তীব্র বাসনা ও উদ্যম। অসহায় কচি শিশুটি যেন তাঁরই দেহমনের একটি অংশ, যেন তাঁরই অভিনব সৃষ্টি। এটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, স্তন্য পান করিয়ে তাঁর পরিতৃপ্তি। স্তন্যপায়ী শিশুটি একান্তভাবে যে তার উপরই নির্ভরশীল এ ভাব নিজের অজ্ঞাতসারেই জননীর মনে গর্বমিশ্রিত পুলকশিহরণ সঞ্চার করে। সন্তান সুশ্রী কি কুৎসিত, সুঠাম কি অঙ্গহীন এসব বিচার ক'রে মাতৃস্নেহ কম বা বেশী উৎসারিত হয় না। জননীর স্নেহকাজল মাখানো চোখে সন্তানমাত্রেই অপূর্ব সুন্দর দেবদূত; এদের মঙ্গল কামনাই তাঁর অন্তরের নিত্যকার জপমন্ত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে সন্তানের প্রতি নির্মল উদার আশীর্বাদ শুনতে পাই কবির কথায়—পুত্রনামা আত্মা অসি ত্বং জীব শরদাং শতম্। তুমি আমার আত্মা, পুত্ররূপ ধ'রে এসেছ; তুমি শতবর্ষজীবী হও।

পিতৃস্নেহের বৈশিষ্ট্য

সন্তান যখন অসহায় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে থাকে তখন ক্রমে তার ওপর মাতৃস্নেহ ক'মে আসে। জীবজগতে এই নিয়ম। শিশু স্বাবলম্বী হয়, তাকে পালন করার দায়িত্ব আর জননীর ওপর থাকে না। সুস্থ সবল আত্মনির্ভরশীল সন্তান অপেক্ষা দুর্বল, রুগ্ন আত্মশক্তিহীনের প্রতিই মায়ের স্নেহ স্বভাবতঃ প্রবলতরভাবে প্রবাহিত হয়।

পিতৃস্নেহের স্বরূপ কতকটা ভিন্ন। অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে দেখে তার প্রতি জনকের মমতার উদ্রেক হয় সত্য, কিন্তু তা জননীর স্নেহের মত এত প্রবল এবং সক্রিয় নয়। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পিতার স্নেহ তাকে অবলম্বন ক'রে দানা বেঁধে উঠতে থাকে; পিতার আশা আকাঙ্ক্ষা যেন তাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই কামনার মধ্যে দুইটি ভাবের মিশ্রণ ঘটে—নিঃস্বার্থভাবে পুত্রের কল্যাণ কামনা ও আত্ম-অহমিকা পরিতৃপ্তির কামনা। পিতৃস্নেহের মধ্যে এই দুটি কামনা এমন ওতঃপ্রোতভাবে মিশে যায় যে, পিতা ক্রমে পুত্রকে নিজ থেকে অভিন্ন ব'লে ভাবতে থাকেন। পুরুষ কারও কাছেই পরাজিত হতে চায় না; তথাপি পিতা পুত্রের কাছে পরাজয় কামনা করেন, তার কারণ পুত্র বিজয়ী হ'লে সে বিজয়গৌরব তাঁর নিজেরই। পুত্রের গুণগরিমার জন্য তিনি যেমন আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, তার দোষত্রুটি এবং পরাজয়ের গ্লানিও তাঁর বুকে তেমনি সমানভাবে বাজে। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাকৃডুগাল বলেছেন ঃ

সন্তানের মধ্যে যা-কিছু প্রশংসনীয় তা পিতার মনে আত্মগৌরবের সন্তোষ আনে: সন্তানের দোষত্রুটি তাঁর আত্মশ্লাঘাকে হীন করে; সন্তানের লজ্জা ও অপমান তাঁর পক্ষে লজ্জা ও অপমান, সন্তানের সাফল্যে তাঁর সাফল্য।

পুত্রকে অবলম্বন ক'রে পিতৃস্নেহ এবং পিতৃহৃদয়ের বাসনা মূর্ত হতে চায়; প্রয়োজন হলে পুত্রের সঙ্গে একই দুঃখসাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পুত্রের সমদুঃখভাগী হতেও পিতা কুণ্ঠিত নন। রহস্যময় মনোজগতের এই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ পুত্রস্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রের বেদনাক্ষুব্ধ কণ্ঠে অননুকরনীয় ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কপটদ্যুতে রাজ্যলাভ ক'রে দুর্যোধন পিতাকে প্রণাম করতে এসেছে। ধৃতরাষ্ট্রের মৃদু তিরস্কারে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে পাণ্ডবদের

রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বনবাসে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন ঃ

হায় বৎস অভিমানী ! পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি সুকঠোর
সুহৃদের নিন্দাবাক্য,—হইত কল্যাণ ।
অধর্মে দিয়েছি হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ । করিতেছি সর্বনাশ তোর
এত স্নেহ ।.........

মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা
দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি' তার ফণা
অন্ধ আমি । অন্ধ আমি অন্তর বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয় তিমিরে
চলিয়াছি ।.........

আসন্ন বিপদে
কন্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ় করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবেগে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে

... ...

কুরুবংশ রাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম,—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ আর নহে কেহ ।

—গান্ধারীর আবেদন, রবীন্দ্র-রচনাবলী
৫ম খণ্ড

ধৃতরাষ্ট্র ন্যায়তঃ রাজ্যের অধিকারী হয়েও শুধু অঙ্গের বিকলতার জন্য সিংহাসন লাভ থেকে বঞ্চিত। তাঁর রাজ্য লোভাতুর অন্তরের চিরবঞ্চিত কামনা পুত্রের সাফল্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। দুর্যোধন এই অন্ধ পিতার রুদ্ধ কামনার মূর্ত বিগ্রহ ; পিতা এবং পুত্র এদিক দিয়ে অভিন্ন।

গান্ধারী যখন ন্যায়বিচার প্রার্থনা ক'রে পাপী দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে আবেদন জানালেন, ধৃতরাষ্ট্র বললেন ঃ

পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি,—আমি তার
একমাত্র ; উন্মত্ত তরঙ্গ মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব। উদ্ধারের আশা ত্যাগ করি
তবু তারে প্রাণপণে বক্ষে চাপি' ধরি,
তারি সাথে এক সাথে ঝাঁপ দিয়া পড়ি,
এক বিনাশের তলে তলাইয়া মরি
অকাতরে, অংশ লই তার দুর্গতির
অর্ধ ফল ভোগ করি তার দুর্মতির,
সেই তো সান্ত্বনা মোর,—

পিতা যখন শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে পুত্রকে নিজের মনের মত ক'রে গড়ে তুলতে চেষ্টা করতে থাকেন, তখন থেকে পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ ঘনীভূত হ'তে থাকে। পুত্রের সার্থক আত্মবিকাশে তাঁর চেষ্টা, উদ্যম, স্বার্থত্যাগ তাঁকে নিবিড়ভাবে পুত্রমুখী ক'রে তোলে। তিনি যেন কোন একটি বড় ব্যবসায়ে তিলে তিলে মূলধন নিয়োজিত করেছন। এর সাফল্য পিতাকে যেমন আনন্দিত করে তেমন আর করবে কাকে? তেমনি এর ব্যর্থতার বেদনা পিতার চেয়ে আর কারো বুকে এত নিদারুণ হয়ে বাজে না।

শিক্ষক হিসাবে পিতা

আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি—কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও—পিতা নিজ সন্তানের আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন না। এর কারণ এ নয় যে, তিনি সন্তানের শিক্ষার উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করতে নারাজ। আসল কারণ বরং এর বিপরীত। তিনি কামনা করেন তাঁর সন্তান দ্রুত সকল বিষয়ে পারদর্শী হ'য়ে উঠক ; পুত্রের সাফল্যে তাঁর অহং ভাব হয় পরিতৃপ্ত। সন্তান তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে পিতার অহংবোধ আহত হয় ; তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে বিষয়টি তাঁর কাছে এত সহজ সেটি সন্তান কেন বোঝে না এবং এটুকু না বুঝতে পারলে সে কি ক'রে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার

করবে এ চিন্তা তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই মনের আকাশে ঝিলিক দিয়ে যায়। অধীর হ'য়ে তিনি ছেলের বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দেন, আর না হয় মারমুখো হ'য়ে ওঠেন। অধিকাংশ পিতার সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য; সন্তানের মঙ্গলের জন্য যিনি অতিমাত্রায় আগ্রহী তাঁর পক্ষে আরও বেশী প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে সন্তান যদি মোটামুটি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তো পিতা মনে করতে পারেন, তাঁর পুত্রের মত বুদ্ধিমান শিশু খুব কমই আছে। তাঁর নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে অবলম্বন করে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। পুত্র যদি পিতার এই মনোভাবের পরিচয় পায় তবে সেও মনে মনে গর্বিত হ'য়ে উঠতে থাকে। এতে ফল ভাল হয় না। স্নেহ ও শাসন এ দুটির মধ্যে মধুর এবং সুসমঞ্জস মিলন সাধিত না হলে সক্রিয় পিতৃস্নেহ অনেক সময় মঙ্গলের চেয়ে পুত্রের অমঙ্গল সাধনই করে বেশী। পুত্রের কল্যাণকামী পিতাকে এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

যৌন প্রবৃত্তি

লক্ষ কোটি পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ তৃণলতা গাছগাছালি নিয়ে বিশ্বসংসার। জলে স্থলে, অরণ্যে পর্বতে, মাটির নীচে কোটি কোটি জীবের জীবন-লীলা চলেছে। এদের প্রাণযাত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখে অবাক হ'তে হয়। সবরকম জীবের জীবনযাত্রার বিশিষ্ট ধারা আছে; নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ আছে, মিলন আছে, আহার লাভ করলে তৃপ্তি আছে, প্রতিযোগিতা আছে। পৃথিবী জুড়ে জীবের বাস; ধরাপৃষ্ঠে এমন স্থান খুব কম আছে যেখানে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই—না আছে কোন-না-কোন প্রাণী, না আছে কোন উদ্ভিদ। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় পৃথিবীতে সেখানেই প্রাণী দেখা যাবে। একটি গাছের দিকে তাকালে দূর থেকে গাছ ছাড়া অন্য কিছু হয়তো নজরে পড়বে না, কিন্তু ঐ গাছের গায়ে, পাতায়, শাখাপ্রশাখায় কত ক্ষুদ্র কীট বাসা বেঁধে জীবন যাপন করছে। মাটির ওপর হেঁটে চলেছি, পথের পাশে ধূলি মাটির মধ্যে কতশত ক্ষুদ্র জীবের সংসার-লীলা চলেছে। একটি জলাশয়; পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলে এর মধ্যে কোন প্রাণী আছে ব'লে হয়তো মনেই হবে না কিন্তু এর মধ্যে কোটি কোটি অণুপরমাণুর মত জীব বেঁচে রয়েছে, বংশবিস্তার করছে; এরা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে নজরে পড়ে না। একটি জীবদেহের মধ্যেও আবার অসংখ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব বাস করছে। তাই দেখা যায় বিশ্বজগৎ জীবের লীলাক্ষেত্র; সর্বত্রই জীব, সর্বত্রই জীবনের কলরব।

প্রাণিমাত্রেরই সর্বপ্রধান কামনা হল বেঁচে থাকার কামনা। কেউ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে চায় না, বেঁচে থাকার অন্তহীন প্রয়াস ব্যপ্ত রয়েছে সর্ব চরাচরে। কিন্তু চিরজীবী হয়ে থাকার উপায় কি? দেহের বৃদ্ধি আছে, বিনাশ ও অবশ্যম্ভাবী। একটি দেহ চিরস্থায়ী হতে পারে না। এক দেহ থেকে অনেক দেহ উৎপন্ন ক'রে, এক প্রাণ থেকে বহু প্রাণের সৃষ্টি ক'রে এর মধ্যে দিয়ে তো নিজের সত্তাকে বিলোপের হাত থেকে রক্ষা করা চলে! আত্মরক্ষার পরেই জীবের প্রধান প্রবৃত্তি হল আত্মবিস্তারের বাসনা। যৌন প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে এ কামনা সার্থকতা লাভ করে।

বাল্যকালে একজন যাদুকরের খেলা দেখেছিলাম। সেদিন সে খেলাটি এমন বিস্ময়কর মনে হয়েছিল যে, আজও সে দৃশ্য স্পষ্ট মনে আছে।

যৌন প্রবৃত্তির স্বরূপ

যাদুকর দর্শকদের মধ্য থেকে একটি কাঁচা টাকা চেয়ে নিল; তারপর সেটি দুহাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে টান দিতেই একটি টাকা থেকে দুটি টাকা হয়ে গেল। আবার দুটিকে একত্র ক'রে ধ'রে ঐভাবে টান দিয়ে চারটি টাকায় পরিণত করা হল। তারপর ঐ চারটি টাকা একটি টিনের কৌটায় পুরে ঢাকনি বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ ঝাঁকানি দিতেই চারটি থেকে আটটি, আবার আটটি থেকে ষোলটি এইভাবে টিনের কৌটাটি একেবারে ভ'রে গেল। টিনের কৌটার মধ্যে ঝন্‌ঝনানি শব্দ শুনে এবং অবশেষে সব টাকা যখন একটি টেবিলের ওপর ফেলে দেওয়া হ'ল, তা দেখে বালক দর্শকদের আনন্দ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। এখন মনে হয় সেদিন যাদুকর হাতসাফাই ক'রে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল; বাস্তবিকই একটি টাকার দেহ থেকে অতগুলি টাকার জন্ম হয়নি। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যে বিস্ময়কর যাদুর খেলা চলেছে তার মধ্যে হাত সাফাই নাই। একটি জীব থেকে সত্যিই লাখো লাখো জীবের উৎপত্তি হচ্ছে, একটি গাছ থেকে প্রতি বছর উৎপন্ন হচ্ছে হাজার হাজার বীজ ও চারাগাছ। আত্ম-বিস্তারের বাসনা, সৃষ্টির সর্বস্তরে নীরবে কাজ ক'রে চলেছে; উদ্ভিদের মধ্যে এ রয়েছে অব্যক্ত, প্রাণিজগতে হয়েছে ব্যক্ত।

উদ্ভিদের জীবনে

প্রতি বছর নির্দিষ্ট কালে গাছে ফুল ফোটে অজস্র। অধিকাংশ ফুল রঙিন। দিনের আলোতে রঙিন ফুলের নিশান তুলে ধ'রে গাছ যেন কীটপতঙ্গ, মৌমাছি প্রজাপতিকে নিমন্ত্রণ জানায়। রাত্রিতে যে সব ফুল ফোটে সেগুলি প্রায়ই সাদা রঙের ও গন্ধযুক্ত। অন্ধকারে যাতে নিশাচর কীটপতঙ্গ ফুলের সন্ধান পেয়ে আসতে পারে, সেজন্য বাতাসে গন্ধ মিশিয়ে দিয়ে যেন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—এখানে ফুল ফুটেছে; মধু ও ফুলের রেণু যারা খেতে চাও, এসো গন্ধ অনুসরণ ক'রে।

গাছ যে ফুলের পতাকা উড়িয়ে, গন্ধের আতর ছিটিয়ে কীটপতঙ্গকে ভোজে আমন্ত্রণ জানায় তা একেবারে স্বার্থহীনভাবে নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের খেতে আহ্বান ক'রে গাছ তাদের কিছু দান করে আর তাদের দিয়ে কিছুটা কাজ করিয়ে নেয়। একাজ হ'ল বংশ-বিস্তারের প্রথম সোপান।

ফুলের গড়ন পরীক্ষা ক'রে দেখলে দেখা যায়, ফুলের পাপড়ি বা দল ভিতরের কতকগুলি কোমল অংশকে যত্নের সঙ্গে ঘিরে ঢেকে রাখে। পাপড়িগুলি বিকশিত হলে ভিতরের অংশ প্রকাশিত হয়। ফুলের দল-দিয়ে-ঘেরা অংশে রয়েছে গর্ভকোষ ও পুংকেশর দণ্ড। দণ্ডের মাথায় অসংখ্য মিহি রেণু আছে ; এগুলি পুংবীজ। এই রেণু বা পরাগ গর্ভকোষে গিয়ে পৌঁছলে ফলের জন্ম হয়। গাছ নিজে পরাগ সংযোগ করতে পারে না। কীটপতঙ্গ পাখী প্রভৃতি প্রাণী এবং বাতাসের সাহায্যেও গাছ এই মিলন ঘটায়। কোন কোন জাতীয় গাছে স্ত্রীফুল ও পুরুষ ফুল পৃথক পৃথক ভাবে ফোটে। পুরুষ ফুল থেকে পরাগ স্ত্রীফুলের গর্ভকোষে নীত হলে ফলশিশুর উৎপত্তি সম্ভব হয়। সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পরাগ মিলনের জন্য রঙিন অথবা সুগন্ধি ফুল ফুটানো উদ্ভিদের প্রচ্ছন্ন যৌনপ্রবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। নিয়মিত ভাবে নির্দিষ্ট কালে গাছে যেন ফুলের বান ডাকে ; গাছের আনন্দ উল্লাস ও জীবনধারণের সার্থকতা ফুটে ওঠে পুষ্পবিকাশের উচ্ছলতার মধ্যে। সারাটি বছর উদ্ভিদ যেন ফলরূপ সন্তান ধারণের জন্য নীরবে আয়োজন করে, উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকে। সময় যখন আসে, তখন সে নিজেই কুঁড়িকে ফুলে পরিণত ক'রে ফল লাভের উদ্যোগ ক'রে নেয়। সমগ্র উদ্ভিদ জগৎ জুড়ে এই যে নীরবে অথচ সুশৃঙ্খলভাবে বংশবিস্তারের সমারোহ চলেছে, একটি প্রবল দুর্জ্ঞেয় শক্তি সর্বক্ষণ এর প্রেরণা না যোগালে কি একাজ সম্ভবপর হত ?

ইতর প্রাণীর জীবনে

প্রাণিজগতে আত্মবিস্তারের কামনা কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশে তিনটি সোপান বা পর্যায় দেখা যায়, যেমন অবগতি, আলোড়ন, প্রকাশ। যৌন প্রবৃত্তিও এই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। উদ্ভিদের জীবনে এ প্রবৃত্তি যেমন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে, প্রাণীর জীবনে তেমন থাকে না ; বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি ক'রে এ প্রবৃত্তি সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়।

প্রাণিজগতে প্রধানতঃ দুই প্রকার জীব—স্ত্রী ও পুরুষ। এদের দৈহিক গড়নে যে পার্থক্য থাকে তা দেখে এরা পরস্পরকে চিনতে পারে। ইতর প্রাণিদের মধ্যে কোন্‌টি পুরুষ কোন্‌টি স্ত্রী তা মানুষের পক্ষে সহসা বোঝা কঠিন হলেও এদের নিজেদের মধ্যে কঠিন মোটেই নয়। যৌনধর্মের বশে বয়স্ক জীবমাত্রেই স্বজাতীয় বিপরীতলিঙ্গ জীবের সঙ্গকামনা করে; পুরুষ জীব স্ত্রী-জীবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই যৌন আকর্ষণ দ্বারা চালিত হয়ে জীব যে কাজ করে, তাতে তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের কোন ক্ষেত্র নাই। প্রকৃতি অমোঘ নিয়মের বশে জীবকুলকে চালিত ক'রে নিয়ে চলেছেন সৃষ্টিরক্ষার তাগিদে।

নিম্নস্তরের প্রাণীর জীবনে যৌন ক্রিয়া, সন্তানধারণ ও সন্তান প্রতিপালনে জটিলতা নাই। মাছ ও ব্যাঙের যৌনজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৃক্ষের ফল উৎপাদনে যে কৌশল রয়েছে, এদের জীবনে রয়েছে তারই কিছুটা উন্নতধরণের প্রয়োগ। বয়স্ক পুরুষ-মাছ স্ত্রী-মাছের কাছে যায়, তাকে আকৃষ্ট করে। স্ত্রী-মাছ পুরুষ মাছের কাছে এসে কতকগুলি ডিম ছেড়ে দেয় জলের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ মাছ নিজের বীজ নিষেক ক'রে দেয়। এইভাবে ডিম্বকোষের সঙ্গে পুংবীজের মিলনে নিষিক্ত ডিমের মধ্যে মৎস্যশিশু জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষে কীট-পতঙ্গ, মৌমাছি প্রজাপতি যে পরাগমিলন ঘটায়, পুরুষ ও স্ত্রী-মাছ নিজেরা একত্রিত হয়ে তা সম্পাদন করে। ব্যাঙের জীবনেও দেখা যায় অনুরূপ প্রক্রিয়া। পুরুষ ব্যাঙ কলরব ক'রে আত্মগৌরব প্রচার করতে থাকে। তাদের কণ্ঠস্বরে ও কণ্ঠের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী-ব্যাঙ কাছে এসে তাকে নির্বাচন ক'রে নেয়। সে তখন স্ত্রী-ব্যাঙের পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে এবং যখন স্ত্রী-ব্যাঙ জলের মধ্যে ডিম ছেড়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সেও বীজ নিষেক করে। নিষিক্ত ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়—এর সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। এই প্রক্রিয়ায় যে প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাতে অপচয় ঘটে প্রচুর, কেননা এর মধ্যে অনিশ্চয়তা রয়েছে প্রচুর। এর চেয়ে উন্নতস্তরের প্রাণীর জীবনে প্রকৃতি যেন এই ভুলের সংশোধন করেছেন।

উন্নত স্তরের প্রাণীর জীবনে দেখা যায় স্ত্রী-জাব তার ডিম্ব নিজদেহের অভ্যন্তরে বহন করে ; পুরুষের বীজের সঙ্গে ডিম্বের মিলন সম্পাদিত হয় তার দেহেরভিতরেই। নিষিক্ত ডিম পরিপক না হওয়া পর্যন্ত সে দেহের মধ্যেই তা লুকিয়ে রাখে। পুষ্ট হ'লে প্রসব করে। এরূপ প্রাণী হল অণ্ডজ।

স্তন্যপায়ী জীব এরচেয়ে উন্নতস্তরের। স্ত্রী-জীবের দেহমধ্যে জরায়ুতে ডিম্বকোষ থাকে। পুরুষের বীজের সঙ্গে মিলন ঘটে জরায়ুর মধ্যেই। এই মিলনসাধনের জন্য পুরুষ প্রাণীকে পুংপরাগ বা বীজ পৌঁছিয়ে দিতে হয় স্ত্রী-জীবের জরায়ুতে। পুরুষের জননযন্ত্র তাই হয়েছে পৃথক ধরণের। স্ত্রী ও পুরুষের দেহনিঃসৃত জার্মসেল বা জীবকোষের মিলনে যে নূতন জীব-শিশুর জন্ম হয়, তা স্ত্রী-জীবের জরায়ুতে অবস্থান ক'রে মাতৃদেহ হ'তে রস নিয়ে ক্রমে পুষ্ট হতে থাকে এবং সম্পূর্ণ পুষ্ট হলে ভূমিষ্ঠ হয়। প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টির কারখানায় এইভাবে সুশৃঙ্খল নিয়মে কাজ চলেছে ; যৌনপ্রবৃত্তি হল এই সৃষ্টির প্রেরণার মূল উৎস-শক্তি।

মানুষের জীবনে

সৃষ্টির ধারা অনুসরণ ক'রে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছলেও জীবের যা বৈশিষ্ট্য, তা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। যৌনকামনা মানুষের জীবনেও অত্যন্ত প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে কিন্তু এর প্রকাশ ইতর প্রাণীর মত অত সোজাসুজিভাবে ঘটে না। বুদ্ধি, মর্যাদাবোধ, সামাজিক রীতিনীতি মানুষের আচরণ করে নিয়ন্ত্রিত। ফল্গুর অন্তঃপ্রবাহী স্রোতের মত যৌনবাসনা মানুষের অন্তরে প্রবাহিত রয়েছে ; জৈবধর্মবশেই এর কাজ চলেছে, নতুবা মানবজাতির অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু যৌন আচরণ সভ্য মানুষের কাছে শোভন নয় ; তাই লজ্জার আবরণ দিয়ে ঘিরে এর বহিঃপ্রকাশ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভয়, ক্রোধ, কৌতূহল প্রভৃতি প্রবৃত্তি মানুষের শিশুকাল থেকেই আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু যৌনপ্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার নির্দিষ্ট বয়স আছে।

যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ

কচি চারাগাছে ফুল ফোটে না ; পশুপক্ষী বয়স্ক সত্তা লাভ না করা পর্যন্ত তাদের বাচ্চা হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধনের সঙ্গে দেহমধ্যস্থ জীবকোষ পুষ্ট হলে তবে তা নূতন জীব উৎপাদনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। প্রাণিজগতে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

মানুষের জীবনে যৌন কামনা কোন্ বয়সে প্রথম অনুভূত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হ্যাভলক্ এলিস প্রমুখ বিশিষ্ট যৌনবিজ্ঞানবিদ তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে এই সিদ্ধান্তে পোঁছেচেন যে, সাধারণতঃ বালক বালিকার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে যৌনবাসনার উন্মেষ ঘটে' থাকে; এর আগে তাদের যৌনবোধ থাকে না। এ বয়স পর্যন্ত প্রায়ই দেখা যায় বালক বালিকা উলঙ্গ হ'তে বিশেষ সংকোচ বোধ করে না। তারা বালক ও বালিকার যৌন অঙ্গের আকৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করলেও সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতনতা বা অত্যধিক কৌতূহল প্রকাশ করে না। তাদের মন তখন বহির্মুখী, আত্মদেহ-সঞ্জাত আনন্দের অনুভূতি তখনও তাদের মনে জাগেনি। তবে কখন কখনও দায়িত্বজ্ঞানহীন বয়স্ক দাসদাসী শিশুদের যৌন অঙ্গে সুড়সুড়ি দিয়ে বা অন্য উপায়ে ক্রমাগত অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের যৌন অনুভূতির অকাল বোধন ঘটায়। এর ফল শিশুর দেহমনের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হ'য়ে থাকে। মানসিক রোগগ্রস্ত বালক বালিকার জীবনেও যৌন প্রবৃত্তির অকাল-পক্কতা দেখা দিতে পারে, তবে এরূপ রোগীর সংখ্যা নেহাৎ কম।

আট বৎসর বয়স থেকে বালক বালিকার যে যৌনবোধের জাগরণ ঘটে তা পরিণতি লাভ করে যৌবনকালে। এইক্রমবৃদ্ধি মানবজীবনের তিনটি প্রধান পর্যায়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। বাল্যে যৌনবোধের প্রথম উদ্বোধন, কৈশোরে আধো-আলো আধো-ছায়াময় সলজ্জ প্রকাশ, যৌবনে উন্মাদনাময় অভিব্যক্তি। এই প্রত্যেকটি কালেই যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশে বৈশিষ্ট্য দেখাদেয়।

ফ্রয়েডের অভিমত

বিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানবিশারদ ফ্রয়েডের মতে যৌনপ্রবৃত্তি অতি শিশুকাল থেকেই মানুষের জীবনে সক্রিয় হয়ে থাকে। তিনি বলেন, মাতৃস্তন্য পান করার সময় থেকেই শিশু দেহের পুলক অনুভব করতে থাকে; শিশু নিজের আঙুল চুষে যে আনন্দ পায় তা যৌন আনন্দেরই অন্য রূপ। ফ্রয়েডের অভিমত এই যে, যৌনবোধ মানুষের একটি নিগূঢ় এবং অতি প্রবল সর্বব্যাপক প্রবৃত্তি; পিতা যে কন্যাকে বেশী ভালবাসেন, মা যে শিশু পুত্রকে বুকে চেপে ধ'রে দেহেমনে তৃপ্তি ও আনন্দের

শিহরণ অনুভব করেন এর মূলে রয়েছে প্রচ্ছন্ন যৌনকামনা। ফ্রয়েড যে মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে, ইতরপ্রাণি—জগতে যেমন মানব সমাজেও তেমনি যৌন-কামনা বিপরীতলিঙ্গ লোকের প্রতি স্বাভাবিক নিয়মেই উদ্বুদ্ধ হয়, পাত্রাপাত্র বিচারকরে না। মানুষ নিজহাতে-গড়া সামাজিক বিধি নিষেধ আরোপ ক'রে মানুষের যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও সংযত করলেও মনোজগতে এ কামনা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলভাবেই আলোড়ন তুলে থাকে ; মনোজগতে নারীমাত্রেই পুরুষের যৌন কামনাকে দোলা দেয়, সে নারী খেলার সঙ্গিনীরই হোক্, আর মা বোন মাসী পিসিই হোক ; তেমনি নারীর যৌনমানসরাজ্যে পুরুষমাত্রেই সৃষ্টি লীলার অংশীদার, তা সে খেলার সাথীই হোক্, কি বাপ ভাই ছেলেই হোক্। সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিদেবী জীবের মজ্জায় যে প্রবল যৌন প্রবৃত্তি মিশিয়ে দিয়েছেন তা সার্থকতা লাভ করার পথে কোন বাধা নিষেধ মানে না। প্রাণিজগতে দেখা যায় জীব তাদের সক্ষম সন্তান সন্ততির সঙ্গে যৌনমিলনে মিলিত হয় ; আদি মানবের জীবনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। মানবী তার বলিষ্ঠ সন্তানকে স্বামিত্বে বরণ করেছে, পিতা তার বয়স্থা কন্যাকে গ্রহণ করেছে স্ত্রীরূপে। সভ্যতার পথে এগিয়ে এসে মানুষ সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছে, যৌন মিলনের ওপর আরোপ করেছে কতকগুলো কঠোর বাধা নিষেধ। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য মানুষ নিজেদের-গড়া নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিয়েছে স্বেচ্ছায়। অভ্যাস এবং আচরণের ফলে এ সংযম সভ্য মানুষের জীবনে দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হ'য়ে অশেষ কল্যাণের কারণস্বরূপ হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে জয় করতে পারেনি। ফ্রয়েড বলেন, অভ্যাস ও সংযমের দ্বারা নিপীড়িত হ'য়ে যৌনবাসনা মনের নীচের তলায় লুকিয়ে থাকে এবং এমন আচরণের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে যে, তার সঙ্গে যে যৌন কামনার কোন সংযোগ আছে তা মনেই হয় না। ফ্রয়েডের মতে মানুষ তার নিজের অজ্ঞাতসারেই যৌন বাসনা দ্বারা চালিত হয়ে কাজ ক'রে থাকে ; পুত্র তার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মনের নিবিড়তম গোপন কোঠায় পিতার প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করে ; পিতাকে সে মনে করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার জননীকে একান্ত ক'রে পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। কন্যার তেমনি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে পিতার প্রতি এবং মাকে সে গোপনমনে হিংসা করে, কারণ তার মা তাকে পিতার সান্নিধ্য থেকে

অনেকখানি আড়াল ক'রে রাখে। ফ্রয়েডের বক্তব্য এই যে, মানুষের মনের উপরের স্তরে—যাকে বলা হয় সংজ্ঞান মন—সেখানে বিরাজ করে আমাদের পরিচিত ভাব কল্পনা আর গভীর স্তরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে থাকে এমন সব কামনাবাসনা সজ্ঞান মন যার সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখে না। সামাজিক পরিবেশ, নীতিবোধ ও বহু দিনের অভ্যাস দ্বারা অবদমিত হয়ে আদিম যৌনবাসনা প্রায়ই নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নেয়। মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী অনেক সময় গোপন মনের রুদ্ধ ভাবগুলি চেপে রাখতে পারে না ; এমন সব বাসনার কথা তারা তখন প্রকাশ ক'রে দেয়, যা সুস্থ জীবনে তাদের মনেই পড়েনি। নির্জ্ঞান মন মানুষের নীতিবিরুদ্ধে যৌনবাসনার গোপন আশ্রয়স্থল।

ফ্রয়েড মানবমনের অনেক জটিল তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং তাঁর এ অভিমত গ্রহণ করা চলে যে, যৌন প্রবৃত্তি মানুষের কর্ম ও চিন্তার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তাই বলে সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের প্রীতি যে যৌন প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুরঞ্জিত একথা স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না। ভালোবাসাও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ; অপত্যস্নেহ-প্রবৃত্তি এই প্রীতির ভাব জাগিয়ে তোলে। অপত্যস্নেহ সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করবার, তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার প্রেরণা দেয় পিতামাতার মনে ; এর মধ্যে স্বার্থবোধ থাকে না। কিন্তু যৌনকামনা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়।

মনোবিকারগ্রস্ত লোকের রোগ ও তার প্রতীকার সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন ফ্রয়েড। মনের গোপনপুরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তিনি ; এ সকলই রুগ্ন-ব্যক্তির মনোবিশ্লেষণ করার ফল। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সমাজের সুস্থ মানুষের জীবন ও আচরণ, যারা সভ্য সমাজব্যবস্থার আওতায় থেকে যৌন প্রবৃত্তিকে কঠোর সংযমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছে। রুগ্ন বিকারগ্রস্থ লোকের মনের সর্বনিম্নস্তরে আদিম যৌনকামনা লুকিয়ে থাকে ; মনোবৈজ্ঞানিক যখন তার নগ্নরূপ সভ্য মানুষের কাছে তুলে ধরেন তখন তারা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে এই ভেবে যে, হয়ত ঐরূপ কামনা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের মনের নীচের কোঠাতেও বিরাজ করছে, অথচ তারা কিছুই জানছে না! সভ্য সমাজের জীবন-যাত্রায় এবং নীতিসম্মত আচার ব্যবহারে তারা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, যৌনকামনার নগ্নরূপের কথা চিন্তা করতেই তাদের সংকোচ আসে। ফ্রয়েডের অভিমত তাই অনেকের কাছেই বিব্রতকর।

যৌন প্রবৃত্তির স্বরূপ

পূর্বে বলা হয়েছে যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশের নির্দিষ্ট কাল আছে; জীবের শিশুকালে এর বিকাশ ঘটে না। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু সাধারণতঃ আট বৎসর বয়ঃক্রম কাল থেকে এ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতনতা লাভ করতে থাকে। যৌন অঙ্গের উত্তেজনায় তখন সে পুলক অনুভব করতে শেখে। এ বয়সে বালকের দেহস্থ বীজ পুষ্ট হয়নি এবং তার পতনও হয় না। দুষ্ট এবং বয়স্ক ছেলেদের সংসর্গে মিশে অনেক সময় বালক যৌন অঙ্গের অপব্যবহার অভ্যাস করে; সে যেন নিজদেহেই পুলক সঞ্চারের কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে; এরূপ কাজের অপকারিতা বুঝতে না পেরে সে করমৈথুনে বা অন্য উপায়ে যৌনঅঙ্গের উত্তেজনা সৃষ্টি ও তার তৃপ্তিসাধন করতে পারে। এরূপ কাজ বালকের দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই হানিকর। যৌনকামনার প্রথম আলোড়ন যখন জাগে বালকের মনে এবং যখন সে আবিষ্কার করে যে, তার যৌন অঙ্গ আনন্দ দিতে সক্ষম—হোক না সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী তখন মৈথুনের কামনা তাকে নেশার মত পেয়ে বসে। বালককে শাসনতর্জনে নিপীড়ন ক'রে লাভ নাই, কেননা জীবধর্মবশে স্বাভাবিক ভাবেই এ বাসনার উদ্রেক হয়; বালক এ কামনা ছোঁয়াচে রোগের মত অন্য কারো কাছ থেকে ব'য়ে আনেনি। সন্তানের স্বভাব এবং বয়োধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পিতামাতা বালকের প্রতি রুষ্ট না হয়ে বরং সস্নেহ ব্যবহার করেন এবং তার ক্রমবৃদ্ধির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। বালক যাতে উন্মুক্তস্থানে খেলাধূলা, আনন্দ উল্লাস করতে পারে, বাড়িতে পরিজনের কাছে সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহার পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তার ক্রমবিকাশমান মন যেন নানা জিনিস নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারে, আনন্দ ও খেলার সাথীর অভাবে তাকে নিজদেহের দিকে যেন মন দিতে না হয় এরূপ হওয়া চাই।

কৈশোরে

বাল্য পার হয়ে বালকবালিকা যখন কৈশোরে উপনীত হয় তখন যৌনবাসনার প্রকাশে কিছুটা অভিনবত্ব ঘটে। বালকের জ্ঞানের পরিধি তখন অনেকটা বেড়েছে, গৃহের গণ্ডি ছেড়ে সে বৃহত্তর সমাজে মেশবার সুযোগ পেয়েছে; তার বুদ্ধি ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন বহু জিনিস আসে তার আত্মবিকাশের পথে। এগুলি তার মনে নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান দেয়, মনে তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। বাল্যে যে বালক গোপনে নিজ যৌনঅঙ্গ সঞ্চালন ক'রে আত্মরতি

থেকে পুলক লাভে চেষ্টিত হত, সে এখন মনে মনে মানসী মানবীর সঙ্গ কামনা করে কিন্তু লজ্জায় সংকোচে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না। মন তার রঙিন কল্পনার জাল বোনে কোন একটি বালিকাকে ঘিরে; তাকে খুশী করতে পারলে তার আনন্দ; তার সেবার জন্য, তার মনযোগানের জন্য দৈহিক পরিশ্রম করতে, কষ্টস্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত নয়। কিশোরের মন আত্মমুখী নয়, বহির্মুখী। দেহ তার অনেকখানি বেড়ে ওঠে, যৌন অঙ্গ পুষ্ট হয়, কণ্ঠস্বর হয় ভারী ও গম্ভীর। দেহচর্চার দিকে অনেকের ঝোঁক যায়, দেহকে সুঠাম, সুশ্রী বলিষ্ঠ করতে চায় তারা; কতক আবার মানসিক উৎকর্ষতা লাভের প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করতে কঠোর পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়। কৈশোর মানব জীবনের বৃদ্ধি ও পরিণতির পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল। যৌনবাসনা একালে নগ্ন রূপে প্রকাশ পায় না; কিশোরের উন্মাদনাময় মন সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। উপযুক্ত পরিবেশে লালিত পালিত হ'লে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে উন্নত আদর্শের অনুসরণ করে।

কিশোরী

বালিকা যখন কৈশোরে উপনীত হয় তখন তার যৌনমানসে যে যে পরিবর্তন ও ভাবকল্পনা জাগে তা কিশোরের তুলনায় অনেক বেশী। দেহের পরিবর্তন হয় সবচেয়ে লক্ষ্যনীয়। দেহলতা যেন পল্লবিত, কুসুমিত হয়ে ওঠে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় নিটোল লাবণ্য-যুক্ত, কুসুমকোরকের মাধুরী দেখা দেয় তার দেহশ্রীতে। যৌনবাসনার উচ্ছলতা তার মনেও দেয় দোলা। সে তখন কিশোরের মতন বহির্মুখী হয় না, হয় অন্তর্মুখী। আত্মসচেতন হয়ে ওঠে সে এবং নিজেকে অপরের চোখে, বিশেষ ক'রে পুরুষের চোখে সুন্দর দেখাবার জন্য প্রয়াস আসে। অনেকে প্রসাধনের প্রতি দৃষ্টি দেয় এই সময়। কি রঙের কাপড় পরলে, কি ধরণের গহনা ব্যবহার করলে, কি-ভাবে চুল বাঁধলে, কেমন ক'রে চোখে কাজল টেনে দিলে নিজেকে সুশ্রী করা যায় তা মনকে পেয়ে বসে। নিজেকে মনোহর করার জন্য যত্নেরও ত্রুটি হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মেই কিশোরীর মনে আত্মসজ্জাপ্রীতি দেখা দেয়। ফুলের পাপড়ির রঙ ও গন্ধ যেমন মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য, নারীর দেহলাবণ্যও প্রকৃতি দিয়েছেন পুরুষকে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই।

যৌবনাগমে কিশোরীর দেহে আসে পরিবর্তন; তার সঙ্গে মনের ভাবধারাতেও পরিবর্তন দেখা দেয়। যৌনপ্রেরণা প্রবল হলে দেহের

রহস্যময়তা সম্বন্ধে সে ভাবিত হয়ে ওঠে। কখন কখনও তার মনে জাগে বিদ্রোহ ; নিজদেহের ওপর সে বিরক্ত হয়ে ওঠে, যৌনজীবনকে মনে করে ঘৃণ্য, কুরুচিকর। নারীর যৌনজীবনের প্রতি এরূপ বিকৃত এবং বিরূপ মনোভাব গ'ড়ে উঠলে সে-কিশোরী পুরুষকে ঘৃণা করে ; প্রকৃতি দেবীর বিদ্রোহিনী সন্তান সে। তবে এরূপ নারীর সংখ্যা খুবই কম ; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের অনেকের আবার মনোভাবের পরিবর্তনও ঘটে। আগে যার প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা, তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে নিজের অন্তরে ; আগে যাকে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছে, তাকে প্রীতিভরে কাছে টানতে চায়। পুরুষের কাছে নারীর মন তাই হেঁয়ালি-ভরা। অনেক সময় সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, ভাবে নারীর মন আর গভীর বন দুইই সমান, ভিতরে কি আছে কে বলবে? দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

জীবনের প্রতি সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিশোরী যখন পূর্ণ নারীত্বের দিকে এগিয়ে যায়, তার মনে কামনার তরঙ্গ ওঠে, পুরুষের দেহের আকর্ষণ সে অনুভব করে নিজমনে। কিশোরীর পক্ষে এটি অনুরাগ-প্রধান যুগ। যার প্রতি অনুরক্ত হয় তাকে নিবিড় ক'রে পেতে চায় দেহে মনে। স্ত্রী-পুরুষের সকল প্রেমের মূলেই যৌন আবেগ আছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে—যদিও তার সংখ্যা খুবই কম—এ আবেগ স্থূলভাবে প্রকাশ পায় না, আদর্শের পরশ পাথরের স্পর্শ দিয়ে তারা যৌনকামনাকে কামগন্ধহীন অভিনব রূপ দান করে, প্রেমাস্পদকে তখন তারা তোলে দেবতার পর্যায়ে। এদের নিবিড় অনুরাগ নির্মল প্রেমকুসুমরূপে বিকশিত হয় কিন্তু এর মূল প্রেরণা গোপন থাকে মনের গভীরে যৌনবাসনার প্রচ্ছন্ন স্তরে।

নব অনুরাগিনী তার প্রিয়জনকে অবলম্বন ক'রে মনে কল্পনার জাল বু'নে চলে কিন্তু সংকোচে, লজ্জায় নিজেকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতায় দেবযানীর কথায় অনুরাগিনী কিশোরীর মনোভাব ব্যক্ত হয়েছেঃ

পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।

* * * *

কিশোরীর বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবাসনার অভিনব প্রকাশ ঘটে তার সলজ্জ আচরণে। বাল্যের চঞ্চলতা শান্ত হয়ে আসে। দেহ সম্বন্ধে বেশী সচেতন হওয়ায় তার গতিতে আসে ধীরতা, মনের চঞ্চলতা প্রকাশ পায় চোখের চপলতায়। বৈষ্ণবকবি কিশোরী শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধিক্ষণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি সার্থক। কবি বলেন, শ্রীরাধিকা বাল্যকাল পার হ'য়ে এসেছেন ; তাঁর—

চরণক চপলতা নয়ন পেল
নয়নক ধৈরজ চরণ গেল।

বাল্যে রাধিকার চলাফেরায় ছিল চপলতা ; এখন চরণের চপলতা গেছে নয়নে ; চঞ্চল নয়ন এখন সুন্দরের সন্ধানে এদিকে ওদিকে ঘোরে। বাল্যের সরল চোখের স্থির চাহনি এখন আর নাই, চোখের সে ধীরতা গেছে চরণে।

নারীর, বিশেষ করে কিশোরীর, পুরুষের সম্মুখে সরম সংকোচপূর্ণ আচরণের মূল কারণ সন্ধান করতে হবে যৌনপ্রবৃত্তির গভীরে। প্রাণিজগতে দেখা যায় যৌনপ্রেরণার তাগিদ বেশী দেখায় পুরুষ। স্ত্রী-জীবের সম্মতি লাভের জন্য পুরুষ যেন সাধ্যসাধনা করতে থাকে ; স্ত্রী বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়ে উদাসীন ভাব দেখায়। যৌনকার্যে স্ত্রী-জীব সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয়ই থাকে। কাজেই পুরুষ যখন আতিশয্য দেখিয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন ও যৌনসম্মতি লাভের চেষ্টা করে, স্ত্রীজীব যেন এই ভাবই প্রকাশ করে—'আরো সাধ্যসাধনা করো, তবে বাসনা পূর্ণ হবে।' প্রকৃতির রাজ্যে জীবজগতে আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিস্তারের যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলেছে তাতে কেবল সবল সক্ষম জীবই যৌননির্বাচনে জয়ী হতে পারে। স্ত্রী-জীব আপাতঃ উদাসীনতা দেখিয়ে পুরুষকে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার সুযোগ দেয় ; এইভাবেই সে উপযুক্ত সবল পুরুষ-জীব নির্বাচনেরও সুযোগ পায়। স্ত্রী-জীব যদি যে-কোন পুরুষের যৌন আবেদনের কাছেই আত্মসমর্পণ করতো তবে কি প্রাকৃতিক যৌননির্বাচন সম্ভবপর হত ?

মানবসমাজে যৌননির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নাই। পুরুষকে সঙ্গিনী লাভ করার জন্য অপর পুরুষের সঙ্গে দৈহিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হয় না ; সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ, বিদ্যা, পদমর্যাদা, কুলশীল, রূপগুণ প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় বিবেচনা ক'রে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। যৌননির্বাচনের

পরিবর্তে প্রবর্তিত হয়েছে সামাজিক নির্বাচন। স্ত্রীলাভ করার জন্য পুরুষেরা পরস্পরের সঙ্গে দৈহিক শক্তির প্রতিযোগিতায় নামে না, তাদের প্রতিযোগিতা এখন মানসিক শক্তির বিকাশ দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনে। যৌনপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগ তাই বর্তমানের সভ্যমানুষের জীবনে সোজাসুজি যৌন লালসারূপে প্রকাশ পায় না, মানুষের নানা কর্মোদ্যমে এ আবেগ প্রচ্ছন্ন থেকে শক্তি যোগায়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত—যার ভিতর দিয়ে ভাবুকের সৃজনশীল মন নব নব সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করে, তার প্রেরণার মূলে রয়েছে যৌন আবেগের সুষ্ঠু শুভ্র মার্জিত রূপ। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক শিল্পী, তাঁদের ধ্যানের বস্তুকে রূপদান ক'রে সার্থক ক'রে তুলতে কী নিবিড় অনুরাগ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয়ই না দিয়ে থাকেন! সাহিত্যিক তাঁর মানস কল্পলোকের ভাবরাশি কথার জালে বুনে বুনে সাজিয়ে তোলেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তন্ময় হ'য়ে থেকে, বৈজ্ঞানিক নূতন তথ্যের সন্ধানে কঠোর সাধনায় মগ্ন হ'য়ে থাকেন; শিল্পী মনের রঙে রসে তিলে তিলে সৃষ্টি করেন তিলোত্তমা। যে অতিরিক্ত মানসিক শক্তি এদেরকে কর্ম সাধনার পথে চালিত করে, কোথায় তার মূল উৎস? যৌন আবেগ সঞ্জাত বিপুল উদ্যমকে মানুষ যখন অন্য কোন প্রিয় কাজ সাধন করতে নিয়োজিত করে তখন তা অধ্যবসায় ও নিষ্ঠারূপে দেখা দেয় তার জীবনে।

যৌন আবেগের রূপান্তর

প্রবল যৌনশক্তিকে মানুষ মহত্তর কল্যাণকর কাজে লাগিয়েছে, ইতর প্রাণীর পক্ষে যা সম্ভবপর হয়নি। বাধাহীন দুরন্ত বন্যার জল উদ্দাম হ'য়ে কূল ছাপিয়ে, শস্যক্ষেত ডুবিয়ে দিয়ে অশেষ ক্ষতি সাধন ক'রে চলে যায়। কিন্তু তাকে বাঁধ দিয়ে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা দিয়ে ফলহীন ঊষর ভূমিকে করা যায় উর্বরা, সুজলা সুফলা। যৌনপ্রবৃত্তিকে এইভাবে সুচালিত ক'রে মানুষের মনোভূমি সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ করা চলে। বস্তুতঃ মানুষের দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—এক কথায় সকল প্রকার উন্নতির প্রথম সোপান হল যৌনপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখা। কেননা, মানবের প্রধান সম্পদ যে মন ও বুদ্ধি তা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ঘূর্ণিঝড়ে পড়লে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে। সে অবস্থায় মনের একাগ্রতার অভাবে কিশোর বা যুবা আত্মোন্নতির সাধনায় চিত্ত নিবেশ করতে পারে না; ফলে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি ক্ষণিক মোহের রঙিন উত্তেজনায় বৃথা অপচয় ক'রে দেহ ও মনের দিক দিয়ে তারা

দেউলে হ'য়ে পড়ে। আত্মসংযমের উপযোগিতা সম্বন্ধে ম্যাক্ডুগাল বলেছেন ঃ

বাল্যে ও যৌবনে যৌন আবেগের দমন ও সুপরিচালন যে-কোন সভ্য সমাজের রক্ষা এবং বৃদ্ধির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। স্ত্রীলোকের দেহের প্রতি শ্রদ্ধা এরূপ কামনার দমন ও সুচালনের একটি প্রধান উপায়। এ ব্যাপারে মা এবং বোনের প্রভাব বিশেষ উপকারী। নারীমাত্রেই স্বভাবতঃ যদি পুরুষের যৌনকামনা জাগানোর সামগ্রী ব'লে বিবেচিত হয়, তবে সে পুরুষের কাছে গণ্য হবে যৌন উত্তেজনা পরিতৃপ্ত করার প্রধান বস্তুরূপে, এবং নারী ও পুরুষের জীবনে বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নগ্ন যৌনক্ষুধা ও অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করবে। আফ্রিকার নিগ্রোজাতির কোন কোন শাখায় এরূপ অবস্থা বর্তমান আছে ব'লে তারা শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে প'ড়ে আছে। কাজেই নারীর প্রতি পুরুষের উপযুক্ত মনোভাব গ'ড়ে তোলা জাতির অগ্রগতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এজন্য যৌনকামনা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হবার আগে থেকেই বালক ও কিশোরের মনে নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলতে হবে।

ব্রহ্মচর্য ও চিত্তশুদ্ধি

যৌনকামনা জীবের একটি প্রধান ধর্ম। সৃষ্টিরক্ষার জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। প্রকৃতির নিয়মেই এ বাসনা দুর্বার শক্তিতে বিরাজ করে সমগ্র প্রাণি-জগতে ও উদ্ভিদ জগতে। এ কামনা যার মধ্যে দুর্বল, দেহ তার পঙ্গু বা অপুষ্ট, মন তার নিষ্ক্রিয় ও তেজোহীন। জমির চারদিকে আলের বাঁধ দিয়ে জল ধ'রে রাখার মত দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে সংযমের বাঁধে আটকে রেখে সভ্য মানুষ জীবনকে মহনীয় শোভন সুন্দর ক'রে গড়ে তোলার শক্তি আয়ত্ত করেছে। ব্রহ্মচর্য পালনের ভিতর দিয়ে মানুষ যে শক্তি সঞ্চয় করে তা অন্য কোন উপায়ে লাভ করা সম্ভবপর নয়। যৌন সংযম দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা ও নির্মলতা সাধিত হয়ে থাকে।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—এই ছয়টিকে মানুষ রিপু আখ্যা দিয়েছে। এরা তার অন্তরে বিরাজ ক'রে, তার মনের ঘরে বাসা বেঁধে বাস ক'রে তার চিন্তাধারা ও আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ছয়রিপুর প্রধান হল প্রথম রিপু কাম। কামরিপুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা অত্যন্ত দুরূহ। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যাঁরা অগ্রসর হন তাঁদেরকে ক্ষুরধার পথ দিয়েই চলতে

হয় ; রুদ্ধ যৌন আবেগ অনেক সময় স্থিরচিত্ত মানুষেরও সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতির দেওয়া এই দুর্বার শক্তিকে আয়ত্তাধীনে রাখা সংসারী মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন, একে ব্যর্থ ক'রে দেওয়াও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়। আমাদের দেশে মানব চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞ ঋষিগণ যৌন-সংযমের ওপর ভিত্তি ক'রে জীবগঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বালক ও কিশোরকে প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য ধারণ ক'রে বিদ্যা বিনয় সদাচার অভ্যাস করতে হত গুরুগৃহে বাস ক'রে। সেখানে বিলাসিতার কোন প্রশ্রয় ছিল না ; যৌনবাসনার উদ্রেক করে যে সকল জিনিস, যেমন ফুলের মালা, চন্দনাদি সুগন্ধি দেহলেপন দ্রব্য, কোমল শয্যা, উত্তেজক খাদ্য- এ সব তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। মিতাহারী, মিতাচারী হ'য়ে, কঠোর শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে জীবন যাপন ক'রে কিশোরেরা যৌনবাসনার প্রথম আবেগ ধারণ করত সংযতচিত্তে।

বর্তমান সমাজ ও যৌন আবেদন

বর্তমানে গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা আর নাই। বিদ্যা অর্জনের জন্য কিশোর এখন গুরুর সান্নিধ্যে বাস করে না। গুরু-গৃহের পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে ছাত্রগৃহ ; সেখানে শিক্ষক আসেন, ঘণ্টা বাজে, ঘড়ি ধ'রে স্কুল কলেজের কাজ চলে। বিদ্যাশালা হয়েছে কতকটা পণ্যশালা, বিদ্যাবিক্রয়ের বড়বাজার। এখানে প্রতি ছাত্রের ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখা, তার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা সম্ভবপর হয় না। পূর্বে আদর্শ গুরু ছিলেন একাধারে শিক্ষক, পিতা, বন্ধু ও আত্মোন্নতির পথে পরিচালক ; গুরুগৃহ ছিল একাধারে গৃহ ও বিদ্যাসাধনার আশ্রম। বর্তমানে বিদ্যাভবনে গৃহের পরিবেশ নাই, গৃহে বিদ্যালয়ের প্রভাব ও জ্ঞানালোক নাই। তার ফলে বালক ও কিশোরের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন গঠনের দায়িত্ব ভাগ হয়ে গেছে। এ দায়িত্ব এখন গৃহের এবং বিদ্যালয়ের ; সমাজের ও রাষ্ট্রের। কিন্তু ভাগের মা গঙ্গা পায় না, এই তো বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়।

মানুষের জীবন যাপনের প্রণালীতে তার রীতিনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও তার জীবধর্মে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। প্রকৃতির নিয়মে নির্দিষ্টকালে বালকবালিকা কিশোরকিশোরীর মনে আসে যৌনপ্রবৃত্তির সাড়া। অনেক সময় গৃহের আবেষ্টনী ও সমাজের পরিবেশ তাদের যৌন বাসনাকে আরো উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে ; যৌন আবেদন পূর্ণ সিনেমার ছবি

কিশোর কিশোরীর তরুণ ভাবপ্রবণ মনে চাঞ্চল্য ঘটায়। ইতরপ্রাণীর জীবনে যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে, যৌনক্রিয়ার সঙ্গিনী নির্বাচন ক'রে নিতে জীবকে শুধু পূর্ণবয়স্ক হলেই চলে না, দৈহিক শক্তিতেও প্রতিযোগীদের চেয়ে শক্তিমান হতে হয়। তারা যৌন আবেগ পরিতৃপ্ত করার অন্য কোন উপায় জানে না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান জীব; বাল্যকাল থেকেই সে স্বাভাবিক আত্মক্ষয়কারী উপায়ে যৌনক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। এজন্যই বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষায় রুচিবোধ, সংযম ও উচ্চ আদর্শের সমন্বয় থাকা উচিত; এবং সন্তানের মঙ্গলকামী পিতামাতার পক্ষে শিশুর বয়োধর্ম ও মানসিক অবস্থার বিবর্তন সম্বন্ধে যেমন খুঁটিনাটি বিষয় জানা দরকার তেমনি শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল গৃহের পরিবেশ সৃষ্টি করাও একান্ত আবশ্যক।

গৃহের পরিবেশ বল্‌তে সাধারণতঃ বুঝি যে-অবস্থার মধ্যে শিশু দিন দিন বেড়ে ওঠে, যা দেখে, যা শোনে, যা পড়ে, যা ভাবে, যা অন্যকে করতে দেখে, যা নিজে অনুসরণ করতে চায় এসবের সমবায়ে গঠিত প্রভাবমণ্ডল। শিশুর মনে স্ত্রীলোকের প্রতি সমীহভাব গ'ড়ে তোলার জন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকদের রুচি ও শালীনতাসম্পন্ন কাপড়চোপড় পরা দরকার; তাদের পোষাক পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে শিশুরা স্ত্রীলোককে সম্ভ্রম করতে শেখে। দ্বিতীয়তঃ বালক বালিকাদের সম্মুখে এমন আদর্শ তুলে ধরা উচিত যা লাভ করতে হ'লে তাদের আত্মসংযম, নিষ্ঠা ও একাগ্রভাবে পরিশ্রম করার অভ্যাস করতে হবে। কিশোরের সজীব কৌতূহলী মন যেদিকে আকৃষ্ট হয় সেদিকেই আনন্দের সঙ্গে অগ্রসর হয়। বালককে কোন কাজে নিবিষ্ট করতে পারলে নিজেই সে সকল-শক্তি প্রয়োগ করবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তৃতীয়তঃ যৌন জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত গোপনীয়তা বা কোন বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা যেমন অনাবশ্যক তেমনি বালককে অযাচিত ভাবে যৌনশিক্ষা বা সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতে যাওয়াও নিষ্প্রয়োজন। অনেকের ধারণা বয়স্ক ব্যক্তিদের যৌনব্যাপারে কিছুমাত্র আভাসও বালকদের দেওয়া সঙ্গত নয়। তারা মনে করে সন্তানদের কাছ থেকে এসব কথা গোপন রাখলে তারা কিছুই জানবে না, কিছুই শিখবে না। কিন্তু প্রকৃতির বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পাঠ কারো অবিদিত থাকে না।

আবার কতক লোকের ধারণা যৌন জীবনের খুঁটিনাটি কিশোরকে বুঝিয়ে দিলে তার পক্ষে আত্মসংযম অভ্যাস করা সহজ হবে। এ যুক্তিও বিচারসহ

নয়; জ্ঞানবৃক্ষের ফল সব সময়ই মধুময় হয় না। কৌতূহল জাগিয়ে দিলে কিশোর যে সেখানেই নিবৃত্ত হবে তা আশা করা বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ডাক্তারি শিখতে গিয়ে যে সকল ছাত্রছাত্রী মানবদেহের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়, যৌন অঙ্গ, তাদের কার্য ও ফলাফল সম্বন্ধে সব কিছু শেখে, তারা অন্য কিশোর যুবার চেয়ে যৌনপ্রবৃত্তি দমনে অধিক সাফল্য দেখালে এ যুক্তি মেনে নেওয়া চলত। কিন্তু সত্যই কি তারা অন্যান্য কিশোর যুবার চেয়ে বেশী সংযমের পরিচয় দিয়ে থাকে? চতুর্থতঃ, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যাতে মধুর বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সন্তানের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে যাতে সে সম্পর্কও দৃঢ় হয় হিতকামী জনকজননীর সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। সরলভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে যৌনজীবন সম্বন্ধে কোন কথা উঠলে যথাসম্ভব সরলভাবেই তার উত্তর দেওয়া উচিত। উপদেশ দেবার জন্য নয়, স্বাভাবিকভাবে অন্য কোন বিষয় আলোচনার সূত্র ধ'রে কিশোরদের কাছে একথা বলা চলে যে, সন্তান-উৎপাদন প্রকৃতিরই নিয়ম; গাছপালা থেকে পশুপক্ষী সকলেই বংশরক্ষার জন্য সন্তানের জন্ম দেয়। মানুষের ক্ষেত্রেও একই প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ ক'রে চলেছে। প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায় একটি নির্দিষ্ট বয়স না হলে গাছপালা বা জীবজন্তুর ফল ও সন্তান হয় না; মানুষের জীবনেও সেইরূপ। বাল্য ও কৈশোর দেহের বৃদ্ধি ও মানসিক শক্তি বিকাশের সময়। এই কালে দেহের এবং মনের তেজ সঞ্চয় না করলে সারাজীবন দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়।

যূথ-প্রবৃত্তি

দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করা প্রাণীমাত্রেরই স্বভাব। জীবজগতে এর ব্যতিক্রম খুব কম। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী দল বেঁধে বাস করে। এতে তাদের খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। এই দুটি প্রধান তাগিদেই তারা হয়ত প্রথম দলবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিল। বিপুল সংখ্যায় কোন একস্থানে বাস করায় খাদ্যাভাব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কাজেই প্রথমে যে-খাদ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য এরা একত্রিত থাকত, কোন কোন ক্ষেত্রে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও জীবের মজ্জাগত প্রবৃত্তি লোপ পায়নি। বন্যজীব যারা নিজের শক্তিতেই খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম, তাদের কেউ কেউ একাকী নিজনিজ সঙ্গিনী নিয়ে বাস করে। যেমন বাঘ, সিংহ, ভালুক প্রভৃতি। শিকার ধরার সুবিধার জন্য মাংসাশী প্রাণীর কতক দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে, যেমন হায়েনা, নেকড়ে প্রভৃতি। তৃণভোজী জীব—হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে যাদের সর্বদা আত্মরক্ষা করতে হয়—তাদের মধ্যেই দলপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। হরিণ, ছাগল, গরু ঘোড়া, মোষ, বাইসন, জেব্রা জিরাফ প্রভৃতি বহু সংখ্যায় একত্রে বাস করে। একতা যে বল তা তারা জীবনসংগ্রামের বাস্তবক্ষেত্রে ঠেকে শিখেছে এবং সে শিক্ষা কাজে লাগিয়েছে। এ প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বজাতীয়দের দলে মিশে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা। গরু, ঘোড়া, ছাগল, মোষ দলছাড়া হয়ে পড়লে কেমন একটা অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকে, দলে যোগদান ক'রে নিজেকে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে, পরস্পরের গায়ে ঘেঁষাঘেষি ক'রে এদের তৃপ্তি।

মানুষের জীবনে

জীবের এই প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবেও মিশে আছে এবং তার অগ্রগতির পথে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষ সমাজে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে; এতে তাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতি সাধনের সুবিধা হয়েছে। আদিমানব বন্যপশুর মতই আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রথম দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে সুরু করেছিল; এইভাবেই গড়ে উঠেছিল পরিবার ও গোষ্ঠী। তারা কেবল বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকেই নিজেদের রক্ষা করত না, অন্য

মানবগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাদের লড়াই করতে হয়েছিল বাঁচার তাগিদে। বর্তমানের সভ্য মানুষ প্রকৃতির ওপর অনেকখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে; বিজ্ঞানের বলে এমন সব হাতিয়ার সে আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে তাকে আর দলবদ্ধ হতে হয় না। এখন তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন এমন অপর সভ্যমানবগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে, যারা বিজ্ঞানের শক্তিকে নিজেদের পশুশক্তি বাড়ানোর কাজে লাগিয়েছে।

দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও আমাদের নিজেদের আচরণ ও মানসিক অবস্থা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সঙ্গিহীন জীবন মানুষের কাছে একান্ত দুর্বহ। মানুষ অপর মানুষের সঙ্গ কামনা করে; একই ভাবের ভাবুক, একই ধরণের জীবনযাপনে অভ্যস্ত, একই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি যেন একটি অদৃশ্য আত্মীয়তার সূত্র অন্তরে অনুভূত হয়। সহরবন্দরে দেখা যায় একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকেরা পাশাপাশি গ'ড়ে তোলে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাদের কর্মকেন্দ্র। এর ফলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এক জায়গায় ভীড় করে কেন? বহুলোকের সমাবেশ দেখলে খুশী হয় না এমন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। জনতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে মানুষের মনে। সে লোকসংঘ যদি স্বজাতীয় হয়, যদি একই উদ্দেশ্যে একত্র সমবেত হয়ে থাকে, তবে তাতে যোগদানকারী মানুষ যে অন্তরে পুলক অনুভব করে তা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি। সভাসমিতিতে, খেলার মাঠে, সিনেমা থিয়েটার দেখার সময় দর্শক বেশী থাকলে যে অতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করা হয় তার কারণ হল এই যে, একই উদ্দেশ্যে মিলিত জন-সমষ্টির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ায় দল-প্রবৃত্তি সার্থকতা লাভ করে। অভিনয় যত ভালই হোক্ না কেন শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অল্পসংখ্যক শ্রোতা তা থেকে পূর্ণ আনন্দ পায় না। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার মাঠে হাজার হাজার দর্শক সমবেত হয়। তাদের হর্ষোল্লাস একই সঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। যদি তাদের বসবার এমন বন্দোবস্ত করা যায় যাতে দর্শকগণ প্রত্যেকেই খেলা দেখতে পায়, কিন্তু পরস্পরকে দেখার সুবিধা না থাকে তবে কি খেলা দেখার এতখানি আকর্ষণ থাকবে?

সংগ্রহ প্রবৃত্তি

কোন কিছু সংগ্রহ ক'রে সঞ্চয় ক'রে রাখার প্রবৃত্তি কতক নিম্নস্তরের প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়; অন্ধ আবেগের বশে, কিছু না বুঝেই তারা এরূপ ক'রে থাকে কিন্তু মানুষের জীবনে এ প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায় সুস্পষ্ট এবং বুদ্ধি দ্বারা চালিত। শিশু যখন খেলতে শেখে তখন থেকেই তার ঝোঁক হয় খেলার সামগ্রী সংগ্রহের দিকে। বাস্তব জীবনে এদের প্রয়োজনীয়তা কতখানি বা এদের প্রকৃত মূল্য কি তা বিচার করে দেখার ক্ষমতা শিশুর থাকে না। সে যা সংগ্রহ করে তাই তার কাছে মহামূল্যবান। তেঁতুল, চন্দন প্রভৃতির রঙিন বীজ, পাখীর রঙিন পালক, সিগারেটের খালি বাক্স, কাচের টুকরা, রঙিন কাচের ভাঙা টুকরা, পুতির দানা, দেশালাই এর বাক্স প্রভৃতি শিশু জমিয়ে রাখে নিজের তহবিলে। শৈশব পার হয়ে বালক-বালিকা যখন কৈশোরে উপনীত হয় তখন তারা শিশুর সংগৃহীত জিনিসকে তুচ্ছ মনে করে, নিজেরা সংগ্রহ করে এমন সব জিনিস যা তাদের কাছে মনে হয় মূল্যবান। ঠিক এমনিভাবে বয়স্ক ব্যক্তিও সঞ্চয় করে, তবে তার সংগৃহীত বস্তুর সঙ্গে শিশু-কিশোরের সংগৃহীত দ্রব্যের কত প্রভেদ! জীবনের সকল পর্যায়েই সংগ্রহ-প্রবৃত্তি মানবের মনে সঞ্চয়ের প্রেরণা যোগাচ্ছে। যে কোন দেশেই এমন বয়স্ক ব্যক্তি একান্ত বিরল যারা বাল্যে কোন-না-কোন জিনিস যত্নের সঙ্গে সঞ্চয় করেনি। এই প্রবৃত্তি যদি প্রবল হয়ে ওঠে তখন সঞ্চয় করা মানুষের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ লোকে সমাজে কিপটে, কৃপণ, কঞ্জুস আখ্যা পেয়ে থাকে।

নির্মাণ প্রবৃত্তি

বাসস্থান নির্মাণ করা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কারো কাছে না শিখেই বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন প্রকার বাসা নির্মাণ করে। উই এর ঢিবি, পিঁপড়ের বাসা, মৌমাছি-বোলতার চাক, বাবুই পাখীর বাসা—এদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট নির্মাণ কৌশল আছে। প্রবৃত্তির বশেই এরা বাসা নির্মাণ ক'রে থাকে। মানুষ এই স্বাভাবিক নির্মাণ প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি, জ্ঞান ও সুরুচি দ্বারা মার্জিত ক'রে নূতন নূতন জিনিস গ'ড়ে তুলেছে, মানুষের সভ্যতাকে করেছে

সমৃদ্ধ। শিশু বাল্যে বালিমাটি দিয়ে ঘর তৈরি করে, পুতুল গড়ে, ডালপালা দিয়ে খেলাঘর নির্মাণ করে; এতেই তার আনন্দ। নির্মিত জিনিসের উপযোগিতা বা মূল্য যাই হোক্ না কেন সকল মানুষই নিজহাতে কোন কিছু তৈরি ক'রে সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করে। শিল্পী মূর্ত্তি গ'ড়ে বা ছবি এঁকে পায় আনন্দ, লেখক মনের ভাব রাশিকে কথায় রূপদান ক'রে উপলব্ধি করে নূতন কিছু নির্মাণের পুলকমাখা অনুভূতি। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক যে কেউ যা কিছু সৃষ্টি করে তার সঙ্গে মিশানো আছে স্রষ্টার মনের নিবিড় আনন্দ রস। সকল মানুষের জীবনে এটি চিরন্তন সত্য।

জীবনশিল্পী মানুষ

আগের অধ্যায়ে যে প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি মানুষের জীবন-সৌধের মূল উপাদান। সর্বদেশের, সর্বকালের সকল সমাজের মানুষের মধ্যেই চলেছে এই প্রবৃত্তির আলোড়ন এবং আচরণে ঘটছে তার প্রকাশ। মানুষের দেহের বাইরেকার এবং ভিতরের প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রপাতি-গুলি সকল সাধারণ মানুষেরই একই রকম; তাদের গড়ন ও কার্যকলাপ একই ধরনের। বিকলাঙ্গ এবং অদ্ভুত ধরণের অস্বাভাবিক কোন আকৃতি ছাড়া জগৎ-জোড়া মানুষের শরীরগঠন ও দেহের ক্রিয়াকলাপে কোন পার্থক্য নাই। তেমনি স্বাভাবিক মানুষমাত্রের মধ্যেই ক্রিয়াশীল রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। কারো মাঝে এদের কোন-কোনটি বেশী শক্তিশালী, কোন-কোনটি দুর্বল অথবা মাঝারি রকমের শক্তিসম্পন্ন। যার মধ্যে প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ হয় সুসমঞ্জস—একটিকে চেপে রেখে অন্যটি অতিমাত্রায় প্রবল হয়ে ওঠে না—তার জীবনযাত্রায় ও অন্যের সঙ্গে আচরণে স্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। মানবসমাজে সর্বত্র এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী।

বীজের মধ্যে যেমন গাছের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, ছোট চারাগাছের মধ্যে যেমন ফুলফলের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তেমনি মানবশিশুর মধ্যে প্রবৃত্তিগুলি প্রথমে থাকে সুপ্ত। পরে তার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে এদের বিকাশ ও বৃদ্ধি হ'তে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই বার্ধক্যে আবার এদের অধিকাংশেরই তেজ কমে আসে।

অনেক সময় আমরা খারাপ লোককে গালমন্দ দেবার সময় তার প্রবৃত্তির দোষ দিয়ে থাকি; বলে থাকি 'লোকটির প্রবৃত্তি অত্যন্ত জঘন্য'। বাস্তবিক, মানুষের জীবনে কোন প্রবৃত্তিই খারাপ বা অকেজো নয়, কিরূপে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবৃত্তি পরিচালিত হয় তারই ওপর নির্ভর করে এটি ভাল অথবা মন্দ কোন্ পর্যায়ভুক্ত হবে। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি জীবনে কতকগুলি শক্তির উৎসস্বরূপ; জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্তিগুলিই মানুষকে জয়ী ক'রে প্রাণী-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করতে সহায়তা করেছে। কোন একটি প্রবৃত্তি না থাকলে তার ফল যে শুভ হ'ত না তা বোঝা খুব কঠিন নয়। আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি ও ভয় না থাকলে মানুষ হ'ত অত্যন্ত অসতর্ক, কাণ্ডজ্ঞানহীন; ভবি-

জীবনে প্রবৃত্তির স্থান

ষ্যৎ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করেই সে হঠকারিতার বশে কাজ ক'রে বসত এবং পদে পদে বিপদ ডেকে আনত। শঙ্কালেশশূন্য মানুষ প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় শক্তির কাছে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াত না; ধর্মের কোন স্থান থাকত না তার জীবনে।

ক্রোধ না থাকলে উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন আমরা অতিক্রম করতে পারতেম না, কেননা কোন বাসনা প্রতিহত হলে বাধা জয় ক'রে বাসনাকে সার্থক করতে অতিরিক্ত শক্তির সঞ্চার করে ক্রোধ। ক্রোধহীন হ'লে অন্যায়ের প্রতিবাদে মানুষ রুখে দাঁড়ায় না; সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী দুষ্টের শাস্তিবিধানের জন্য যে কঠোর আইন মানুষ তৈরি করেছে, তার মূলে রয়েছে নৈতিক ক্রোধ।

অপত্যস্নেহ না থাকলে অধিকাংশ শিশুর পক্ষেই শৈশব পার হয়ে বাল্যে ও কৈশোরে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হত না। মাতৃস্নেহ শিশুর রক্ষাকবচ; মাতৃহৃদয়ে যদি এর শক্তি কম হয় তবে সন্তান পালন করতে যে সদাজাগ্রত উদ্বেগ ও কষ্টসহ্য করার ক্ষমতা দরকার তারও শক্তি কমে যাবে। পিতৃস্নেহের অভাব ঘটলে শিশুর উন্নতিতে সাহায্য করবে কে? অপত্যস্নেহের নির্মল শক্তি মানবকল্যাণকর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়; এ শক্তি না থাকলে মানুষ হ'য়ে পড়বে একান্ত স্বার্থপর, অপরের দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য কোন বাসনা তার মনে জাগবে না।

যৌন প্রবৃত্তি না থাকলে জীবসৃষ্টি হ'য়ে দাঁড়াত আকস্মিক ব্যাপার; সন্তানসন্ততি নিয়ে মানুষ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করত না, যৌন আবেগকে সংযত ক'রে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষ যে নূতন সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করে তা সম্ভবপর হত না, প্রেমের স্থান থাকত না মানুষের জীবনে, কাব্য উপন্যাস সংগীতের আনন্দদায়ক ক্ষমতা লোপ পে'ত। প্রাণীর জীবনধারা ও আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে বোঝা যায় বেঁচে থাকার কামনা জীবজগতে সর্বপ্রধান এবং রহস্যময় শক্তি। জীবের যতকিছু প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ এই কামনাকে সার্থক করার কাজে নিয়োজিত। সকল প্রবৃত্তিই জীবন-বাসনার প্রধান উৎস-কেন্দ্র থেকে শক্তি লাভ করে।

প্রবৃত্তির সংস্কার সাধন

প্রবৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, যেটি যতবেশী উদ্দীপ্ত হয় এবং সার্থকতা লাভ করে তার শক্তি তত বাড়তে থাকে। যেটির প্রয়োগ হয় খুব কম, তা দুর্বল ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়ে। জীবন-বৃক্ষের শাখার মত প্রবৃত্তিগুলি পর-

স্পরের সঙ্গে সমতা রেখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে মানুষের জীবন-বিকাশ হয় সুসমঞ্জস, কোন একটি প্রবৃত্তি অত্যধিক প্রবল হ'লে তার আচরণে তা প্রকাশ পায়, অনেক সময় তা জীবনে সাফল্য লাভের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে থাকে।

ভয় অত্যধিক হ'লে মানুষ স্বাভাবিক বুদ্ধি ও তেজের সঙ্গে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না ; ভীতি তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি পঙ্গু ক'রে দেয়। যৌনকামনা অতিরিক্তমাত্রায় প্রবল হ'লে মানসিক চাঞ্চল্যের দরুণ কোন কাজে সে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করতে পারে না ; দৈহিক শক্তি ও মানসিক উৎকর্ষতা লাভ তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ক্রোধ প্রবল হ'লে সে নিজের জীবন বিষময় ক'রে তোলে এবং অপর যে সব লোকের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয় তাদের মনেও বিরক্তি উৎপাদন করে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে ঃ সহজাত প্রবৃত্তি সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে, তার জোর কম হবে কি বেশী হবে তা মানুষ ইচ্ছামত ঠিক ক'রে নিতে পারে না, প্রকৃতি থেকে যে-পরিমাণ শক্তি নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে তাই তার মূলধন। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগতভাবে কি করার আছে ? এর উত্তরে বলা যায়—আত্মোন্নতির জন্য কৃতসংকল্প মানুষ চেষ্টা দ্বারা নিজের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে , প্রবল প্রবৃত্তিকে আত্মবিশ্লেষণ ও বুদ্ধি-দ্বারা সংযত করে, দুর্বল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে' নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সহজসাধ্য ক'রে দিতে পারে। পশুপক্ষী যা পারে না, তা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এইজন্যই বলা যায় মানুষ কতকটা নিজে তার চরিত্রের এবং ভাগ্যের রচয়িতা। মানুষ তার বুদ্ধি দীপ্ত চেষ্টা দ্বারা নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ক'রে কোন আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যেতে পারে, যেমন প্রতিকূল স্রোত ও বাতাসের বিরুদ্ধেও মাঝি তার নৌকাকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে পৌঁছতে পারে। স্রোত ও বাতাস অনুকূল হ'লে নৌকা চালানো হয় সহজ এবং দ্রুত, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'লে মাঝিকে হুঁসিয়ার হ'য়ে বাধাবিপত্তি জয় করতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। মানবজীবনতরী সম্বন্ধেও একথা খাটে। নিজের প্রবৃত্তির দিক থেকে এবং বাইরের প্রতিকূল অবস্থা থেকে যে প্রতিবন্ধক আসে তা জয় ক'রে যে ব্যক্তি উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে সেই সাধারণ পশুত্বের স্তর থেকে নিজেকে উন্নত পর্যায়ে তুলতে সক্ষম হয়। সাধারণ এবং অসাধারণ মানুষের জীবন পাশাপাশি পরীক্ষা ক'রে

দেখলে এর সত্যতা বোঝা যাবে। বেশীর ভাগ লোক যে পরিমাণ মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তির আবেগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তা পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার ক'রে সফল লাভের চেষ্টা করে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: মাঠে গরুকে একটি খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে চরতে দেওয়া হয়েছে; দড়িতে যতটুকু স্থান নাগাল পাওয়া সম্ভব, চেষ্টা করলে গরু খুঁটির চারদিকে ঘুরে ততটুকু স্থানের ঘাস খেতে পারে কিন্তু অধিকাংশ গরুই তা করে না। যেটির ক্ষুধা ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে হয়ত সেরূপ চেষ্টা করে। গরুর মালিক ইচ্ছা করলে খুঁটি তুলে দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠে গরুকে স্বাধীনভাবে চ'রে বেড়াবার সুযোগও দিতে পারে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একনিষ্ঠ চেষ্টা এবং কঠোর অধ্যবসায়সহকারে তাঁরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, আবিষ্কারক, সাহিত্যিক, ভগবৎসন্ধানী—কেউ নিজের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাঁদের কাম্য লক্ষ্যে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন নি; চিত্তের বিক্ষোভ উৎপাদনকারী প্রবৃত্তিগুলি দমন ক'রে, সজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন সাধনা দ্বারা তাঁরা কৃতকার্যতা লাভ করেছেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী—যাঁর যেমন সাধনা তাঁর সিদ্ধিলাভও তেমন।

অসাধারণ প্রতিভাবান অল্পসংখ্যক লোকের কথা বাদ দিয়ে সাধারণ লোকের আচরণ পর্যালোচনা করেও একথা বলা চলে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে উন্নতির জন্য চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। জীবন-ধর্মের আন্তর্নিহিত প্রেরণা হল আত্মবিকাশের, আত্মোন্নতির প্রেরণা। সদাজাগ্রত চেষ্টা দ্বারা মানুষ নিজের অবস্থার কিছু-না-কিছু উন্নতি করতে পারবেই, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই—সে চেষ্টা জ্ঞানলাভ করার জন্য হোক, অর্থ প্রতিপত্তি লাভ করার জন্য হোক কিম্বা অপরের কাছ থেকে প্রশংসা লাভের জন্যই হোক্। মানুষ স্বচেষ্টায় তার নিজের ভিতরকার পশুশক্তিকে প্রতিহত ক'রে এবং সেই শক্তিকেই শোধন ক'রে দেবশক্তিতে পরিণত ক'রে নেয়। এইভাবে সে এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে আত্মোন্নতির পথে। মানুষের সমগ্র জীবনটাই সংগ্রাম—তার নিজের সঙ্গেই সংগ্রাম, পশুভাবের সঙ্গে দেবভাবের সংগ্রাম। মনুষ্যত্বলাভের পথে আত্মসাধনার উল্লেখ ক'রে কবি বলেছেন:

মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে মিলি যবে পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে।

সহজাত প্রবৃত্তি যখন অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রবল হ'য়ে মানুষের আত্মবিকাশ ব্যাহত করে তখন তাকে বলি রিপু। এগুলিকে সংযমের বাঁধনে বেঁধে নিয়ন্ত্রিত করার সাধারণতঃ তিনটি প্রক্রিয়া আছে—দমন, পরিহার পরিচালন।

দমন

সকল প্রবৃত্তিই আচরণে প্রকাশ পাওয়ার আগে আলোড়ন জাগায় মনে। পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠলে তখন তা চেপে রাখা বড়ই কঠিন কিন্তু প্রথম অবস্থাতেই আত্মবিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা অসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য এ জন্য মনের যথেষ্ট শক্তি থাকা দরকার। শুধু তাই নয়, নিজের মন দিয়ে অন্যের মন বুঝবার ক্ষমতা এবং কোন রিপুকে প্রশ্রয় দিলে তার পরিণাম কি হতে পারে তা অনুমান করার মত কল্পনা শক্তিও থাকা আবশ্যক। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

ক্রোধ মানুষের একটি বড় রিপু। অত্যন্ত প্রবল হ'লে এ প্রবৃত্তি সামান্য বাধা বা প্রতিবন্ধক পেলেই আগুনের মত দপ ক'রে জ্বলে' ওঠে। এরূপ লোকের যদি কোন কর্তৃত্ব থাকে তবে তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের জীবন হ'য়ে ওঠে দুর্বহ; তাদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি কর্তার ক্রোধ উদ্রেক করে, তাদের নির্বুদ্ধিতায় তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি যদি কল্পনা করতে পারেন অবস্থাটা সম্পূর্ণ ঘুরে গেলে অর্থাৎ তাঁকে ঐ রকম ক্রোধের দাপট সহ্য করতে হলে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হত, তবে তিনি কিছুটা সংযত না হয়ে পারবেন না। আর তাঁর মনে করা উচিত প্রকৃতি যাদেরকে মানসিক সম্পদে কিছুটা হীন ক'রে রেখেছে এবং এর ফলে যারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সবাইকে তুষ্ট করতে পারে না তাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না ক'রে বরং সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।

পরিহার

যে অবস্থা কোন একটি বিশেষ রিপুর প্রবল হয়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল তা যতদূর সম্ভব পরিহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। আগুন নেভানোর চেয়ে যাতে জ্বলে' না ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই সমীচীন, কেননা যে প্রবৃত্তি বারবার উত্তেজিত হতে থাকে ক্রমে তা শক্তি সঞ্চয় ক'রে প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা দমন করা ক্রমশই কঠিন সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। যে শিশুর মনে ভয় প্রবল, তাকে ভীতিকর অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ক্রমে তার মনে সাহস সঞ্চারের ব্যবস্থা করা দরকার; এরূপ শিশুর ভয়ের মাত্রা ক্রমশঃ বেশী হয়ে পড়লে মানসিক দিক দিয়ে সে পঙ্গু হয়ে পড়তে পারে। ক্রোধ, লোভ ও যৌনকামনা সম্বন্ধে ও একথা সত্য। জ্ঞানীব্যক্তিগণ আপন মঙ্গল-কামী মানুষকে এসবের সংস্পর্শ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: মেয়েছেলে সিঙ্গিমাছ; হাত লাগলেই কাঁটা দেয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপু মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে সাধারণ পশুর স্তরে নামিয়ে রাখতে চায়, মানুষ চায় এগুলি জয় ক'রে উপরের স্তরে উঠতে। জয়-মানবদেহ যেন কুরুক্ষেত্র, সেখানে চলেছে জীবনব্যাপী মহাসমর। এখানে লাভের ভিতর দিয়েই মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। বিচারবুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত ক'রে, উত্তেজনা জাগাতে পারে যে সব পদার্থ তা যথাসম্ভব পরিহার ক'রে চলা প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ। আত্মোন্নতিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

পরিচালন

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে' মনে যে আলোড়ন তোলে তা প্রায়ই মানুষের স্বাভাবিক আত্মবিকাশে বিঘ্ন উৎপাদন করে; রিপুর উত্তেজনা মানুষের হিতাহিত বুদ্ধি লোপ ক'রে দেয়, তাকে করে অধোগামী। কিন্তু এই প্রবৃত্তি-দ্বারা-সঞ্চারিত অতিরিক্ত শক্তিকে মানুষ আত্মোন্নতির কাজে ব্যবহার করতে পারে; যে শক্তি তাকে নীচে নামাতে চায়, বিবেক ও স্থির বুদ্ধির সাহায্যে তা পরিচালিত ক'রে মানুষ তার কল্যাণকর প্রচেষ্টা সার্থক ক'রে তুলতে পারে। সাপের বিষ অন্যের পক্ষে প্রাণঘাতী কিন্তু সাপ নিজে তা পান ক'রে আপন তেজ বৃদ্ধি করে। প্রবৃত্তির আবেগ সম্বন্ধেও একই কথা। ক্রোধের উদ্দীপনা তর্জনগর্জনে, আস্ফালনে বা অহিতকর কোন কাজে বৃথা

ব্যয় না ক'রে বাধা জয় করার দুর্জয় শক্তিতে রূপান্তরিত করাও মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

প্রকৃতি ও তার কাজ

আগের অধ্যায়গুলিতে অনেক স্থানে প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আলোচনা ক'রে মানুষের জীবনে এর কি প্রভাব তা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। প্রকৃতি—যাকে ইংরাজিতে বলি নেচার—তা এক রহস্যময় দুজ্ঞেয় শক্তি। সমগ্র বিশ্বজগৎ-ব্যাপ্ত ক'রে প্রতিনিয়ত চলেছে এই শক্তির খেলা। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র থেকে ধরণীর ধূলিকণা পর্যন্ত সবকিছু প্রকৃতির শক্তিদ্বারা চালিত ও বিধৃত। বিজ্ঞান জগতে এবং আধ্যাত্মজগতে প্রকৃতির যে স্বরূপ ও শক্তির কথা স্বীকৃত হয়েছে তার মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। বিজ্ঞানী জানেন, বেঁচে থাকার এবং সন্তান উৎপাদন ক'রে বংশ বৃদ্ধি করার স্পৃহা সব উদ্ভিদের মধ্যে, সব জীবজন্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। কিন্তু স্পৃহা বা প্রেরণার মূল শক্তি সঞ্চার করল কে? বৃক্ষ যে মাটি থেকে রস নিয়ে বাতাস থেকে দারু-পদার্থ, (অঙ্গার ভাগ) সংগ্রহ ক'রে দেহগঠন করে, ফুল ফোটায়—সে শক্তি কে দিল ? বৃক্ষ যে যে উপাদান দিয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, ফুলফল আনে তা দিয়ে কি কোন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একটি ফুল বা ফল তৈরি করা সম্ভব ? বৈজ্ঞানিক বলেন প্রকৃতিই স্রষ্টা ; তার নিগূঢ় শক্তি বিশ্বভুবন জুড়ে অমোঘ নিয়মে কাজ ক'রে চলেছে।

ভারতের ঋষিগণও এই শক্তির সঙ্গে বিশেষভবে পরিচিত হয়েছেন, এর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ নেচার বা প্রকৃতির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেছেন স্থূল বহির্জগতে, ঋষিগণ মনোজগতেও এই শক্তির লীলা লক্ষ্য করেছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সংকলিত 'গীতার গান্ধী-ভাষ্য' গ্রন্থে প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

দেহকে, বস্তুকে যে গঠন করে, রূপ দেয়, যাহার শক্তি অপরিসীম, যে বীজকে বৃক্ষে পরিণত করে, ফুলকে ফলে, শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করে, যে জগৎ সংসার বস্তুতে ভরিয়া রাখিয়াছে, কর্ম্মে মুখর করিয়া রাখিয়াছে সেই শক্তির নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির আরো অনেকগুলি নাম আছে—যেমন 'অব্যক্ত', 'গুণময়ী', 'প্রধান', 'মায়া', 'প্রসব-ধর্ম্মিণী'। প্রকৃতির পরিচয় তাহার গুণের দ্বারা। তাহার গুণ অসংখ্য। কিন্তু উহার বিভাগ করিয়া মোটা তিনটা বড় বড় কোঠায় সব গুণ ফেলিয়া তাহার নাম দেওয়া

হইয়াছে সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্। যেখানে যাহার কিছু গুণ বা ধর্ম্ম আছে তাহা এই তিন গুণের কোনও একটী হইতে বা একাধিকের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ত্রিভুবনে এই তিন গুণ ব্যতীত অন্য গুণ নাই।

প্রকৃতির পরিচয় লাভ করতে হ'লে তার গুণের স্বরূপ জানা দরকার। এই তিনগুণ কমবেশী মাত্রার বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে বিরাজ করছে, জীবন্ত সবকিছুর মধ্যে যে আত্মবিকাশের প্রতিযোগিতা চলেছে তার মূল নিহিত রয়েছে এই ত্রিগুণের মধ্যেই।

সত্ত্বগুণ

সত্ত্বগুণের ধর্ম—প্রকাশ করা। 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং' সত্ত্বগুণ নির্মল, প্রকাশক, আরোগ্যকর। ইহা দেহীকে সুখের ও জ্ঞানের সন্ধান দেয়। যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব অপরের নিকট প্রকাশ পায় তখন জানা যায় যে, সে বস্তুর মধ্যে সত্ত্বা আছে। মানুষের ভিতরে তার একটা সত্ত্বা আছে। সেই সত্ত্বা প্রকাশ পায় তার বেঁচে থাকার, জীবন ধারণের আনন্দের ভিতর দিয়ে। সত্ত্বগুণপ্রধান মানুষ নির্মল শান্তি ও সহজ আনন্দ উপভোগ করে।

রজোগুণ

গীতাতে বলা হয়েছে 'রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা সঙ্গ সমুদ্ভবং' রাগ-রূপে ইহা রয়েছে তৃষ্ণা ও আসক্তির মূলে। রজোগুণ সকল কর্ম বাসনার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামক্রোধ লোভের জনক। রজোগুণ রাগাত্মক; অনুরাগ বিরাগের রঙে ইহা জীবের অন্তর রাঙিয়ে দেয়। লোভ ক্রোধ, যৌনকামনা জীবকে আকুল, চঞ্চল ক'রে তোলে; এক কথায় প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগ রজোগুণ থেকে উদ্ভূত।

তমোগুণ

তমোগুণ তমসাবৃত; অজ্ঞান, আলস্য, জড়তা, মূঢ়তা, অপ্রকাশের পরিচায়ক। তমস্তু অজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম। তমোগুণ দেহীকে মোহগ্রস্ত ক'রে রাখে; তার কামনা বাসনার চাঞ্চল্য ও নির্মল শান্তির প্রকাশ উভয়ই তমোগুণের প্রভাবে রুদ্ধ হ'য়ে থাকে।

প্রকৃতি ও সৃষ্টি

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে প্রকৃতির এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তবে সকলের মধ্যে সবগুণ সমপরিমাণে নাই। গুণের পরিমাণের তারতম্য হেতু পদার্থের স্বরূপ হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের। জড় পদার্থের ভিতর তমোগুণ প্রধান, তাই এতে চাঞ্চল্য নাই, প্রকাশ নাই, চেতনা নাই। কিন্তু অধুনা

যুগের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেয়েছেন যে, সকল পদার্থের, এমন কি প্রস্তর খণ্ডের ও অনুপরমাণু প্রতিনিয়ত স্পন্দনশীল। তাদের যেন প্রাণনৃত্য চলেছে অবিরাম গতিতে, যদিও তা স্থূল চক্ষুতে দেখা যায় না এবং স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায় না। কাজেই জড়পদার্থের ভিতরও রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ অতি ক্ষীণ মাত্রায় বিরাজিত রয়েছে।

উদ্ভিদ জগতেও তমোগুণ প্রবল। এদের রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ নির্জীব জড়পিণ্ডের চেয়ে অনেকটা বেশী। গাছ আলোর দিকে ডাল পালা বাড়ায়, মাটির নীচে শিকড় চালিয়ে দেয়, ক্ষতস্থান জুড়ে নিতে চেষ্টা করে। সৃষ্টির পর্যায়ে উদ্ভিদের স্থান জড়পদার্থের চেয়ে উপরের স্তরে।

পশুপক্ষীর জীবনে রজোগুণ প্রধান; সত্ত্বগুণ উদ্ভিদের চেয়ে বেশী। প্রবৃত্তিগুলি এদের জীবনকে অন্ধভাবে পরিচালিত করে। এরা যেন প্রবৃত্তির হাতের পুতুল।

মানুষ সত্ত্বগুণ-প্রধান জীব। তার বিচার বুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা আছে, নির্মল শান্তি ও আনন্দ লাভের অধিকার আছে। জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সে রজোগুণের প্রভাব দমন ক'রে রাখতে পারে কিন্তু রজসের তাড়নায় সে যখন ক্রোধাদি রিপুর বশবর্তী হয়ে অশান্ত চঞ্চল, উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে তখন তার সাত্ত্বিক শান্তি ও আনন্দ থাকে না; রজস তখন তার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। রিপুর উত্তেজনার উপশম হলে জ্ঞান ফিরে আসে; আবার সত্ত্বগুণের অধিকার বিস্তৃত হয়।

* * * *

জীবসৃষ্টির মূলরহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডারুইন প্রাণীর ক্রম-পরিণতির ধারাটি আবিষ্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অতিক্ষুদ্র প্রাণবিন্দু থেকে উদ্ভিদ ও বর্তমান পৃথিবীর সকল জীবের উৎপত্তি হয়েছে। জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে জয়ী হয়ে, দেহের আকৃতি ও গুণের পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে করতে এরা ক্রমশঃ উন্নতির স্তরে এগিয়ে এসেছে। বৈজ্ঞানিক ডারুইনের চোখে ধরা পড়েছে সৃষ্টি লীলার বাইরেকার রূপ; ভারতের দার্শনিক আরো গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে জীবের ক্রমবিকাশ ও জীবন সংগ্রামের অন্তরস্থ গূঢ় রহস্যটি আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন লীলাময়ী প্রকৃতির রাজ্যে তমসকে পরাভূত ক'রে রজস প্রাধান্য লাভ করছে; রজসকে

পরাভূত ক'রে সত্ত্বগুণ বিমল মহিমায় আত্মপ্রকাশ করছে। এই তিনগুণের দ্বন্দ্বে মানুষ জড়তা ও পশু শক্তির বাধা অপসারণ ক'রে পূর্ণ মানুষ্যত্বের দিকে, দেবত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—তিনগুণেরই সমাবেশ রয়েছে। প্রথমটি অপর দুটিকে যত বেশী জয় করতে, বর্জন করতে পারবে ততই সে ব্যক্তি উন্নততর জীবন লাভে সমর্থ হবে। মানুষকে তাই বলা চলে জীবন-শিল্পী। কি জাগতিক কর্মজীবনে, কি অধ্যাত্মজীবনে নিজের বিচারবুদ্ধি ও সাধনা দ্বারা সে নিজের জীবন গড়ে' তোলে। গীতা উপদেশ দিয়েছেন ঃ

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

আত্মাদ্বারাই আত্মার উদ্ধার সাধন করবে, আত্মার অধোগতি করবে না ; আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার শত্রু। আত্ম-সংযম দ্বারা রিপুকে জয় করেই আত্মার উন্নতি সাধন সম্ভবপর ; রিপুজয়ী ব্যক্তি নিজেই নিজের মিত্র আর যে আত্মজয়ী নয়, সে নিজেই নিজের অনিষ্টকারী শত্রু।

মেজাজ

প্রবৃত্তিগুলি মানুষের সকল প্রকার কর্মের গোপন উৎস। মর্মস্থলে অবস্থান ক'রে এরা মানুষের অন্তরে কামনা বাসনার যে প্রবাহ সৃষ্টি করে তা প্রকাশ পায় আচরণে ও মানসিক আবেগ উত্তেজনায়। প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা সক্রিয় থাকে না ; সভ্য মানুষের শৃঙ্খলাপূর্ণ নিরাপদ জীবনযাত্রায় প্রতিমুহূর্তের এদের প্রয়োজনও নাই। আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয় না, বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে যৌন প্রতিযোগিতায় জ্ঞানলাভ করার জন্য পুরুষকে আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে দৈহিক শক্তি ও কৌশলের পরীক্ষা দিতে হয় না। কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, মানুষের আদিম প্রবৃত্তির স্বরূপ বদ্‌লে গেছে। বিশেষ অবস্থায় এরা যখন জেগে ওঠে তখন প্রকাশ পায় এদের প্রকৃত রূপটিই। এই হঠাৎ-আবেগের-ঝলকানি-লাগা আচরণ ছাড়াও আমরা মানুষের আচরণে একটা স্থায়ী নিত্যকার রূপ দেখতে পাই। দৈনন্দিন জীবনে, নানা অবস্থায় এবং নানাজনের সঙ্গে আচরণে মানুষের মনের গঠনের পরিচয়টি পাওয়া যায়। এই মানসিক গঠনকে বলি মেজাজ বা স্বভাব। মেজাজ সব মানুষের একরকম নয়। কতক লোকের আছে খোশমেজাজ ; তারা আশাবাদী, জীবনের উজ্জ্বল দিকটা দেখে। আবার কতক আছে নৈরাশ্যবাদী, গম্ভীর, বেশীমাত্রায় চিন্তাশীল।

মানুষের মেজাজ বা স্বভাব নিয়ন্ত্রণ করে কোন্ শক্তি ? কেনই বা বিভিন্ন জনের মেজাজ হয় বিভিন্ন রকমের ? এর উত্তর দিতে হলে মানুষের জটিল দেহযন্ত্রের ভিতরে গোপনে নীরবে যে কাজ চলেছে তার উল্লেখ করতে হবে। দেহকারখানার ভিতরে ছোট বড় মাঝারি বহু যন্ত্র একযোগে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কাজ ক'রে চলেছে ; তাই দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্ভবপর হচ্ছে। পাকস্থলী, যকৃৎ, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতি থেকে রস নির্গত হয়ে খাদ্যের সঙ্গে মিশে তা পরিপাক করছে, খাদ্য থেকে রস, রস থেকে রক্ত উৎপাদন ক'রে দেহকে রেখেছে সজীব। এগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি গ্রন্থি আছে ; তা থেকে নিঃসৃত রস রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের বৃদ্ধি ও মনের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। কণ্ঠনালির পাশে স্থাপিত ছোট্ট থাইরয়েড গ্রন্থিটি মানুষের মনের গঠনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস রক্তের সঙ্গে মিশে' যে রাসায়নিক ক্রিয়া সাধন করে, তাই মানুষের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

থাইরয়েড গ্রন্থি যদি সবল না হয়, স্বাভাবিক ভাবে কাজ না করে, যদি এর রসনিঃসরণ কম হয় তবে সে ব্যক্তি হয় জড়দেহ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ; দেহের ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কোনটিই তার থাকে না। এরূপ শিশুর দেহের এবং মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না ; বাল্যকাল থেকেই যদি থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষীণতেজা হয় তবে বয়সে প্রবীণ হ'য়ে গেলেও দেহের গঠনে সে হয় বামন, মানসিক শক্তির স্ফুরণ না হওয়ায় সে হয় নিরেট নির্বোধ।

পক্ষান্তরে, এ গ্রন্থি থেকে নির্গত রসের মাত্রা যদি অত্যধিক হয় তবে দেহ মন উভয়ই হয় ক্ষিপ্র এবং চঞ্চল। এরূপ লোক সামান্য ব্যাপারেই উত্তেজিত অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠে : মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেগ ক্রমেই তাদের দেহ কৃশ এবং মন অসহিষ্ণু ক'রে তোলে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মানবসমাজে এই দুই চরম অবস্থার লোকই খুব কম—স্থূলবুদ্ধি, জড়পিণ্ডবৎ অপুষ্টদেহা লোক যেমন বিরল, অত্যন্ত স্পর্শকাতর, সদা-উত্তেজিত লোকও তেমনি বেশী মেলে না। এ দুই ধরণের মানুষই অস্বাভাবিক ; সমাজের বেশীর ভাগ লোক এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে। থাইরয়েড গ্রন্থি যেন মানুষের মেজাজের তুলাদণ্ড ধরে' রেখেছে—রস স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে কম দিয়ে মানুষকে করছে অল্পবুদ্ধি এবং কম অনুভূতিপ্রবণ আর বেশী মাত্রায় দিয়ে তার দেহমনের বিকাশ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আচরণের ভিতর দিয়ে তার মেজাজের যে পরিচয় মেলে তা বিচার ক'রে মানুষকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী জাঙ এদের নাম দিয়েছেন এক্স্ট্রোভার্ট এবং ইনট্রোভার্ট অর্থাৎ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। এদের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য কি তা জানলে আমরা নিজেদের মন এবং মনোভাব বিশ্লেষণ ক'রে মিলিয়ে দেখতে পারি আমরা কে কোন ভাগে পড়ি ; অপরের আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য ক'রে তাদের স্বরূপও অনেকটা বুঝতে পারি।

বহির্মুখী-স্বভাবের লোকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা মনোভাব মনে চেপে রাখতে পারে না। অন্তরে যে আলোড়ন ওঠে, সুখ দুঃখ হর্ষবেদনার যে অনুভূতি তাদের চিত্তে জাগে, সঙ্গে সঙ্গে তার

বহির্মুখী

বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তাদের চোখেমুখে, তাদের আচরণে। তারা ভাবাবেগ মনের গোপন পুরীতে লুকিয়ে রেখে বাইরের আচরণে তা ঢেকে রাখতে পারে না। মনে ক্রোধ সঞ্চিত হ'লে তাদের

চোখমুখের ভাবভঙ্গী দেখে তা বোঝা যাবে ; মনে ব্যথা পেলে তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে তাদের বেদনাতুর কণ্ঠস্বরে এবং ব্যথাপ্রকাশক ম্রিয়মাণ আচরণে ; মনের আনন্দ এরা প্রকাশ করে উল্লাসের অতিশয্যের ভিতর দিয়ে। মুখমণ্ডল যেন এদের অন্তরের দর্পণ। তা দেখে এদের মানসিক অবস্থা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কেউ এদের আত্মসম্মানে আঘাত করলে বা অন্য কোন প্রকারে ক্রোধ জাগিয়ে দিলে উত্তেজনাপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে এরা তার প্রতিবাদ করে।

বহির্মুখী স্বভাবের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা যা ভাবে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। লজ্জা সংকোচ এদের কাছে বড় প্রতিবন্ধক নয়। শ্লীল অশ্লীল নির্বিচারে এরা সব রকম আলোচনায় রস পরিবেশন ক'রে তা মুখরোচক ক'রে তুলতে পারে ; যৌনজীবন সম্বন্ধেও তারা এমন খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে যা অনেকের কাছেই মনে হবে অশোভন। অন্যের সঙ্গে মেলা মেশা ক'রে ভাব জমিয়ে নিতে এদের খুব বেশী দেরী লাগে না। সমপ্রকৃতির লোকদের সঙ্গে এরা সহজেই অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠে ; অন্যান্য গুণ থাকলে এরা হয় বন্ধুমহলে প্রিয় মজলিসী লোক।

তৃতীয়তঃ, বহির্মুখী স্বভাবের লোক ভাবাবেগে চালিত হ'য়ে গভীরভাবে চিন্তা না করেই কোন কাজ ক'রে বসে। কর্মের প্রেরণা তার বেশী ; মনে কামনাবাসনা উদয় হ'লে বা অন্যের সঙ্গে আচরণে কোন ভাব প্রবল হ'য়ে উঠলে তার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি হতে পারে, সে কাজটি ন্যায় কি অন্যায় এত সব বিবেচনা ক'রে দেখার ধৈর্য তার থাকে না। আত্মবিশ্লেষণ ক'রে নিজের মনোবাসনা তন্ন তন্ন ক'রে দেখা, বা কি তার কাম্য সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা তার স্বভাব নয়। অনেক সময় সে ঝোঁকের মাথায় কাজ ক'রে ফেলে ; পরে অনুশোচনা আসে ; ভাবে, অতখানি বাড়াবাড়ি না করলেই হ'ত !

অন্তর্মুখী

অন্তর্মুখীর স্বভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। কখনই সে ধাঁ ক'রে কোন কাজ ক'রে বসে না। মনের ভাব, কামনা বাসনার আবেগ সে লুকিয়ে রাখে সংগোপনে নিজের মনের মণিকোঠায়। যতখানি চিন্তা করে ততখানি প্রকাশ করে না, যতখানি পরিকল্পনা করে ততখানি কাজ করে না। আত্মবিশ্লেষণ ক'রে নিজের মনকে তন্ন তন্ন ক'রে বুঝতে চেষ্টা করে ; বাইরের উত্তেজনায় সহসা সাড়া

দেয় না। মনের দুঃখ নীলকণ্ঠের মত নিজের মনে রুদ্ধ ক'রে রাখে, হর্ষ প্রকাশেও আতিশয্য দেখায় না। পাথরের ওপর জলের ফোঁটা পড়লে সেই মুহূর্তে তা বিন্দু বিন্দু হয়ে ওপরের দিকে ছিটকে ওঠে; বহির্মুখীর স্বভাব এমনি; বাইরের উত্তেজনায় সে সাড়া দেয় কালবিলম্ব না ক'রে। বালিমাটিতে জলের ফোঁটা ছিট্‌কে ওঠে না, ভিতরে চলে যায় নিঃশব্দে। অন্তর্মুখীর প্রকৃতি হল এই ধরণের। কাজেই দেখা যায় বহির্মুখী ব্যক্তি সঙ্গপ্রিয়, প্রকাশধর্মী মন তার অপরের সাহচর্যে উৎফুল্ল হয় কিন্তু অন্তর্মুখীর প্রধান সঙ্গী তার নিজের মন। নিজের মন নিয়ে তার খেলা, কল্পনা বিলাসে সে এক স্বপ্ন-জগৎ সৃষ্টি ক'রে নেয় কিন্তু কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিবার কর্মোত্তম তার থাকে না। অতিরিক্ত মাত্রায় অন্তর্মুখীরা হয় অত্যন্ত হুসিয়ার, কেবল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিন্তু কোন কাজে অগ্রসর হতে চায় না; তারা হয় নৈরাশ্যবাদী; কোন কিছু থেকে যে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে তা তারা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না; এদের নিজেদের কামনাবাসনা, দোষত্রুটি সম্বন্ধে আত্মসচেতন, অপরকেও এরা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, এ বিষয়ে এরা কিছুটা অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র মানুষের স্বভাব ও আচরণের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। শাস্ত্রবিদ ভূয়োদর্শনের ভিতর দিয়ে মানুষের স্বভাব, আচরণ ও মানব জীবনের যে পরিচয় লাভ করেছেন তা থেকে মানুষকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন। জ্যোতিষীর মতে গ্রহ নক্ষত্র মানুষের জীবনে বিশেষ ধরণের প্রভাব বিস্তার করে; এই সকল গ্রহের কারকতায় বা প্রভাবে বৈশিষ্ট্য আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে বুধ এবং শুক্র-গ্রহ প্রধান ব্যক্তির স্বভাবের যে বিবরণ দেখা যায় তার সঙ্গে বহির্মুখী ব্যক্তির আচরণ ও প্রকৃতির প্রায় হুবহু মিল আছে; আর শনিগ্রহপ্রধান ব্যক্তির স্বভাব অন্তর্মুখীর মত। কারো জীবনে বুধ ও শুক্রগ্রহ প্রবল থাকলে সে হয় চঞ্চল ও ক্ষিপ্রস্বভাবের; জীবনের উজ্জ্বল দিকটা তার নজরে পড়ে; ভাবাবেগ প্রবল হয়, সে হয় বাক্‌কুশল ও লিপিকুশল। সুখ দুঃখ, হর্ষবিষাদে সে সহজে বিচলিত হয়; কাজ করার প্রবণতা তার বেশী।

শনিপ্রধান ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী; জীবনের এবং সকল বিষয়েরই অন্ধকার দিকটির প্রতি প্রথমে তার নজর পড়ে। বুধপ্রধান এবং শনিপ্রধান ব্যক্তির জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কেমন তা একটিমাত্র উদাহরণ

দিয়ে বোঝান যায়। ধরুন, যথাসময়ে সুবৃষ্টি হয়েছে, মাঠে ফসলের অবস্থা বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে ; বুধপ্রধান ব্যক্তি বলবেন—এবার ফসল হবে চমৎকার, লোকের ধানচালের অভাব ঘুচবে, সুদিন আসছে। শনিপ্রধান ব্যক্তি বলবেন—এখনো কিছুই বলা যায় না, 'আশ্বিনে ঝড়' আছে, পঙ্গপালের উৎপাত আছে, আরো কত কি ঘটতে পারে! ক্ষেতের ধান ঘরে না এলে আগেই উল্লসিত হবার কিছু নাই।

* * *

মানুষের এই বিচিত্র সংসার নাট্যশালায় কত রকমের লোক তাদের নিজের নিজের মনোজগত নিয়ে কামনাবাসনার আবেগ নিয়ে, স্বভাবের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেন অভিনয় ক'রে চলেছে। কেউ ধীর, কেউ চঞ্চল, কেউ অলস, কেউ সদাকর্মমুখর ; কেউ বেঁচে থাকার আনন্দে উৎফুল্ল, কারো কাছে বা জীবন সদাদুঃখময়, দুর্বহ। তবে দেখা যায়, প্রকৃতির রাজ্যে চরম বা অতি বাড়াবাড়ির স্থান বিশেষ নাই, সব বিষয়েই প্রকৃতি যেন মাঝামাঝি অবস্থা, মধ্যপন্থা পছন্দ করেন। তাই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় ক্ষেত্রেই অতি অসাধারণের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। মানুষের মেজাজের বেলাতেও দেখতে পাই এই সাধারণ নিয়ম। চরম বহির্মুখী এবং চরম অন্তর্মুখীর সংখ্যা খুবই কম। বেশীর ভাগ লোকই এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্তী পর্য্যায় অবস্থিত। প্রত্যেকেই কিছুটা বহির্মুখী, কিছুটা অন্তর্মুখী ; উভয় ভাবেরই সমাবেশ রয়েছে প্রত্যেকের জীবনে, তবে যেটি প্রধান সেটিই তার আচরণে প্রভাব বিস্তার করে, এবং মানুষের মেজাজ বা মনের গঠন বা স্বভাবের ঝোঁকও সেই অনুসারে গড়ে ওঠে।

বহির্মুখী বনাম অন্তর্মুখী

আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি আমরা ইচ্ছা করলেই ঝেড়ে ফেলে বাতিল করে দিতে পারি না বা এদের ক্রিয়াকলাপও বন্ধ ক'রে রাখতে পারি না। তেমনি আমাদের মেজাজ বা স্বভাবকে আমরা ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারি না ; কতকগুলি দৈহিক ও মানসিক কারণের ওপর এর বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। তবে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী স্বভাবের স্বরূপ কি তা জানলে আমরা এই জ্ঞান নিজেদের আচরণের দিগ্-দর্শনরূপে কাজে লাগাতে পারি। নিজ নিজ মনের ভিতরের দিকে তাকিয়ে আমরা তার ভাবকামনা বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারি, মনের স্বরূপ কতকটা

বুঝতে পারি এবং মেজাজের প্রবণতা কোন্ দিকে তাও নিরূপণ করতে পারি। এইভাবে নিজনিজ স্বভাবের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা অপরের সঙ্গে ব্যবহারে ব্যক্তিগত আচরণ সংযত করার চেষ্টা করতে পারি; প্রয়োজন হ'লে আমাদের কর্মোদ্যম বাড়াবার চেষ্টা করতে পারি। এ ছাড়া সমাজ জীবনে ও কর্মজীবনে আমাদের যে-সব লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, কিছুদিন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাদের আচরণ লক্ষ্য করলে তাদের মেজাজের স্বরূপ মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। সহকর্মীদের সঙ্গে এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আচরণের ভিতর দিয়ে কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার ব্যাপারে মনোবিজ্ঞানের এই জ্ঞানটুকুর যথেষ্ট মূল্য আছে। এক সঙ্গে যারা কাজকর্ম করে তাদের পক্ষে পরস্পরের মেজাজের স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত থাকার অনেক সুবিধা আছে; এর ফলে ছোটখাটো তিক্ততা, বিরক্তি ও গাত্রদাহকর উত্তেজনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একথা হয়তো অনেকেই স্বীকার করবেন যে, পরস্পরের মানসিক গঠন ও মেজাজের স্বরূপ জানা থাকলে অনেক সময় অপ্রীতিকর অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। কেননা ছোটখাটো ঘটনা, ছোট ছোট হুলফুটানো কথা, উত্তপ্ত দমকা হাওয়ার মত গরম মেজাজের হঠাৎ অশোভন প্রকাশ মনের স্তরে জমতে থাকলে এরূপ আচরণকারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব দানা বেঁধে ওঠে। তাই হয়তো এক সময়ে গুরুতর আকারে দেখা দিতে পারে যখন ধৈর্যের বাঁধন ভেঙে পড়ে, অনেক দিনের সঞ্চিত ক্রোধ অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে, প্রীতির সম্পর্কের স্থানে গ'ড়ে ওঠে তিক্ত মনোমালিন্য। স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান ও আত্মসংযম দ্বারা এইরূপ অবাঞ্ছনীয় পরিণতি রোধ করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, স্বভাবের পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর নয়। মহাসমুদ্রে অবস্থিত নিমজ্জমান শৈল, ঘূর্ণিস্রোত, ঝড়তুফান নাবিকেরা ইচ্ছামত দূর করতে পারে না কিন্তু এদের অবস্থান ও স্বরূপ জানা থাকলে হুসিয়ার নাবিক বিপদ এড়িয়ে চলতে পারে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অপরের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখীর স্বভাবের মূলগত পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা উচিত। যেমন, বহির্মুখী স্বভাবতই উদ্যমশীল, চিন্তা করার চেয়ে কাজ করার দিকে তার ঝোঁক বেশী। এরূপ

লোককে কাজে উদ্যোগী হ'তে উৎসাহ দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, তাকে বরং কাজে ব্রতী হবার আগে ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে নিয়ে অগ্রসর হতে বলা প্রয়োজন।

অপর দিকে, অন্তর্মুখীকে ভাল ক'রে চিন্তা ক'রে দেখতে বলার আবশ্যকতা নাই কেননা সে স্বভাবতই কেবল চিন্তাই করবে, কাজে অগ্রসর হতে চাইবে না সহজে। তার বন্ধুর কর্তব্য হওয়া উচিত তাকে অত্যধিক চিন্তা ও পরিকল্পনার গণ্ডি থেকে বের ক'রে কাজে প্রবৃত্ত করানো।

বহির্মুখী ও অন্তর্মুখীর ভাবাবেগ প্রকাশে কিরূপে পার্থক্য দেখা যায় তার উল্লেখ প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল বলেছেন, বহির্মুখী তার প্রিয়বান্ধবীর সৌন্দর্য বর্ণনা ক'রে উচ্ছ্বসিত ভাষায় কবিতা লিখবে আর তা আবৃত্তি করে বেড়াবে কিন্তু অন্তর্মুখী যাকে ভালোবাসে তার নাম মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করবে না, লুকিয়ে রাখবে, পাছে কেউ টের পায়!

বহির্মুখী চরিত্রের প্রধান ত্রুটি হল তার ক্ষিপ্রতা; সুচিন্তিত পরিকল্পনা শিখে তার কাম্য উদ্দেশ্যের সকল দিক এবং সম্ভাব্য পরিণতি ভাল করে চিন্তা করে দেখে কাজে অগ্রসর হবার ধৈর্য তার থাকে না। ভেবে দেখার কথা বললে সে বলবে—"অত ভাবলে কাজ হয় না; কাজ ক'রে ফেলি তো, তারপর যা হয় হবে!" নিজের দোষে কোন গুরুতর সমস্যা বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'লে সে ভেঙে পড়ে; স্থিরমস্তিষ্কে ধৈর্যধারণ ক'রে তা কাটিয়ে ওঠা প্রায়ই তার সামর্থ্যে কুলায় না। অত্যধিক উত্তেজনার চাপে অনেক সময় এরূপ ধরণের লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকস্মিক বিকলতা দেখা দিতে পারে; পক্ষাঘাতে কোন অঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি বা স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়াও বিচিত্র নয়।

অন্তর্মুখীর স্বভাবের প্রধান দোষ তার প্রকাশকুণ্ঠা; আচরণে এবং অপর দশজনের সঙ্গে ব্যবহারে ও ভাবের আদানপ্রদানে যে কামনাবাসনার আবেগ অনেকটা হাল্কা হয়ে যেতে পারত, তা তার নিজের মনের আকাশেই ঘুরপাক খায়; তা দিয়ে সে দিবাস্বপ্ন গড়ে। বজ্রবিদ্যুৎবাহী মেঘ থেকে বারিবর্ষণ না হ'লে তা যেমন বর্ষণের সম্ভাবনা বহন ক'রে কালো ছায়ায় আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, রুদ্ধ-আবেগ অন্তর্মুখীর মেজাজেও অনেক সময় এরূপ থমথমে ভাব দেখা যায়।

মনের গহনে

প্রাণীর জীবনধারা লক্ষ্য ক'রে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, অন্তর্নিহিত কোন দুর্জ্ঞেয় শক্তি সকলকে আত্মবিকাশের পথে চালিয়ে নিয়ে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ঋষিগণ এ শক্তির নাম দিয়েছেন প্রকৃতি; পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় একে বলা হয় প্রবৃত্তি। বিভিন্ন প্রবৃত্তির স্বরূপ বিভিন্ন। এরা জীবকে এই সংগ্রামসংকুল জগতে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকতে এবং বংশবিস্তার ক'রে তার ভিতর দিয়ে স্থায়ী জীবন লাভ করতে প্রেরণা ও কর্মশক্তি যোগায়। পশুপক্ষীর জীবনে প্রবৃত্তিগুলির শক্তি খুবই প্রবল; অন্ধ আবেগের মত এগুলি তাদের জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

সভ্য মানুষের জীবনেও প্রবৃত্তিই সকলপ্রকার কর্মপ্রচেষ্টার মূল উৎস। তবে সাধারণ পশুর জীবনে এগুলির প্রকাশ যেমন স্থূল এবং একই নির্দিষ্ট পথে চালিত মানুষের জীবনে তেমন নয়। বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে মানুষ এদের প্রকাশে নানা বৈচিত্র্য দেখায়; তাছাড়া মানুষের সুশৃঙ্খল নিরাপদ সমাজব্যবস্থায় সবগুলি প্রবৃত্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ প্রয়োজনও হয় না। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের জীবনে কোন একটিমাত্র প্রবৃত্তির বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না, প্রায়ই একাধিক প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটে আচরণে ও মনোভাব প্রকাশে। কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে অবলম্বন ক'রে যখন কোন নির্দিষ্ট ভাবাবেগ মনে স্থায়ী হ'য়ে যায় তখন তাকে বলি রস। বাৎসল্য বা অপত্যস্নেহ যখন কোন নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন ক'রে দানা বেঁধে ওঠে, তখন তা মনে স্থায়ী হ'য়ে বসে। এই প্রীতিরস বা ভালোবাসা মনকে করে স্নিগ্ধ কোমল। যাকে কেন্দ্র ক'রে মনে প্রীতিরস বিস্তারলাভ করে, তা কাছে থাকলে তো মানুষের আনন্দ হয়ই, নয়নসম্মুখে না থাকলেও তার প্রতি অন্তরের কোমলতা শুকিয়ে যায় না। এই প্রীতিরসে অন্য কয়েকটি প্রবৃত্তি ও তার ভাবাবেগ মিশ্রিত রয়েছে।

ভালোবাসা মানুষের উন্নততর মনের পরিচায়ক। ইতরপ্রাণিজগতে সন্তানের প্রতি অল্পকালস্থায়ী অন্ধ আকর্ষণ ছাড়া অন্যপ্রকার ভালোবাসার পরিচয় মেলে না। মানুষের ভালোবাসা মহনীয় এই জন্য যে, নিজের

একান্ত আপন জন ছাড়াও আরো অনেককে সে প্রীতিরসে অভিষিক্ত ক'রে নিতে পারে। বস্তুতঃ মনের উদারতা ও বহুকে আপন ক'রে নেবার ক্ষমতা দ্বারাই মানুষের মহত্ত্ব পরিমাপ করা যায়। শাস্ত্রে আছে—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

এ আমার নিজের, ও পর—এইরূপ মনোভাব ক্ষুদ্রচেতার পরিচায়ক। উদারচরিত ব্যক্তিদের নিকট সমস্ত বসুধাই কুটুম্বস্বরূপ। তাঁরা হৃদয়ের প্রসার দ্বারা বহুকে আপন ক'রে নিয়ে বহুর মধ্যে নিজেদের ব্যপ্ত ক'রে দিয়ে থাকেন। জগতে যাঁরা মহাপুরুষ আখ্যা পেয়েছেন তাঁরা সবাই মানবপ্রেমিক, তাঁদের প্রীতি ও ভালোবাসা নিজ পরিবার পরিজনের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহৎ মানবসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রীতিরসের উৎস

মনের উদারতার সঙ্গে প্রীতিরস মেশানো আছে। মানুষ প্রীতিরস কেবল যে অপর মানুষের ওপরই সিঞ্চন করতে পারে তা নয়, ইতর প্রাণী, গাছপালা এমন কি প্রাণীহীন যে কোন বস্তুবিশেষের প্রতিও মানুষের স্নেহ বর্ষিত হতে পারে। আমাদের নিজেদের প্রিয় পালিত পশুপক্ষী, প্রিয়বস্তু—এসবের প্রতি কেমন একটি সূক্ষ্ম মমত্ববোধ ও প্রীতির ধারা সর্বদা মনের মধ্যে প্রবাহিত থাকে, তা নিজের মনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। প্রীতিরস অব্যাহতভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করলে মানুষ আনন্দ লাভ করে কিন্তু এর কোন ব্যতিক্রম ঘটলে মনে নানা ভাবের আলোড়ন সংমিশ্রণ ঘটে। প্রিয়জনের বা প্রিয়বস্তুর মঙ্গল হ'লে মনে সন্তোষ আসে ; তাকে কাছে পেলে, দেখলে আনন্দ হয়, তার কোন প্রকার বিপদ দেখা দিলে মনে আসে উদ্বেগ, কেউ তার অপকার করার চেষ্টা করলে তার ওপর ক্রোধ জেগে ওঠে, কেউ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলে বা তার মঙ্গলবিধান করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন পূর্ণ হয়।

বিদ্বেষবিষ প্রীতির ঠিক বিপরীত ভাব জাগিয়ে তোলে। যে-কোন কারণেই হোক্ যার প্রতি মন বিরূপ, শুধু বিরূপই নয় যাকে শাস্তি দেওয়ার কামনা মনে প্রবল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্ তা সম্ভবপর হচ্ছে না এরূপ অবস্থায় বিদ্বেষ বিষ মনকে তার প্রতি তিক্ত ক'রে রাখে। সে কাছে এলে তাকে দেখলে ক্রোধ জেগে ওঠে, তার ক্ষতি হলে মনে হয় আনন্দ, সে

অপরের কাছে ভালোবাসা পেলে, তার শ্রীবৃদ্ধি হলে হয় ক্রোধ ও ঈর্ষা। প্রীতিরস মনকে করে উদার, নির্মল, কোমল, আনন্দময়; বিদ্বেষ যেন অন্তরের ওপর বিষক্রিয়া সঞ্চার করে; মন হয় সংকীর্ণ, অনুদার, নির্মম।

* * *

প্রীতি এবং বিদ্বেষ বিপরীতধর্মী মনোভাব। এর যে কোন একটি কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের প্রতি পৃথক পৃথকভাবে জেগে উঠলে মনে বিশেষ কোন ভাবের জটিলতা দেখা দেয় না। কিন্তু এদুটি অথবা অনুরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন একাধিক রস বা ভাবাবেগ একই সঙ্গে একই ব্যক্তির প্রতি জাগ্রত হলে মনে যে জটিল ভাবের আলোড়ন ঘটে তা আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করি। তে-শিরা কাঁচ দিয়ে যেমন সূর্যকিরণের বর্ণালি বিশ্লেষণ ক'রে বিভিন্ন রঙের সমাবেশ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তেমনি মনের জটিল ভাবাবেগ বিশ্লেষণ ক'রে তার মূল উপাদানগুলির স্বরূপ জানতে পারা যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

ভৎর্সনা

এর মধ্যে প্রীতি ও ক্রোধ এ দুটি বিপরীতধর্মী ভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। প্রীতিভাজন ব্যক্তি যদি এমন কোন কাজ করে যা অন্যে করলে কেবল ক্রোধের উদ্রেক হত, তখন প্রীতিরস ক্রোধের মিশ্রণে মৃদু তিরস্কার বা ভৎর্সনারূপে বর্ষিত হয়। প্রিয়জনকে আমরা বলি "তুমি একাজ করলে! তুমি এমন করবে আশংকা করিনি!" প্রিয়জনের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ বাধা পায় বলে ভৎর্সনাকারী নিজের মনেও কিছুটা দুঃখ অনুভব করে। প্রীতিভজন ব্যক্তি যদি পাল্টা ভৎর্সনা দিয়ে জবাব দেয় তবে প্রীতিপরায়ণ লোকটির মানসিক কষ্ট বেড়ে যায় বহুগুণে, কারণ এতে তার মনের প্রীতিরসই শুধু ব্যাহত হয় না, আত্মমর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয় এবং ক্ষুন্ন হয় এমন লোকের দ্বারা যাকে শাস্তি দেওয়ার মানে নিজেই সে শাস্তি ভোগ করা!

উদ্বেগ

এর মধ্যে মেশানো আছে প্রীতি ও আশংকা। প্রিয়জন বা প্রিয় বস্তু যখন কোন কিছু দ্বারা বিপন্ন হয় তখন সেই অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ

দীপ্ত হয়ে ওঠে ; তখন কামনা হয় প্রিয়জনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, অনিষ্টকারীকে শাস্তি দেওয়ার ; বন্য জীবজন্তু কর্তৃক সন্তান আক্রান্ত হলে এমনি মানসিক অবস্থা হয় তার পিতার মনে। কিন্তু অনিষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে যে-শক্তি তাকে শাস্তি দিয়ে প্রতিহত করা যখন সাধ্যের অতীত, তখন মানুষ মনে মনে অসহায় বোধ ক'রে প্রিয়জনের অমঙ্গলের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে, যেমন হয় প্রিয়জন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হলে। অনেক সময় অনিষ্টকারী কোন শক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান না থাকলেও কাল্পনিক বিপদের আশংকা ক'রে স্নেহাতুর মানুষ প্রিয়জন সম্বন্ধে অযথা উদ্বেগ অনুভব করে।

ঈর্ষা

এর মধ্যে মেশানো রয়েছে প্রীতিরস, তা ব্যাহত হওয়ার দরুণ মনোব্যথা এবং ক্রোধ। ভালোবাসার ভাগ নিয়ে মানসিক কাড়াকাড়ি থেকে ঈর্ষার উৎপত্তি ; এতে তিনব্যক্তি জড়িত। প্রীতির স্বভাব এই যে, তা যার ওপর বর্ষিত হয় তাকে নিবিড় ক'রে পাবার কামনা জাগে মনে ; যাকে ভালোবাসা যায় সে যদি অনুরূপ ভালোবাসার, অধিকতর অনুরক্তির প্রতিদান দেয় তবে মন হয় পুলকিত ; দেওয়া এবং পাওয়ার ভিতর দিয়ে প্রেম ভালোবাসা সার্থকতা লাভ করে। এক পক্ষ যদি অপর পক্ষের কাছ থেকে আশানুরূপ প্রতিদান না পায় তবে তার অন্তরের উদ্বেলিত প্রীতির উচ্ছ্বাস সার্থকতা লাভ করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ হয়, তারা কাছে মনে হয় তার আত্মমর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হল। তখন তার মনে যে ব্যাহত ভালোবাসা, আহত আত্মমর্যাদা এবং চাপা ক্রোধের জটিল সংমিশ্রণ ঘটে তাকে বলি **অভিমান**। যখন কোন তৃতীয় ব্যক্তি ভালোবাসার পূর্ণতালাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তার প্রতি ক্রোধের সঞ্চার হয়, সে যদি নিজে ঐ ভালোবাসায় ভাগ বসায় বা ভাগ বসাতে চেষ্টা করে তবে তার প্রতি জাগে ঈর্ষা। মানুষের মানসক্ষেত্রে প্রীতিলাভের যে নীরব প্রতিযোগিতা চলে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে তার প্রকাশে পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু ঈর্ষার মূল উপাদান সকল বয়সেই ঐ একই প্রকার।

শৈশবে এবং বাল্যকালে ছোট ভাইবোন যখন মায়ের স্নেহের অংশে ভাগ বসায় তখন এই তৃতীয় পক্ষের প্রতি বালকের মন বিশেষ প্রসন্ন

হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, বড় ভাইবোন তাদের চেয়ে অল্প কয়েক বছরের ছোট ভাইবোনের প্রতি যে ঈর্ষার ভাব বাল্যকালে পোষণ করেছিল তা সম্পূর্ণ দূর করতে পারে না।

কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর মধ্যেই ঈর্ষার তীব্রতা দেখা দেয়। অনুরাগ যেখানে বেশী গভীর, কামনা যেখানে অত্যন্ত তীব্র সেখানে ঈর্ষাও অত্যন্ত উগ্র। ক্রোধমিশ্রিত উত্তেজনায় অনেক সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়; প্রীতি ও অনুরাগের পূর্ণতা সাধনে যে লোক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, তাকে ধ্বংস ক'রে প্রয়োজন হলে নিজেও আত্মহত্যা করতে প্রীতি-উন্মাদ ব্যক্তি কুণ্ঠিত হয় না।

নিঃস্বার্থ, প্রতিদানের কামনা বিহীন গভীর ভালোবাসা একান্ত বিরল; এমন লোক খুবই কম যে তার প্রিয়জন তার চেয়ে অন্যের প্রতি বেশী অনুরক্তি দেখালে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হ'য়ে বরং আনন্দিত হয়। একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহাশীলা উদারহৃদয়া জননীর পক্ষেই তা সম্ভব। কিন্তু এরূপ জননীর সংখ্যাও বেশী নাই। অনেক সময় দেখা যায় অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা জননী হন ঈর্ষাপরায়ণা শাশুড়ী। পুত্রবধূ যে তাঁর ছেলের প্রীতিতে অংশীদার হবে তা তিনি সহ্য করতে পারেন না। পুত্র যদি পত্নীর প্রতি কিছুটা পক্ষপাতিত্ব দেখায় তবে মায়ের মনে জেগে ওঠে অভিমান, পুত্রবধূর প্রতি তিনি হন ঈর্ষান্বিতা। শাশুড়ী-পুত্রবধূর মনোমালিন্যের প্রকৃত কারণ খুঁজতে গেলে অনেক পরিবারেই এই গোপন ঈর্ষার সন্ধান পাওয়া যাবে।

প্রতিহিংসা

এর মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে আহত আত্মমর্যাদাবোধ ও তীব্র ক্রোধ। আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের উন্নত তাজা মনের পরিচায়ক; অন্যের কাছে প্রশংসা, প্রীতি ও সুনাম পাওয়ার বাসনা সকল মানুষেরই আছে। কেউ কারো আত্মসম্মানে আঘাত করলে, অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত করলে, অপর দশজনের চক্ষে হেয় করলে আহত আত্মাভিমান অন্যায়কারীকে শাস্তি দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চায়। তীব্র প্রতিহিংসা সাধনে শান্ত প্রকৃতির মানুষও তখন নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠতে পারে। মানবসমাজে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা সাধনের নজিরের অভাব নাই। আত্মসম্মানে আঘাতের তীব্রতার কমবেশী অনুসারে প্রতিহিংসার তীব্রতা ও কমবেশী হ'য়ে থাকে। কিন্তু সমগ্রভাবে

কোন জাতি যখন প্রতিহিংসা সাধনের উন্মাদনায় মেতে ওঠে তখন ইতিহাসে সংকট ঘনিয়ে আসে, দেশে যুদ্ধের সাড়া পড়ে' যায়।

আত্মমর্যাদা মানুষের কাছে প্রিয় এবং আনন্দদায়ক। ইহা যতবেশী ব্যাপক হয় তার আনন্দানুভূতি ও হয় তত নিবিড়। এই মর্যাদাবোধ একক মানুষের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে ; তাই মানুষ তার পরিবারের এবং বংশের সম্মান নিজের সম্মান ব'লে মনে করে, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার সমাজের, জাতির এবং দেশের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত, অগৌরবে নিজেকে লাঞ্ছিত মনে করে। একদেশ অন্য কোন দেশ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত লাঞ্ছিত হ'লে সে-দেশের জনগণ দেশের অপমানকে নিজের অপমান ব'লে মনে করে এবং এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মাণী হিটলারের নেতৃত্বে যুদ্ধের নেশায় মেতে উঠে জাতিগতভাবে প্রতিহিংসা সাধনের উদাহরণ দেখিয়েছে। বহুসংখ্যক লোক যখন লাঞ্ছিত বা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার বাসনায় একত্র সম্মিলিত হয় তখন তাদের স্বাভাবিক দল প্রবৃত্তি উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে এবং প্রতিহিংসা রুদ্র রূপ ধারণ করে। এরূপ কাজ তখন দেশবাসীর কাছে স্বদেশপ্রেম ব'লে গণ্য হয়।

রোষ

এর মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুণ ক্ষোভ ও ক্রোধ। ক্রোধ হঠাৎ কোন উত্তেজনা পেয়ে দীপ্ত হয়ে ওঠে ; রোষবশে কোন গর্হিত কাজ ক'রে ফেললে লোক পরে অনুতপ্ত হয়। প্রতিহিংসার মধ্যেও আত্মমর্যাদা ও ক্রোধের মিশ্রণ ঘটেছে কিন্তু তা রোষের মত অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় না। রোষ যখন স্থায়ী হয় এবং সুপরিকল্পিত উপায়ের ভিতর দিয়ে প্রযুক্ত হ'য়ে মানুষের ক্ষুণ্ণ মর্যাদাবোধ তৃপ্ত করে তখন তার নাম দেওয়া হয় প্রতিহিংসা।

লজ্জা

লজ্জা ও সরম এ দুটি কথাই সাধারণতঃ আমরা একই অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকি ; এ দুটির মূল উপাদানে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তা বিচার ক'রে দেখি না। লজ্জা ও সরম দুটিতেই সংমিশ্রণ ঘটেছে আত্মপ্রাধান্য বা আত্মজাহির

করার প্রবৃত্তি ও আত্মদীনতা প্রবৃত্তির। দুটি পরস্পর বিরোধী ভাব একই সঙ্গে মনে জাগরিত থেকে মানুষের আচরণে আনে সংকোচ ও জড়তা। লজ্জার বহিঃপ্রকাশে বৈশিষ্ট্য আছে মাথা নীচু ক'রে, নিজের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে লজ্জিত ব্যক্তি অপরের দৃষ্টি এড়াতে চায়; ভিতরের চাপা উত্তেজনায় মুখে রক্ত সঞ্চারিত হয়, মুখমণ্ডল হয় আরক্তিম, গতি হয় ধীর এবং আড়ষ্ট। সরমের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা 'সুখের মত ব্যথা' মেশানো থাকে; উদাহরণ দিয়ে বিষয় একটু স্পষ্ট করতে চেষ্টা করি।

আত্মজাহির করার প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত; অন্যের কাছে নিজেকে প্রচার ক'রে, অপর সকলের কাছে সুখ্যাতি অর্জন ক'রে তার অহমিকা তৃপ্তি লাভ করে। আবার তার চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে পদমর্যাদায়, প্রতিভায় যার স্থান অনেক উচ্চে তার সম্মুখে সে আত্মদীনতা অনুভব ক'রে মনে মনে সংকুচিত হয়। এরূপ সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে যদি তার পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে তবে তার মনে যুগপৎ আত্মদীনতা ও আত্মপ্রাধান্য দুইটি ভাবই জেগে ওঠে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে নিজের দীনতার জন্য সংকোচ এবং এরূপ গুণী মানী ব্যক্তির গোচরে আসার সৌভাগ্য হেতু গর্ব ও আনন্দ একই সঙ্গে তার মনে আলোড়ন তোলে। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে উঠলেও বক্তার, বিশেষ ক'রে নূতন বক্তার মনে আত্মদীনতার ভাব অসাচ্ছন্দ্য সঞ্চার ক'রে তার দেহে অতি মৃদু কম্পন জাগায়। এর মধ্যে যে কেবল ভয় ও ব্যথাই রয়েছে তা নয়, আত্ম-জাহিরের যে সুযোগ সে পেয়েছে তার জন্য সূক্ষ্ম পুলকের অনুভূতিও জড়ানো আছে। তাই বক্তা বা অভিনেতা প্রথম বার মঞ্চে উঠে হাতে পায়ে কিছুটা কাঁপন অনুভব করলেও ভয়ে পালায় না, আত্মজাহিরের নেশায় বরং আরো বেশী সে-সুযোগ নেবার কামনা করে। এই ব্যথা ও আনন্দ মেশানো অনুভূতির প্রকাশ দেখা দেয় সরমপূর্ণ আচরণের ভিতর দিয়ে।

সরম

সরমের মধ্যে আত্মগৌরবের যে চাপা আনন্দ আছে লজ্জায় তা নাই। আত্মদীনতা প্রবল হ'য়ে আত্মমর্যাদাকে সাময়িকভাবে ক্ষুণ্ণ ক'রে দেয়; লজ্জার সঙ্গে অপমান এবং মানসিক বেদনাবোধ জড়িত থাকে। টাকা ধার নিয়ে শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও যে ব্যক্তি অভাবের দরুণ ঋণ পরিশোধ করতে পারছে না পথে পাওনাদারের সঙ্গে দেখা হলে তার মনে আনন্দ হয় না নিশ্চয়ই; কেউ

লজ্জা

যদি কোন ব্যক্তির পরম উপকারের প্রতিদানে ইচ্ছা ক'রে জেনেশুনে ঘোরতর অপকার করে তবে কখনও সে-উপকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে লজ্জায় তার মাথা হেঁট না হ'য়ে পারবে না। আত্মসচেতন লোকের নিকট লজ্জা বড়ই অপ্রীতিকর। লজ্জার তীব্রতা বেশী হ'লে অহমিকা বোধে আঘাত পড়ে, তখন রোষ জ্বলে ওঠে এবং রোষ যদি স্থায়ী হয় তবে তা পরিণত হয় প্রতিহিংসার বাসনায়।

অনুতাপ

এর মধ্যে মেশানো আছে মনোব্যথা ও ক্রোধ ; এ ক্রোধ অন্যের ওপর নয়, নিজের ওপর। মানুষ যখন নিজে এমন কোন কাজ ক'রে ফেলে যার ফলে নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় কিম্বা নিজের কোন গুরুতর ক্ষতি ঘটে যা পূরণ করা সম্ভব নয়, তখন তার বিচারশীল মন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে। সে-অন্যায় অন্য কেউ করলে তার প্রতি রোষ, প্রতিহিংসা জ্বলে উঠত এবং তাকে শাস্তি দিতে পারলে ক্ষুব্ধ মন হয়ত কিছুটা শান্ত হত কিন্তু নিজেই যেখানে অপরাধী সেখানে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে না। অনুতাপ বাণের মত মনকে বিদ্ধ করতে থাকে, তূষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলে' অন্তর দগ্ধ করে। অনুশোচনার প্রবল আবেগে অনেক সময় মানুষ নিজের মাথায় নিজে আঘাত করে ; প্রায়শ্চিত্ত ক'রে উপবাস ক'রে দেহকে শাস্তি দিয়ে মনের ব্যথা দূর করার চেষ্টা করে ; অনুতাপ নিদারুণ এবং অসহ্য হ'লে মানুষ আত্মহত্যা ক'রে সব জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেয়।

প্রশংসা

মানুষ তার মন নিয়ে এক স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে' তোলে। সেখানে সে নিজেই তার অধিপতি ; তাকে কেন্দ্র ক'রেই তার কামনা বাসনা পল্লবিত হ'য়ে ওঠে। আত্মতৃপ্তির মত আনন্দ মানুষের আর কিছুতে নাই ; অহংবোধ তৃপ্ত করার জন্য তার কর্মপ্রচেষ্টারও অন্ত নাই। অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজের হীনতা দেখা গেলে সেখানে অহংবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, অতি সূক্ষ্ম হ'লেও মনের গোপন স্তরে ব্যথার অনুভূতি জাগে। আত্মসচেতন মানুষের মন তাই আনন্দ ও ব্যথার রাজ্য।

প্রশংসা আত্মসচেতন, বিচারশীল মনের লক্ষণ। এতে মিশ্রিত রয়েছে বিস্ময়ের আনন্দ, আত্মদীনতার ব্যথা এবং উন্নত মনের উদারতা। কোন

ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ শক্তির পরিচয় দেয়—এ শক্তি দৈহিক শৌর্য, বা সাহিত্যিক প্রতিভা, বা শিল্প সংগীত ইত্যাদি উৎকর্ষতা বা বহুগুণের সমাবেশে বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যাই হোক না কেন, তখন মানুষ তা উপলব্ধি ক'রে অন্তরে পুলক অনুভব করে ; এরূপ গুণ বা শক্তি তাদের নিজেদের থাকলে তাদের আত্মাভিমান তৃপ্ত হত। তাই অন্তরে পুলক সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মদীনতা জনিত মনোব্যথাও তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়। মানুষের মন যদি উদার হয়, যার যে গুণ আছে তার যোগ্য সমাদর দেখানোর মত মনের সজীবতা যদি থাকে তবে মানুষ অকৃত্রিম প্রশংসা প্রকাশ করতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় লোকে মনে করে যে, অন্যের প্রশংসা করলে নিজেকে তার চেয়ে হীন ব'লে প্রকাশ্যে স্বীকার ক'রে নেওয়া হল। তাই লোক-দেখানো প্রশংসা করলেও তার শেষে 'কিন্তু' 'তবে' ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে তাকে কিছুটা খাটো ক'রে দিতে পারলে প্রশংসাকারীর মন যেন কিছুটা তৃপ্তি লাভ করে ; ভাবখানা যেন এই—এরও কিছু দোষ আছে! যেমন, উৎকৃষ্ট ছন্দ-ভাষা-ভাব-সমন্বিত কবিতা পাঠ শুনে' প্রশংসাকুণ্ঠ ব্যক্তি বলবেন হ্যাঁ, কবিতাটি ভালই তবে আরো ভালো হ'লে আরো ভালো হত।'

রবীন্দ্রনাথের 'অসম্ভব ভালো' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি ক'রে থাক আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।

যারা অত্যন্ত দাম্ভিক, আত্মশক্তি সম্বন্ধে যাদের ধারণা খুব উচ্চ তারা সাধারণতঃ অন্য ব্যক্তির প্রশংসা করতে পারে না ; যে গুণের জন্য প্রশংসা করা হবে, তারা মনে করে চেষ্টা করলে ইচ্ছা করলে, তারাও তা দেখাতে পারত ; মনে মনে তারা আত্মহীনতা সহ্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি অপরের যোগ্য গুণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পারে, বুঝতে হবে তার মন দাম্ভিকতা থেকে মুক্ত এবং উদারতা ও বিনয় দ্বারা ভূষিত।

আমরা এতক্ষণ যে ধরণের প্রশংসার কথা আলোচনা করছি তা মানুষের মন মস্তিষ্ক ও অন্তরের গুণ-সম্বন্ধে। মানুষের তৈরি জিনিস ছাড়া প্রাকৃতির ভিতরকার সুন্দর জিনিসও আমাদের প্রশংসা উদ্রেক করে। সুন্দর গড়নের

সুগন্ধি ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতির রঙের বাহার আমাদের প্রশংসা অর্জন করে, এখানে এসবের স্রষ্টার শক্তি, কৌশল ও চমৎকারিত্ব মনকে মুগ্ধ করে; যে ভক্তি-মিশ্রিত প্রশংসা মনে উদয় হয় তাকে বলি শ্রদ্ধা।

সম্ভ্রম

এর মধ্যে প্রশংসা ও ভয় মিশ্রিত রয়েছে। যখন বিরাট কোন শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, মন হয় প্রফুল্লিত, প্রশংসা জেগে উঠে অন্তরে। এই শক্তির যদি ধ্বংসকারী ক্ষমতা থাকে তবে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং মানুষ এর কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চায়। বিস্ময় এবং ভয় একত্রিত হওয়ায় মানুষ এর কাছে যেতে সাহস পায় না কিন্তু দেখার বাসনাও ত্যাগ করতে পারে না; দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে সে এই বিস্ময় ও ভয় উৎপাদনকারী বস্তু নিরীক্ষণ করতে চায়। প্রবল ঘূর্ণিঝড়, প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ড, আকাশ ছাওয়া কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিক মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগিয়ে দেয়। শক্তিমান, পদস্থ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও দর্শকের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে।

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতার মধ্যে আত্মদীনতা, কিছু পরিমাণ প্রীতি এবং বিনয় মেশানো আছে। অকারণে আপনা থেকেই কৃতজ্ঞতা কারো মনে জাগে না, অপরের কোন কাজের উপলব্ধির ফলে মনে এ ভাবের উদয় হয় এবং যিনি সে-কাজটি করেছেন তাঁর সম্মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশটি হয় সুস্পষ্ট। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই হয় অকৃত্রিম যখন উপকৃত ব্যক্তি বোঝে যে, উপকারী ব্যক্তি যা করেছেন তা তার নিজের পক্ষে করা সাধ্য ছিল না এবং তার দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয়েছে। উপকার যেখানে অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে পাওয়া যায় সেখানে কৃতজ্ঞতার স্থান কম, কেননা উপকৃত ব্যক্তি আত্মদীনতা বোধ করে না। যে-উপকার নিজের শক্তিতে লাভ করা অসাধ্য এবং যার প্রতিদান দেওয়া চলে না তাই বিনয়সম্পন্ন আত্মসচেতন মানুষের কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করে।

কৃতজ্ঞতার মধ্যে আত্মদীনতা মিশ্রিত থাকলেও এর প্রকাশ উপকৃত ব্যক্তির নিকট পীড়াদায়ক নয় কেননা এর সঙ্গে উপকারজনিত লাভের স্মৃতিও জড়িত থাকে। কিন্তু উপকারী ব্যক্তি যদি উদারতা, মহানুভবতা ও

প্রীতির পরিবর্তে ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'রে উপকার করে তবে তা উপকৃত লোকের মন বিরূপ ক'রে তোলে। কৃতজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রকাশ তখন ঘটে না ; আত্মদীনতা ও প্রীতির পরিবর্তে উপকৃত ব্যক্তির মনে রোষের সঞ্চার হয়।

ঘৃণা

এর মধ্যে বিরক্তি ও ক্রোধ এই দুটি প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই দুই প্রবৃত্তির প্রকাশে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ঘৃণার প্রকাশে তা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। যা বিরক্তি উৎপাদন করে তাকে ঠেলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, তা থেকে দেহকে সংকুচিত ক'রে নেওয়া এ প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ; ক্রোধের বৈশিষ্ট্য, যা এ প্রবৃত্তি জাগায় তাকে আঘাত ক'রে চূর্ণ করা। যে ব্যক্তি নিজের আচরণ দ্বারা অপরের ঘৃণা উদ্রেক করে তাকে কাছে আসতে দেখে সে ব্যক্তি খুশী তো হয় না মোটেই, বরং তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারলে এবং আঘাত ক'রে তার মনের রুদ্ধ ক্রোধ মেটাতে পারলে তার তৃপ্তি হত। ঘৃণাকারীর আচরণে, হাত মুখ নাড়ার ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও ক্রোধের প্রভাব দেখা যায়।

অবজ্ঞা

অবজ্ঞার মধ্যে বিরক্তি ও আত্মপ্রাধান্যের ভাব মিশ্রিত আছে। ঘৃণার ভিতর যে ক্রোধের প্রকাশ আছে, অবজ্ঞাতে তা নাই। এখানে আছে তাচ্ছিল্য, অর্থাৎ যা'কে অবজ্ঞা করা হচ্ছে সে যে অবজ্ঞাকারীর সঙ্গে তুলনায় হীন নগণ্য তা আচরণে প্রকাশ পায়। যে অবজ্ঞা করে সে হয়ত অবজ্ঞাত লোকের সম্বন্ধে বলবে : "ওর কথা বাদ দিন্ ; ও একটা অপদার্থ, ওকে তো আমি মানুষ বলেই গণ্য করি না।"

হিংসা

এর মধ্যে আত্মদীনতা ও ক্রোধের মিশ্রণ ঘটেছে। হিংসা আমরা কেবল এমন লোককেই করি যে পদমর্যাদায় এবং অবস্থায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের মনে আনে আত্মদীনতার ভাব এবং আমরা যা কামনা করেছিলাম,তা পাইনি অথচ এ লোকটি পেয়েছে এজন্য মনে জাগে অতি সূক্ষ্ম ক্রোধের কম্পন। যে পদ বা মর্যাদা আমরা কামনা করিনি তা অন্য কেউ লাভ করলে তেমন হিংসা উথলে ওঠে না যেমন ওঠে আমাদেরই কাম্য জিনিস আমাদের বঞ্চিত ক'রে অপরে লাভ করলে।

এরূপ ক্ষেত্রে যে কৃতকার্য হয় তার সঙ্গে ব্যক্তিগত রেষারেষি,প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন কি পরিচয় না থাকলেও আমরা মনে মনে তাকে আমাদের বাসনা সার্থকতার পথে প্রতিবন্ধক ব'লে মনে করি। অপরের পদোন্নতি হ'লে মনের মধ্যে খচ্ ক'রে ওঠে ; এই পদোন্নতি যে কেবল তার ব্যক্তিগত গুণের জন্য নয়, এর পিছনে আরো কতকগুলি গোপন কারণ আছে, যেমন তদ্বির, 'মামার জোর', অমুকে অমুকে প্রীতি ইত্যাদি—এ সব ইঙ্গিত ক'রে অনেক সময় হিংসুটে লোক কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করে। তা'দের মনের ভাবটা এই রকম—কেবল আসল ব্যক্তিগত গুণের নিরপেক্ষ বিচার হ'লে ও রকম উন্নতি আমাদেরও হ'তে পারত !

মানুষের আচরণ ও মনোভাবগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অহংবোধ ও আত্মপ্রীতিকে কেন্দ্র ক'রেই তার সজ্ঞান কর্মজগৎ গড়ে' উঠেছে ; এদের তৃপ্ত করার কামনায়, এদের অবমাননার হাত থেকে বাঁচবার বাসনায় মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। তার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি আচরণের মূল প্রেরণার সন্ধান করতে হবে মনের গহনে ; মনে হবে মানুষের মনের অন্তঃপুরে রয়েছে এক বিচিত্র রসায়নাগার, সেখানে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও কামনার সংমিশ্রণ ঘটছে আর তার ফলে যে মানসিক পাচন বা বিচিত্র রস সৃষ্টি হচ্ছে তার রঙ, ঝাঁঝ, উত্তেজনা, তীব্রতা প্রকাশ পাচ্ছে বাইরেকার আচরণে। মানুষের মন এক একটি সদা-সক্রিয় কারখানা।

হাসি

হাসি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তিটি প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই নিজস্ব। কুকুর, বিড়াল, গরু, গোড়া প্রভৃতি প্রাণী তা'দের নিজস্ব ভঙ্গীতে সন্তোষ প্রকাশ ক'রে থাকে কিন্তু তা'দের মধ্যে হাসি নাই। ইতর প্রাণীর মধ্যে শিম্পাঞ্জি ও গিবনজাতীয় বানরই হাসতে পারে কিন্তু তা অতি প্রাথমিক ধরণের। মানুষের জীবনে হাসি যেমন প্রকাশমান, সুস্পষ্ট এবং ভাবের দ্যোতক এমন আর কোন প্রাণীর জীবনে নয়।

হাসির দুটি রূপ আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। মৃদু হাসি ; অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ বিস্তৃতি লাভ করে, চোখেমুখে দীপ্তি ফুটে ওঠে, কখন কখনও উজ্জ্বল দাঁতের সুন্দর বিকাশ স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে শুভ্রতা মিশিয়ে দিয়ে মানুষের মুখে সৌন্দর্যের ঝিকিমিকি ফুটিয়ে তোলে। হাসি যেন মানবদেহ-উদ্যানে ফুলের মত। হাসি না থাকলে

হাসির প্রকৃতি

মানুষের জীবন হত বিষাদমাখা, দুর্বহ গুরুভার। হাসি মনকে করে প্রফুল্ল, দেহকে করে হাল্কা, দুঃখবিপদ সহ্য করার শক্তি দেয়, অপরের সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটাতে সহায়তা করে।

উচ্চহাসি বা অট্টহাসি দমকা হাসির ক্ষণিক উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। উচ্চ শব্দ এর বিশেষত্ব। বিভিন্ন লোকের অট্টহাসির শব্দের তাল ছন্দ প্রায়ই বিভিন্ন রকমের ; ধারা শব্দের উত্থান পতনও বিভিন্ন রকমের কিন্তু প্রকাশকালীন বৈশিষ্ট্য সকলের একই প্রকার। প্রবল হাসির বেগ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলে মানুষ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে বা চলতে পারে না, হাসির বেগে এদিক ওদিক দুলতে থাকে ; বেগ আরো বেশী হলে হাসতে হাসতে ব'সে পড়ে। এর চেয়েও বেশী হ'লে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। মানুষ তখন আর অন্য কোন কোন কাজ বা চিন্তা করতে পারে না। অট্টহাসির ফলে ফুস্‌ফুস ও শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য যন্ত্র চাঙা হ'য়ে ওঠে ; দেহের অবসাদ, মনের জড়তা ও বিষণ্ণ ভাব কেটে যায় ; প্রফুল্ল সজীবতার ভাব সমগ্র দেহমনের ওপর আনন্দময় সতেজ প্রাণের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। দেহমনের স্বাস্থ্যের পক্ষে হাসি একটি প্রকৃতিকর্তৃক উদ্ভাবিত টনিকস্বরূপ ; অট্টহাসি মানুষের জীবন-রসায়ন।

আমরা হাসি কেন ?

হাসি মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি থেকে জাত ; তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার এই যে, আগের একটি অধ্যায়ে আমরা যে সকল প্রবৃত্তির আলোচনা করেছি সেগুলি সবই ইতরপ্রাণিজগতেও বিদ্যমান রয়েছে। ক্রমোন্নতির পর্যায়ে মানুষের মধ্যে সেগুলি বেশী মাত্রায় বিকশিত হয়েছে, এই মাত্র। কিন্তু হাসির অভিনব প্রকাশ মানুষেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, ইতর প্রাণীর জীবনে এর বিকাশ ঘটেনি। জীবজগতে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রাণীর ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে যা একান্ত প্রয়োজন, যা তার পক্ষে কল্যাণকর তার পুষ্টিসাধন ক'রে যা অপ্রয়োজনীয় বা অনুপযুক্ত তা বর্জন করতে করতে জীব যুগে যুগে ধাপে ধাপে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে এসেছে। মানুষের স্তরে এসে প্রকৃতি তার মধ্যে যে হাসির প্রবৃত্তি মিশিয়ে দিলেন, অট্টহাসির তুবড়িবাজিটি লুকিয়ে রাখলেন তার সত্তায়, এর কারণ কি ? আমাদের জীবনধারণের পক্ষে হাসি এমন কি উপকারে আসে যার জন্য প্রকৃতি এটিকে উদ্ভাবন ক'রে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে স্থাপন করেছেন ? দেহের মঙ্গল

সাধনে হাসি কী জৈব প্রয়োজন সাধন করে ? এক কথায় আমরা হাসি কেন ?

টমাস্ হবস্ মানুষের হাসির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেন, অপরের ভুলত্রুটি ছোটখাটো বিপর্যয় দেখলে তা'দের সঙ্গে তুলনায় আমরা যে শ্রেষ্ঠ এই বোধটি মুহূর্তে মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে ; এই অকস্মাৎ আত্ম-গৌরব-বোধ আনন্দের উচ্ছ্বাসে অট্টহাসিরূপে ফেটে পড়ে। অধ্যাপক বার্গসন বলেন, কিম্ভূতকিমাকার কিছু, অপর মানুষের দোষত্রুটি, অসঙ্গতি দেখে যে আমরা অট্টহাসি হাসি, তার মাধ্যমে অপরকে লজ্জা দিয়ে সংশোধন করা হয়। হাসি যেন অপরের দোষত্রুটির সংশোধক। উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল হাবস্ ও বার্গসনের মত খণ্ডন ক'রে হাসি-প্রবৃত্তির স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সুযুক্তিপূর্ণ এবং মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গতিশীল। আমরা সংক্ষেপে এখানে তা উল্লেখ করব।

আমরা কখন্ হাসি ? অন্য মানুষের ছোটখাটো অনর্থ, দুর্বিপাক, বিপদ, বিপর্যয় দেখলে আমাদের মনে অকস্মাৎ হাসির ফোয়ারা যেন খুলে যায়। ভিতর থেকে যখন হাসি বুদ্বুদের মত উঠতে থাকে তখন তা চেপে রাখা কঠিন ; হাসি সংক্রামক, অন্যকে হাসতে দেখলে, হাসির উচ্চ শব্দ কানে গেলে হাসির প্রবণতা জেগে ওঠে মনে। একজন লোক পিছলে প'ড়ে গেলে হঠাৎ হাসি আসে ; কিন্তু সেই লোক যদি এমনভাবে পড়ে যে, মাথা চূর্ণ হ'য়ে যায়, হাত পায়ের হাড় ভেঙে মাংসের ওপর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, কিম্বা ট্রামবাসের নীচে প'ড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায় তখন হাসি আসে না ; আসে সমবেদনা, সহানুভূতি। তেমনি একজন হয়তো একটি রসগোল্লা বা অন্য কোন সুস্বাদু খাদ্য লোলুপতার সঙ্গে মুখে দিতে যাচ্ছে এমন সময় তা মুখ থেকে ফস্‌কে প'ড়ে গেল ; তার এই ক্ষতির দৃশ্য দেখলে হাসি আসা স্বাভাবিক কিন্তু সে যদি মূল্যবান কোন প্রিয় জিনিস বা প্রিয় ব্যক্তিকে হারায় তখন তা দেখে লোকে হাসে না। তখন বরং সমবেদনাতে দ্রষ্টার মনেও বেদনা-বোধ জাগে। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে—বেদনাবোধ, সমবেদনা জাগে কেন ? এটি জীবের স্বভাব ধর্ম। শিশু অতি বাল্যকাল থেকেই এর পরিচয় দেয়, ভাইবোনদের কাঁদতে দেখলে কাঁদে, হাসতে দেখলে হাসে ; প্রথম প্রথম কিছু না বুঝেই হাসে কাঁদে। মানুষ সামাজিক জীব। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে পরস্পরের সহযোগিতার ভিতর দিয়ে তার ক্রমোন্নতি

সম্ভবপর হয়েছে। স্বাভাবিক দল-প্রবৃত্তির সঙ্গে উন্নত মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির মিশ্রণ হওয়ায় মানুষের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু এই সঙ্গে তার দুঃখবোধও ব্যাপক হ'য়ে পড়েছে। বুদ্ধি ও অনুভূতির সাহায্যে সে অপরের আনন্দের যেমন অংশীদার হয় তেমনি অপরের দুঃখের অনুভূতিও তার মনে দুঃখ জাগায়। আনন্দ মনকে প্রফুল্ল করে, দেহে আনে সুস্থ সজীবতাবোধের পুলক শিহরণ ; দুঃখবোধ মনকে বিষণ্ণ করে, দেহে আনে অবসাদের গ্লানি।

দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে মানুষ যদি সর্বদা অপরের সব রকম দুঃখকষ্টের, দুর্বিপাক বিপর্যয়ের অনুভূতিতে কেবল দুঃখবোধ করতে থাকত তবে তার জীবন হ'ত একান্ত দুর্বহ, কেননা মানুষের দোষত্রুটি, ভুলচুকের তো অন্ত নাই। তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মানুষকে এই দুঃখবহনের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে প্রকৃতি তার মজ্জায় মিশিয়ে দিয়েছেন হাসি-প্রবৃত্তি এবং দেহের মধ্যে এমন এক কৌশল স্থাপন করেছেন যার ফলে এক ঢিলে দুই পাখী মারার সুবিধা হ'য়েছে। হাসি-প্রবৃত্তি অন্যের স্খলন, ত্রুটি, অল্পরকমের বিপর্যয় দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। যেসব ঘটনা ও দৃশ্য মানুষের মনে সমবেদনার ব্যথা ও বিপন্নতা সঞ্চার করত, তার হাত থেকে তো মানুষ অব্যাহতি পায়ই, অধিকন্তু অবশ্যম্ভাবী বেদনাবোধকে হাসিতে পরিণত ক'রে তা দিয়ে দেহমনের সরসতা ও সুস্থভাব আরো বেশী ক'রে তোলা হয়। মানুষের মঙ্গলের জন্যই প্রকৃতি মানবদেহে হাসির প্রবৃত্তি ও হাসিবিকাশের যন্ত্র গ'ড়ে তুলেছেন। মানুষের মত কল্পনা ও অনুভূতিপ্রধান জীব যদি স্পাঞ্জের জল শোষণ করার মত কেবল অপরের ব্যথা বেদনা, পরাভবের গ্লানি ও বিপর্যয়ের দুঃখ নিজে গ্রহণ করত তবে বিষন্নতার ভার বহন করা সত্যি তার পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে পড়ত।

মানুষের জীবনে হাসির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শৈশবে শিশু হাসে সহজ সংস্কারের বশে, অন্যের দেখাদেখি ; ক্রমে বয়স, বুদ্ধি, কল্পনা ও অনুভূতি-শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মনোজগতের প্রসার ঘটতে থাকে, হাসি-জাগানো উপকরণেও ক্রমে বুদ্ধি ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুর এবং স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তির হাসির উদ্রেক করতে হলে প্রয়োজন স্থূল উপকরণের, যেমন ধপাৎ করে মাটিতে পড়া, কিম্ভূতকিমাকার সাজগোজ করা, বিকলাঙ্গের মত ভাণ ক'রে চলা, বিকৃত মুখভঙ্গী করা ইত্যাদি। যাত্রা থিয়েটারে সঙের সাজ,

হাস্যকৌতুকের বিভিন্ন পর্যায়

সার্কাসে ক্লাউন বা ভাঁড়ের ভাঁড়ামি তাই এরূপ দর্শকের হাসির খোরাক যোগায়।

বুদ্ধি, অনুভূতি এবং রসবোধ উন্নত হ'লে মানুষ সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যকৌতুক বেশী পছন্দ করে ; স্থূল কৌতুকের পর্যায় ছাড়িয়ে তারা তখন উপরের স্তরে উঠেছে বুঝতে হবে। গোপাল ভাঁড়ের গল্প আর রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', পরশুরামের 'কজ্জলী', 'গড্ডলিকা' 'হনুমানের স্বপ্ন' পুস্তকের গল্প পাশাপাশি তুলনা করলে ভাঁড় মহাশয়ের কাহিনীর ভাঁড়ত্ব বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কোন্ ধরণের কাহিনী বা কৌতুক মনে হাসির উপকরণ যোগায় এথেকে যে-কোন ব্যক্তি কোন্ পর্যায়ের রসবেত্তা তা সহজেই বোঝা যায়। মানুষের কল্পনা শক্তি যত বেশী হয়, যত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে নিজের মনের ভাব এবং কোন ভাবের প্রতিক্রিয়া অন্যের ওপর কেমন হ'তে পারে তা বুঝতে পারে, সে তত সূক্ষ্ম রসিকতায় হাসির উপকরণ পাবে। বুদ্ধিমান মানুষ নিজের দোষত্রুটি নিজের ছোট খাটো বিপর্যয় উপলব্ধি ক'রে অনেক সময় নিজের মনেই হাসে, যেমন সে হাসত অপরের এমনি দুর্বিপাক দেখে।

হাসি সংক্রামক ; তাছাড়া কোন হাস্যকৌতুকের বিষয় একা একা উপভোগ করার চেয়ে সমভাবাপন্ন আর কতকের সঙ্গে একত্র উপভোগ করলে তাতে আনন্দ বহুগুণে বেশী হয়। কোন কাহিনী শুনে বা পড়ে তার মধ্যে বুদ্ধির খেলায় একজনের কাছে অপরের পরাভব উপলব্ধি ক'রে আমরা হেসে উঠি ; অবশ্য একজন পরাভূত হ'ল বা দুর্ভোগ ভোগ করল জন্যই যে হাসি জেগে উঠল, একথা মনে ভেবে দেখি না। ছোট্ট কাহিনীর সরস বর্ণনা রুচিশীল মানুষের মনে কেমন নির্মল হাসি উদ্রেক করতে পারে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের' রসরচনা পরিবেশক 'হোমা'র টুকরালেখা থেকে তার দুএকট নমুনার উল্লেখ করি ঃ

পথের ধারে নাপিত ব'সে এক ব্যক্তির দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে। নাপিতের পাশে একটা কুকুর ব'সে আছে। লোকটির নাপিতের সঙ্গে একটু আলাপ জমানোর ইচ্ছা হল ; কুকুরটির প্রশংসা ক'রে বলল—বাঃ কুকুরটি যে এক দৃষ্টে চেয়ে ব'সে আছে। এটি বুঝি তোমার খুব ভক্ত ?

নাপিত বলল—না, তা নয়। মক্কেলের দাড়ি কামাতে আমি মাঝে মাঝে কান কেটে ফেলি কিনা, সেই লোভে।

* * *

নাপিতের হাতে ধারালো ক্ষুর, কান কেটে ফেলা তার অভ্যাস, কাটা কোন খাওয়ার লোভে কুকুর নাপিতের ভক্ত হয়েছে ; এরূপ অবস্থায় সে মক্কেল বেচারীর মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল তা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করার ফলে হাসি উথলে ওঠে।

* * *

গীর্জার সীমানার মধ্যে একটি গাধা ম'রে আছে ; তার মালিকের কোন খোঁজ নাই। পাদরী মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জানালেন এর একটা ব্যবস্থা করতে।

চেয়ারম্যান পাল্টা চিঠিতে লিখলেন—মৃতের সৎকার করা পাদরীরই কর্তব্য কাজ।

পাদরী তার জবাবে লিখলেন—হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আমার প্রথম কর্তব্য মৃতের নিকট-আত্মীয়কে খবর দেওয়া।

* * *

এখানে চেয়ারম্যান ও পাদরীর মধ্যে যে সরস মন্তব্য ও উপস্থিত বুদ্ধির প্যাঁচ কষাকষি চলেছে তাতে চেয়ারম্যানের পরাভব প্রকৃতই উপভোগ্য।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি

মনের যতগুলি বিস্ময়কর গুণ বা ক্ষমতা আছে তার একটির বিশিষ্ট প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে। পূর্বের অভিজ্ঞতা, দৃশ্য বা ঘটনার বিষয় যখন মনে জেগে ওঠে তাকে বলি স্মৃতি ; জানা ঘটনা বা বিষয় যখন মন থেকে তলিয়ে যায় তাকে বলি বিস্মৃতি। মনের কোন্ অদৃশ্য অজ্ঞাত কোঠায় অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি এমন শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান থাকে যে, যখন প্রয়োজন তখনি সেটি ইচ্ছামাত্র বের ক'রে আনা যায় ? প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে যে অসংখ্য বিচিত্র বিষয় দেখা হচ্ছে, শেখা হচ্ছে, অনুভব করা হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হচ্ছে মনের মহাফেজখানায়। মজার বিষয় এই যে, এগুলি এলোমেলো নয় ; অভিজ্ঞতাগুলি যেন সাজান রয়েছে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্তভাবে, একটির সঙ্গে আরেকটি প্রায়ই জট পাকিয়ে যায় না। মনের এই অসাধারণ শক্তির জন্যই মানুষের সমাজ-জীবন ও সভ্যতা গ'ড়ে তোলা সম্ভবপর হয়েছে।

ইতরপ্রাণীর জীবনে

ইতরপ্রাণীর জীবনেও স্মৃতির ক্রিয়াকলাপ কিছু কিছু দেখতে পাই। কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জীব তা'দের পালনকারীকে, আদরকারীকে চিনতে পারে ; কেউ তাদের আঘাত ক'রে থাকলে বা অন্য কোন প্রকারে দৈহিক ব্যথা দিয়ে থাকলে তাকে দেখলেই আগের সেই অনুভূতির স্মৃতি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তাদের কাছে ; তাদের আচরণে এই ভাবটি প্রকাশ পায়। কেউ যদি কোন কুকুর বা বিড়ালকে শারীরিক কষ্ট দিয়ে থাকে তবে কিছুদিন পরে হলেও তাকে দেখতে পেলে বিড়ালটি ছুটে পালাবে, কুকুরটি হয়তো গোঁ গোঁ করবে কিংবা ভীতু হলে লেজ নীচু ক'রে তার কাছ থেকে দূর স'রে যাবে আর তাকে ফিরে ফিরে দেখবে রোষমাখা চোখে। কুকুরের আচরণে ক্রোধ ও কৃতজ্ঞতা উভয়েরই প্রকাশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি কথা-বলা পাখীকে বুলি শেখালে তারা অনেক সময় বিভিন্ন লোক দেখলে ঠিক যে ধরণের কথা বলতে শিখেছে তাই বলে। এখানেও স্মৃতির খেলা রয়েছে। তবে কুকুর বিড়াল এর চেয়ে উন্নত স্তরের স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে।

মানুষের জীবনে স্মৃতিশক্তি অভিনবরূপে প্রকাশমান রয়েছে। সমগ্র

মানবজীবনটাই যেন স্মৃতির আলোকসূত্র দিয়ে গাঁথা সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা-ফুলের মালা। স্মৃতিকে বলা চলে মনের স্বয়ংক্রিয় টর্চলাইট; যে অভিজ্ঞতাটুকুর এখন প্রয়োজন শুধু সেইখানটিতে স্মৃতির আলোক ফেলে তা স্পষ্ট ক'রে তুলি। অভিজ্ঞতা কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। অপর যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে যেখানেই মনের কোন প্রকার সংযোগ ঘটে তাকেই বলতে পারি অভিজ্ঞতা। অপর মানুষের সঙ্গে আচরণে যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করি, তেমনি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় অপর সকল বিষয় দেখে, শুনে, শিখে, অনুভব ক'রে। শিশু যে অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে, তার অর্থ উপলব্ধি করে, তার উচ্চারণ-ধ্বনি শোনে, অক্ষরকে নির্দিষ্ট আকারে লিখতে শেখে—এ সবই তো অভিজ্ঞতা। তেমনি একটি গানের সুর শুনলে মনের ওপর যেন সুরের ছাপ অদৃশ্য অভিজ্ঞতার মত থেকে যায়; সেই গানটিই অন্যপ্রকার সুরে কেউ গাইলে পূর্বের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল না হলেই বলি 'এক সুরে গাওয়া হল না।' এক্ষেত্রে মন পূর্বের সুরের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের গাওয়া-গানের সুর মিলিয়ে দেখে।

মানুষের জীবনে

কাজেই দেখা যাচ্ছে মানুষের শিক্ষার, শুধু শিক্ষার কেন জীবনযাপনে সকল প্রকার কার্যকলাপের মূল ভিত্তি হল স্মৃতিশক্তি। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার ছাপ মনের মধ্যে ধ'রে রাখার এবং যখনি প্রয়োজন তখনি তা আচরণে প্রয়োগ করার ক্ষমতা মনের আছে বলেই মানুষের পক্ষে নূতন বিষয় শেখা এবং অপর দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে সমাজে বাস করা সম্ভবপর হয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের সজ্ঞান মনের পরিধি খুব বেশী নয়; আমরা যখন কোন বিষয় চিন্তা করি, কোন কিছু সম্বন্ধে অপরের সঙ্গে আলোচনা করি অথবা সে সম্বন্ধে অপরকে বুঝিয়ে বলি তখন আমাদের সজ্ঞান মন শুধু সেই বিষয়টির ওপরই চেতন মনের প্রায় সবখানি আলোকপাত করে; রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করলে যেমন আলোকিত অংশই চোখে পড়ে, সন্নিহিত আর সকল স্থান আঁধারে ঢাকা থাকে, সেখানে কি আছে কিছুই বোঝা যায় না, তেমনি যে-বিষয়ের ওপর সচেতন মন একাগ্রতার আলো নিক্ষেপ করে তখন শুধু সেইটুকু নিয়েই আমরা ব্যাপৃত থাকি। সেই সচেতন মনের সক্রিয় মুহূর্তকে আমরা বলতে পারি জীবন্ত বর্তমান। জীবন্ত বর্তমান মুহূর্তে মনের যে অংশটুকু আলোকিত এবং যে বিষয় নিয়ে মন ব্যাপৃত

তা ছাড়াও কত শত বিষয় রয়েছে মনের তলায় বিস্মৃতির আঁধারে। সুস্থ মনের একটি বৈশিষ্ট্য হল তার স্মৃতির প্রয়োগে সংযম। মন শুধু সেই সকল অভিজ্ঞতার ওপরই স্মৃতির আলো নিক্ষেপ করে যেগুলি প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজনীয় বোধ হয়। অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে না, তার কারণ যে কোন বিষয়েই ভাবতে গেলে বা বলতে গেলে মানসিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন এবং এই শৃঙ্খলা কেবল সুস্থ মনের পক্ষে সম্ভব। পাগলের প্রলাপ আর মাতালের বকুনির মধ্যে এই মানসিক শৃঙ্খলার স্থিরতা নাই; তাই তা'দের কথা অসম্বদ্ধ, ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশক নয়। দেহের যে স্নায়ুগুলি চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি বিকল হ'লে মনের ক্রিয়াকলাপে বিপর্যয় দেখা দেয়; স্মৃতির ভাণ্ডারে জমানো অভিজ্ঞতাগুলি যেন ওলটপালট হ'য়ে যায়—বাক্যে তা'দের প্রকাশ পাওয়ার সময় এক কথার সঙ্গে অন্য কথা যায় মিশে। এরূপ ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি, তার স্বাভাবিক প্রকাশে বিঘ্ন ঘটেছে, বুঝতে হবে।

স্মৃতির প্রয়োগ

স্মৃতির স্বাভাবিক কার্যকারিতার ওপরই আমাদের মানসিক জীবনের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশ নির্ভর করে। কিন্তু সুস্থমনা মানুষের জীবনেও স্মৃতি মাঝে মাঝে মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে। তার পরিচয় তো আমরা নিত্যই পাই। কিছুদিন আগে কলকাতার ষ্টেট বাসগুলিতে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের বিবরণ সংবাদ পত্রে বেরিয়েছিল। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে যাবার সময় যে সব জিনিস ভুল ক'রে ফেলে রেখে গিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ছাতা, স্যাণ্ডাল, কেনা জিনিসের নানা রকম পুঁটলি, স্যুটকেস, গায়ের কাপড়, মানিব্যাগ, বহু টাকা দামের গহনা-ভরা বাক্স, এমন কি শিশু সন্তান পর্যন্ত। একজন ইংরেজ লেখক তাঁর এক বন্ধুর অন্যমনস্কতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন তিনি একদিন তাঁর ছেলেকে ঠেলাগাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এক হোটেলের সামনে ঘুমন্ত-ছেলে-সুদ্ধ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে কিছু পানীয় কিনতে হোটেলে ঢুকেছিলেন। তারপর অন্যপথ দিয়ে বেরিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিলেন; ভ্রমণ শেষ ক'রে বাসায় ফিরে এসেও তাঁর মনে পড়েনি তিনি ছেলেকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা।

ফরাসী দেশের এক বিশিষ্ট রাজনীতিকের অন্যমনস্কতার কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন তিনি কোন জরুরী কাজে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, পাছে কেউ তাঁর খোঁজ করতে এসে বৃথা হয়রানি ভোগ করে এই জন্য তিনি একখানা কাগজে লিখে রেখেছিলেন—'মঁসিয়ে অমুক...কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছেন।' কিছুক্ষণ পরে তিনি বাসায় ফিরে দরজার সঙ্গে ঐ লেখাটি দেখে নিজেই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে, বাড়ি তাঁরই, তিনিই ঐ কাগজে উল্লিখিত ব্যক্তি!

শিল্পী, দার্শনিক এবং অসাধারণ অন্যমনস্ক ব্যক্তিদের কথা বাদ দিলেও আমরা অনেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট বিস্মৃতির পরিচয় দিয়ে থাকি। চিঠি লিখে পকেটে রেখে ডাকবাক্সে ফেলে দিতে ভুল করা, সময়-মত ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া, অন্যের কাছ থেকে বই পড়তে নিয়ে এসে দিতে ভুল করা, অন্যের ছোটখাটো পাওনা ঠিক সময় মত মিটিয়ে দিতে ভুলে যাওয়া রান্নার সময় তরকারীতে লবণ না দেওয়া, চায়ে চিনি দিতে ভুলে যাওয়া, চশমার খাপ, নস্যের কৌটা ফেলে যাওয়া—এ রকম ভুল কোন দিনই করেনি এমন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ।

তবু, অন্যমনস্কতার এই সব উদাহরণ দেখে স্মৃতিশক্তির বিচার করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে, যত বিষয় মানুষ মনে রাখে এবং যেভাবে ঠিক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজটি করে তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। মানুষ কত শত বিষয় শেখে, কোন্ কথা বলতে কি বোঝায় তা মনে রাখে, কবিতা, গান, গানের সুর মনে রাখে, বিজ্ঞানের বিষয়, ইতিহাসের কাহিনী, রোমাঞ্চকর গল্প, উপন্যাস কাব্য মহাকাব্যের বিবরণ, নাটক সিনেমার ঘটনা তার স্মৃতির কোঠায় ভিড় ক'রে থাকে। আরো সূক্ষ্মক্ষেত্রে দেখতে পাই মানুষ তার বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা মনে রাখে, টেলিফোন নম্বর মনে রাখে, বিশিষ্ট ওষুধপত্রের নাম মনে রাখে, বিখ্যাত আবিষ্কারকদের নাম ও আবিষ্কারের তারিখ, বিখ্যাত খেলোয়াড়-দের নাম ও তা'দের কৃতিত্ব, কোন্ মাঠে কোন্ ব্যাটস্‌ম্যান কত রান তুলেছিলেন কে কয়টি উইকেট নিয়েছিলেন—এ সব কথাও তো মনে থাকে। শুধু তাই নয়, কোন পরিচিত লোকের প্রসঙ্গ উঠলেই মনে পড়ে সে লোকের চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের কথা; বিভিন্ন লোকের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য পর্যন্ত মনে থাকে, লোক না দেখেও তার গলার স্বর শুনে চিনতে পারি।

স্মৃতিশক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্মৃতি সাধারণতঃ চোখ এবং কান এই দুইটি ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন ক'রে মনের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে থাকে। কারো চোখের স্মৃতি সুস্পষ্ট, কারো বা কানের স্মৃতি প্রবল। চোখের স্মৃতি যা'দের প্রধান অতীতের ঘটনা তা'দের মনের চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তা'দের স্মৃতির মণিকোঠায় বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি যেন থরে থরে সাজান থাকে। কবিরা সাধারণতঃ চোখেরস্মৃতি-প্রধান। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁর এক বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন, বিষন্নতায় মন যখন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত তখন বহুদিন আগে দেখা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য স্মৃতির ভিতর দিয়ে তাঁর মানসচক্ষের সম্মুখে জেগে উঠত; আনন্দে আবার তাঁর হৃদয় হত ভরপুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কবিতায় জলভারনত কালো মেঘ ও বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কবিতাটি লেখা হয়েছে ফাল্গুন মাসে। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখেছিলেন, "যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচাধানে ডিঙি নৌকা বোঝাই ক'রে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এপারে চলে আসছে সেদিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে।" মেঘবিহীন উষ্ণ ফাল্গুন দিনে চোখের স্মৃতি কবির মনে ঘনবরষার ছবি এনে দিয়েছিল। আবার, যা'দের কানের স্মৃতি প্রধান, তারা যেন কথা, শব্দ, সংগীত, সুর 'রেকর্ড' ক'রে রাখে স্মৃতির পাতে। কোন্ ধরণের স্মৃতি আমাদের মধ্যে প্রবল তা প্রত্যেকে নিজের মনের দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি।

স্মৃতিশক্তির বৈশিষ্ট্য

বিস্মৃতি

আমরা সচেতন মন নিয়ে যা কিছু দেখছি, শুনছি, শিখছি তা সবই জমা হচ্ছে মনের ভাণ্ডারে। যে তথ্য বা বিষয় আবার ভাববার বা চিন্তা করবার প্রয়োজন হচ্ছে না তা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির নীচের তলায়—বিস্মৃতিতে, নদীজলের স্রোত থেকে যেমন ক্রমশঃ পলিমাটির স্তর অলক্ষ্যে জমতে থাকে তেমনি। জলের আলোড়ন যত কম পলি সংস্থাপন তত বেশী হতে থাকে; মানুষের স্মৃতি ও বিস্মৃতির ব্যাপারেও তেমনি। নূতন নূতন বিষয় শিখতে আমরা সব জিনিস সহজে মনে রাখতে পারিনে; মনের সঙ্গে অধীত বিষয়ের একটা যোগসূত্রে গড়ে না তুলতে পারলে তা স্মৃতিতে স্পষ্ট

হয়ে বেশীদিন বিরাজ করে না। স্মৃতিশক্তি সবারই আছে, তবে কা'রো স্বভাবতই এ শক্তি তীক্ষ্ণ, উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট ফটোফিল্মের মত; যা দেখে বা শোনে তারই সুস্পষ্ট ছাপ রেখে দেয় মনের ওপর। লর্ড মেকলের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার কোন বই পড়া শেষ ক'রে তিনি প্রথম পাতার প্রথম লাইন থেকে শেষ পাতার শেষ লাইন পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই ধরণের অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন; বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও ছাত্র-জীবনে এইরূপ অনন্যসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। এরূপ বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি সকলেরই থাকে না তবে মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চেষ্টা করলে সাধারণ লোকের পক্ষেও স্মৃতিশক্তি বাড়ান যে সম্ভবপর তা প্রমাণিত হয়েছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোন অধীত বিষয় স্মৃতিতে স্পষ্ট ক'রে ধ'রে রাখতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত, চাই আত্মশক্তির ওপর আস্থা অর্থাৎ অধীত বিষয়টি মুখস্থ ক'রে রাখার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিজের ওপর বিশ্বাস; দ্বিতীয়ত, অধীত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ; তৃতীয়ত, একবারে বহু সময় ধ'রে চেষ্টা ক'রে মুখস্থ না ক'রে কিছু সময় অন্তর অন্তর অনেক কয়দিন ধ'রে পুনরাবৃত্তি করা। এইভাবে নূতন বিষয়টির সঙ্গে স্মৃতির যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে তার ফল হবে দীর্ঘস্থায়ী।

আমরা ভুলি কেন?

আমাদের দেহ, প্রত্যঙ্গ এবং দেহের অভ্যন্তরের প্রতিটি যন্ত্র প্রয়োজন অনুসারে গঠিত; এদের যা বৈশিষ্ট্য তাও অর্জিত হয়েছে বহু শত বৎসরের জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় মানুষের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য স্মৃতি ও বিস্মৃতি দুইটিরই প্রয়োজন আছে। স্মৃতিশক্তি না থাকলে মানুষের সাহিত্য বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতি—এক কথায় সভ্যজীবন গঠন সম্ভবপর হত না। আবার, মানুষের অভিজ্ঞতা ও নিত্যনূতন জানা-বিষয়ের কতক যদি বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে না থাকত তবে স্মৃতির ভারে মানুষের জীবন হ'য়ে উঠত দুর্বহ। বিস্মৃতি আছে বলেই স্মৃতি সতেজ থাকে, বিস্মৃতি মনের ওপর স্নিগ্ধ শান্ত প্রলেপ বুলিয়ে দেয় ব'লেই মানুষ শোকতাপ

দুঃখব্যথার তীব্র জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। শোকের জ্বালা, নৈরাশ্যের ব্যথা, অনুতাপের গ্লানি মানুষ যদি ভুলতে না পারত, সারাজীবনব্যাপী লব্ধ সব অভিজ্ঞতাই যদি মানুষের মনে অম্লান তীব্রতা নিয়ে সর্বদা জেগে থাকত তবে কি তা মানুষের পক্ষে সুখের হত? দুঃখের ভারে মানুষ কি ভেঙে পড়ত না? নিদ্রা যেমন দেহের গ্লানি দূর ক'রে দেহকে সতেজ ক'রে তোলার উপায়, বিস্মৃতিও তেমনি প্রকৃতিকর্তৃক উদ্ভাবিত মনের স্বাস্থ্য বিধানের পক্ষে অপরিহার্য কৌশলমাত্র। আমরা ভুলতে পারি; তাই আমাদের পক্ষে নূতন নূতন বিষয় শেখা এবং সুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়েছে।

আত্মবোধের ক্রমবিকাশ

ইতরপ্রাণীর জীবনে যে প্রবৃত্তিগুলি সর্বদা সক্রিয় থেকে তা'দের অন্ধ আবেগে কাজে লিপ্ত রেখেছে, সেই প্রবৃত্তির তাগিদ রয়েছে মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার ও আচরণের মূলেও। তা'ছাড়া, বিভিন্ন প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটায় যে রস বা জটিল ভাবের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, তা প্রভাব বিস্তার করে তার আচরণের ওপর, অনুরঞ্জিত করে তার সমগ্র জীবনকে। এর সঙ্গে আছে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, নিজের অন্তর দিয়ে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝবার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করবার শক্তি। এই সব গুণ মানুষের কাজে আনে সফলতা, তার প্রবৃত্তির প্রেরণাকে সার্থক ক'রে তুলতে সাহায্য করে। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টি সহজভাবে বোঝা যাবে ঃ

প্রাণ ধারণের জন্য খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক। এইরূপ যে কোন প্রবৃত্তি সফল করার জন্য মানুষ প্রয়োজন হ'লে মানসিক গুণগুলি প্রয়োগ ক'রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যে সব বাধা বিপত্তি থাকে তা দূর করে। যেমন, হয়ত একটি ছেলে জানে যে, আলমারীতে সুস্বাদু খাবার আছে ; ক্ষিদে পেয়েছে, অন্য কোথাও খাবার পায়নি ; আলমারী থেকে চুপি চুপি নিয়ে খেয়েছে। আলমারী খোলার জন্য তা'কে হয়ত চাবির সন্ধান করতে হল, আবার যথাস্থানে লুকিয়ে রাখতে হল। আবার ক্ষিদে পেলে তার আলমারীর ভিতরকার খাবারের কথা মনে পড়ল, কিভাবে তা পাওয়া যেতে পারে তার প্রক্রিয়াটাও মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদিন হয়ত সে ধরা পড়ে গেল বয়স্ক কোন কঠোর-প্রকৃতি লোকের কাছে, অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি পেল ; অন্যদিন আবার খাবার সংগ্রহ করার তাগিদ মনে উঠলেই মনে পড়বে শাস্তির কথা, ভয় হবে মনে ; ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে তখন চুরি করতে যাবে না, সুযোগ পেলে লুকিয়ে অন্য সময়ে নেবে। এইভাবে দেখা যায়, মানুষ তার বাসনা পূরণ করার জন্য অন্যান্য প্রবৃত্তির এবং মানসিক শক্তিগুলির প্রয়োগ ক'রে থাকে, বাধা প্রতিবন্ধক দূর ক'রে সে তা'র প্রধান কাম্য বিষয় লাভ করার জন্য চেষ্টা ক'রে থাকে।

এখন মনে হ'তে পারে, ইতর প্রাণীর আছে কেবল প্রবৃত্তির আবেগ, মানুষের আছে প্রবৃত্তির আবেগ ও বুদ্ধির শক্তি ; কাজেই যে কোন প্রকারেই

হোক—ছলে বলে কৌশলে, বুদ্ধি খাটিয়ে—সে তা'র প্রবৃত্তির চরম সার্থকতা লাভ করবে অর্থাৎ সে হবে কৌশলী, বুদ্ধিমান, শক্তিমান পশু।

কিন্তু মানুষ তা'র ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই অতিরিক্ত শক্তি তা'র আদিম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার কাজে লাগায়নি, প্রয়োগ করেছে প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত ও মার্জিত করতে; অতিরিক্ত শক্তির সাহায্যে পশুত্বকে বর্ধিত করেনি, বরং তা' খর্ব ক'রে মনুষ্যত্বের মহিমা গ'ড়ে তুলেছে; গাছ যেমন তা'র সমগ্র রস দিয়ে কেবল ফুলকে বিরাট আকার দান করে না, একটি নির্দিষ্ট আকার লাভ করার পর তা'কে শুকিয়ে ফেলে তা'র ভিতর থেকে পুষ্ট ক'রে তোলে ফলকে, তেমনি মানুষের মন ও বুদ্ধির শক্তি তা'কে পশুত্বের ওপরের পর্যায় মনুষ্যত্বের দিকে নিয়ে গেছে। আত্মবোধ ও বিচারশক্তি হয়েছে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, আঁধার থেকে আলোকের দিকে মানুষের জয়যাত্রার পথে প্রধান পাথেয়।

ইতরজীবজন্তু যেন প্রবৃত্তির হাতের পুতুল। তারা প্রবৃত্তির আবেগ দ্বারা চালিত হ'য়ে সর্বদা প্রবৃত্তিকে সার্থক করার সহজ পথটি অনুসরণ করে কিন্তু মানুষ তা করে না। মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, সামনেই খাদ্যপানীয় আছে, তা গ্রহণ করতে কোন প্রতিবন্ধক নাই—এমন ক্ষেত্রেও সে তা স্পর্শ না ক'রে কষ্ট সহ্য করতে পারে; নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মানুষ নির্ভয়ে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে পারে; কামনাবাসনা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে উদাসীন নির্বিকার থাকতে পারে—এক কথায়, সহজ পথ ছেড়ে দিয়ে মানুষ বেছে নিয়েছে কঠিন দুর্গম পথ; মনুষ্যত্বের উচ্চশিখরে আরোহণ করতে তা'কে স্বার্থত্যাগ, আত্মসংযম ও দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। কিভাবে, কিসের প্রভাবে মানুষ আত্মসংযম করতে শেখে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয় তা অনুসন্ধান করলে মানুষের সভ্যজীবন-গঠনের মূল সূত্রটি বুঝতে পারা যাবে।

মানুষের জীবন গ'ড়ে ওঠার মধ্যে দুইটি শক্তির ক্রিয়া চলেছে—তা'র মজ্জাগত প্রবৃত্তি আর বাইরের পরিবেশ। তা'র জীবনের মূল উপাদান বিকশিত হ'বার সময় তার আত্মীয়স্বজন, সঙ্গীসাথী ও সমাজের প্রভাবে তা ক্রমে মানুষের মনে আত্মবোধরূপে শুভ্রসুন্দর ভাব জাগিয়ে তোলে। শিশুকাল থেকে পরিণত বয়সের দিকে এগিয়ে যাবার পথে আত্মবোধ বিকাশের চারিটি সুস্পষ্ট পর্যায় দেখতে পাওয়া যায়; এই বিভিন্ন পর্যায়ে

যে-প্রেরণা মানুষের আচরণ উদ্বুদ্ধ করে তাতেও পার্থক্য সুস্পষ্ট; যেমন—

(১) শৈশবে—আত্মবোধশক্তি জাগরিত হয় না; প্রবৃত্তির তাগিদে শিশু দেহমনের সামর্থ্য অনুযায়ী আচরণ করে।

(২) বাল্যেও কৈশোরে—কিশোর বালক ভাল-মন্দ বুঝতে পারে, অপরের সংস্পর্শে এসে আত্মসচেতন হ'য়ে ওঠে, শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে, পুরস্কার লাভের বাসনায় ভাল কাজে উৎসাহিত হয়।

(৩) যৌবনে—মানুষ সমাজে ও দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জনের বাসনায় কার্যে উৎসাহিত হয়।

(৪) পরিণত নীতিবোধের কালে—পুরস্কার, লাভক্ষতি, সুনাম দুর্নাম এ সবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে বিবেকবান ব্যক্তি বিচারবুদ্ধিতে যা শ্রেয় মনে করেন, তাই অনুসরণ করেন।

শিশুকাল অর্থাৎ জন্ম থেকে বছরতিনেক পর্যন্ত মানুষের আচ্ছন্ন আত্মবোধের কাল। আত্ম-সম্বন্ধে ধারণা অতি ধীরে গ'ড়ে উঠতে থাকে তার ইন্দ্রিয়ের মারফৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর দিয়ে।

প্রথম পর্যায়

প্রথমে শিশুর হাত-পাও যেন তার নিজস্ব নয়, সেগুলির নড়াচড়া দেখে শিশু নিজেই যেন অবাক হয়; কোন অঙ্গে ব্যথা পেলে, যেমন আগুনের আঁচ লাগলে, কাঁটা ফুটলে, কীটপতঙ্গ হুল ফুটিয়ে দিলে তখন সে অনুভব করে প্রত্যঙ্গটি তারই। তার নিজস্ব সত্তা ছাড়া বাইরে যে বস্তুজগৎ রয়েছে তার সম্বন্ধে ক্রমে তার ধারণা জন্মে। যা নড়াচড়া করে, শব্দ করে, রঙিন ব'লে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার প্রতিই শিশু বেশী কৌতূহল দেখায়। সে যা করতে চায়, যা পেতে চায় সব সময় পায় না; অথচ দেখতে পায় অন্যে তা করতে পারে; নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে অল্প অল্প ক'রে ধারণা করতে শেখে। সজীব প্রাণী ও নিজ৷ব বস্তুর মধ্যে পার্থক্য প্রথমে সে অনুভব করতে পারে না। তার মনে হয় জীবজন্তু, গাছপালা, আসবাবপত্র যা কিছু সে দেখতে পায় সবারই অনুভব করার ক্ষমতা আছে তারই মত। সে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের হর্ষক্রোধের প্রকাশ কতকটা বুঝতে পারে; নিজেও সে তা অনুকরণ করতে চায়। বাবা, মা, বড় ভাইবোন বা শিক্ষক সেজে সে ছোট চেয়ার, টুল, কুকুর বিড়ালের বাচ্চা বা অন্য ছোট শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার অভিনয় করে,

নিজের কথা নিজেই শোনে, মনে মনে বয়স্কব্যক্তি সেজে অপরের কাছ থেকে শেখা ভাবগুলি অন্যের ওপর প্রয়োগ করে। এইভাবে সে অন্যের মনের ভাব নিজের মন দিয়ে যাচাই ক'রে দেখে এবং আচরণ অনুকরণ ক'রে তার ভিতর দিয়ে মনের ভাবাবেগ প্রকাশ ক'রে থাকে ; যেমন, বয়স্কদের দেখাদেখি সে স্নেহপ্রীতি সোহাগ দেখায় তার প্রিয় বস্তুর ওপর, আবার কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে তার কাল্পনিক অবাধ্য 'ছাত্র' বা 'ছেলের' ওপর। শিশুর এই বয়স বাস্তব ও কল্পনামিশানো আলোছায়াময় কাল ; সম্ভব অসম্ভবের মাঝখানে কোন শক্ত সীমারেখা থাকে না তার মনে। নিজের শক্তির অল্পতা সম্বন্ধে সে যেমন ক্রমে সচেতন হ'য়ে ওঠে, তেমনি বয়স্কদের শক্তির সীমা সম্বন্ধেও তার ভুল ধারণা থেকে যায় ; সে ভাবে বয়স্করা সবই করতে পারে। শিশুর আত্মবোধ সবে মুকুলিত হ'য়ে উঠতে সুরু করেছে।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

শৈশব পার হ'য়ে মানবসন্তান বাল্যে উপনীত হয় ; এ সময়ে তার জানাশোনার পরিধি কিছুটা বেড়েছে, বয়স্কদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা, ভৎর্সনা, উৎসাহ, কৃতজ্ঞতা সে বুঝতে পারে ; তাদের হর্ষপ্রকাশ বুঝে সেও আনন্দ প্রকাশ করে, তাদের অসন্তোষ বা ক্রোধ দেখে সংকুচিত হয় ; কোন্ কাজ করলে তার আপনজন খুশী হবে, কোন্ কাজ করলে অসন্তুষ্ট হবে তা সে বুঝতে পারে। তার প্রিয়জনকে খুশী করার বাসনা জাগে তার মনে। অন্যায় করলে শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে সে ভয়ও ক্রমে মনে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়।

বালকের আত্মবোধ বিকাশে তার মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রভাব খুব বেশী। এই কালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গঠনকাল ; কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ, কোন্ কাজ করা উচিত, কোন্ কাজ অনুচিত এ বোধ গ'ড়ে ওঠে পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রতিদিনকার আচরণের ভিতর দিয়ে। বয়স্করা যেরূপ আচরণ করে এবং যা পছন্দ করে বালকেরা তাতেই ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কোমল জিনিসকে চাপ দিয়ে যেমন ইচ্ছামত যে-কোন আকার দেওয়া যায়, বালকের মানসিক গঠন তেমনি পরিবেশের চাপে নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে থাকে। তার সম্বন্ধে অপরের, বিশেষ করে তার গুরুজনদের মনোভাব কি তা সে বুঝতে পারে এবং সেই ভাব প্রতিফলিত হ'য়ে তার মনের ওপর ক্রিয়া করতে থাকে ; এর ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই তার জীবনে পরিবর্তনের সূত্রপাত

হয়। কোন বালককে যদি ক্রমাগত দুষ্ট, বকাটে, অপদার্থ ইত্যাদি নিরুৎসাহজনক বিশেষণে ভূষিত করা হয় এবং অবজ্ঞা উপেক্ষার ভাব দেখানো হয় তবে ক্রমে সে সেইরূপই হয়ে ওঠে। আবার কোন বালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তার সদ্‌গুণ বিকাশে যদি উৎসাহ দেওয়া যায়, সে যদি বুঝতে পারে তার মধ্যে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তার কল্যাণ হলে তার প্রিয়জন আনন্দিত হবে তখন প্রিয়জনের প্রীতির আলোকে তার আত্মবোধ দীপ্ত হয়ে ওঠে; সে ভাল হতে চেষ্টা করে এবং হয়ও। দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা যায় অপরের ভাব-প্রতিফলনের যুগ; অপরের নিন্দা প্রশংসা, অবজ্ঞা উৎসাহ বালক-কিশোরের মনের কাঠামো গ'ড়ে তোলে ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বালক-কিশোরের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ শাস্তির ভয় ও পুরস্কারের উদ্দীপনা দ্বারা। মানবসমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তখনও তারা এসে পৌঁছায়নি; পরিবার ও পরিচিত পরিবেশের ছোট গণ্ডীর মধ্যে তারা ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়, কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে যে ধারণা গঠন করেছে তাই নিয়ে ক্রমে বৃহত্তর পরিবেশে প্রবেশ করে। এখানে তারা দেখে মানুষের শক্তির বিচিত্রতা, বিভিন্নরূপ আদর্শের সমাবেশ। এই তৃতীয় পর্যায় হল মানুষের কর্মযজ্ঞশালা। পরিবারের গণ্ডীতে সে ন্যায় অন্যায়ের যে মাপকাঠি গ'ড়ে তুলেছে নিজের মনে তা দিয়ে সে বৃহত্তর সমাজের নীতি ও ব্যবস্থাকে পরখ ক'রে দেখে। তার বাল্যে-লাভ-করা ধারণা যখন আর-দশজনের কাছ থেকে সমর্থন পায় তখন সেগুলি তার মনে স্থায়ী হয়ে যায়। যখন সে দেখতে পায়, বাল্যে সে যা একান্ত ন্যায় এবং করণীয় ব'লে শিখেছিল অনেকে তা ন্যায় ব'লে মনে করে না বা সে সম্বন্ধে বিপরীত যুক্তি প্রদর্শন করে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তার পূর্বের ধারণা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। বয়স্কব্যক্তি বহুজনের সংস্পর্শে আসে, অনেক বিষয় শেখে, নূতন নূতন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই-ভাবে তার চিন্তায় স্বাধীনতা আসে সত্য, কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রভাবের উর্ধ্বে সে উঠতে পারে না।

তৃতীয় পর্যায়

শৈশবে শিশুর ছোট্ট পরিবেশ তার মা, একান্ত কাছের আপনজন আর চারপাশের বস্তুপুঞ্জ নিয়ে; বাল্যে ও কৈশোরে তার পরিবেশ বিস্তৃত হয়েছে পরিজনের মধ্যে, সহপাঠী ও খেলার সাথীদের সঙ্গলাভে; বয়স্কজীবনে

পরিবেশ বিস্তৃত হয়েছে আরো অনেকখানি। শিশু ও বালক অন্যের কাছ থেকে শাস্তি পেয়ে, প্রতিবন্ধক পেয়ে নিজের শক্তি সম্বন্ধে কতকটা সচেতন হয়েছে ; নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে দৈহিক শাস্তি ভোগ করার ফলে এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছে ; প্রতিযোগিতায় বা কোন কাজে অকৃতকার্য হ'য়ে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখেছে ; খেয়ালের বশে হঠাৎ কোন কাজ না ক'রে পূর্বেই তার ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখেছে। মানুষ বালক ও কিশোর অবস্থায় যে শাস্তির ভয় ও ভালকাজের জন্য পুরস্কার প্রশংসার আনন্দময় স্বাদ অনুভব করে, বয়স্ককালেও তা তার মজ্জায় মিশে থাকে। তাই লোকের নিন্দাভাজন হওয়ার ভয়ে সে প্রবৃত্তির অশোভন আবেগ জোর ক'রে দমন ক'রে রাখে, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের কামনায় স্বার্থত্যাগে ও কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ হয় না।

নিন্দা ও জনমত

যে আত্মবোধ শৈশবকাল থেকে দানা বেঁধে উঠতে থাকে মানুষের পূর্ণবয়সকালে তা পরিণত হয় আত্মমর্যাদাবোধে। এই মর্যাদাবোধ মানুষকে শোভনসুন্দর মহিমান্বিত জীবন গ'ড়ে তুলতে প্রেরণা দেয়, অন্তরে নিত্য জাগরূক থেকে প্রতিদিনকার আচরণে হীনতার কলুষ থেকে তাকে রক্ষা করে। কোনরূপ দৈহিক শাস্তি পাওয়ার আশংকা না থাকলেও অন্যলোকের প্রশংসা অর্জন করলে খুশী হয়। আত্মশ্রদ্ধা ও সমাজের অপরের প্রতি সমীহভাব মানুষের সভ্যসমাজ ব্যবস্থা ধারণ ক'রে রেখেছে। লোকনিন্দা নীরবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে ; এ যেন মানুষ সমাজে-প্রচলিত নিয়মকানুন ভঙ্গ ক'রে নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজ করে কিনা তা লক্ষ্য রাখবার সদাজাগ্রত 'পুলিস ফোর্স্'। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এজন্য মানুষ অন্তরে ইচ্ছা থাকলেও অনেক কাজ থেকে বিরত থাকে কেননা রুচিশীল সভ্যমানুষ আত্মসম্মানকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে ঘিরে রাখে ; লজ্জা ও অপমান তার কাছে নিদারুণ কষ্টদায়ক।

আত্মমর্যাদাবোধ সব মানুষের সমান মাত্রায় থাকে না ; কেউ এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন, কেউ বা স্থূলচর্ম, নিন্দা অপমানের লজ্জা অপেক্ষা নিজের স্বার্থকেই বড় মনে করে। আত্মমর্যাদাবোধের সঙ্গে কিছুটা মৃদু প্রচ্ছন্ন অহংকার মেশানো থাকে। এ অহংকার উগ্র হ'য়ে

অন্যকে আঘাত করে না, সভ্য মানুষের জীবনের এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যা নীতিবিরুদ্ধ মনে করি তা কখনই আচরণ করি না, অন্যায় উপায়ে স্বার্থসিদ্ধ করার সর্বপ্রকার সুযোগ থাকলেও হেলায় তা তুচ্ছ জ্ঞান, করি, অপরে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমার ওপর তা কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হ'তে দিই না, শির দেব তবু সম্মান দেব না—এই ধরণের যে মনোভাব তার মধ্যে অহংকার আছে, বিনয়মিশ্রিত আত্মশ্লাঘা আছে। দেহমধ্যস্থ অস্থি যেমন দেহকে করে দৃঢ়, সুঠাম ও উন্নত, আত্মমর্যাদাবোধও তেমনি মানুষের আচরণে আনে রুচিশুভ্র দৃঢ়তা ও অহংবোধের শোভন প্রকাশ।

চতুর্থ পর্যায়

জগতে অধিকাংশ লোক আত্মবোধের তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেই তাদের জীবন শেষ করে, আর অতি অল্পসংখ্যক লোক মনের ক্রমোন্নতি সাধন করতে করতে এমন এক অবস্থায় এসে উপনীত হন যখন নিন্দা স্তুতি, লাভ ক্ষতি, খ্যাতি অখ্যাতি তাঁদের আর বিচলিত করতে পারে না। অন্য লোকে তাঁদের সম্বন্ধে কি বলবে বা ভাববে তা চিন্তা না ক'রে তাঁরা অন্তরের অনুশাসন অনুসরণ করেন। আত্মবোধের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁরা আরোহণ করেছেন ; পার্থির জগতের সাধারণ মানুষের কামনা বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ভাবনার আলোড়ন তাঁদের মনের শান্তি নষ্ট করতে পারে না। গীতায় এরূপ লোককে বলা হয়েছে যোগী, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ অবিচল।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

অর্থাৎ যিনি নিজের মন জয় করেছেন ও যিনি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়েছেন তাঁর আত্মা শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে এক রকম থাকে। তিনি, পার্থিব জগতের সাধারণ মানুষের কামনাবাসনার বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন, ধরার ধূলির ঊর্ধ্বে তিনি আরোহণ করেছেন চিন্ময় জগতে। মনের শক্তির ক্রমবিকাশ অনুসরণ ক'রে এ ধরণের মানুষ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেন যখন স্থূল দেহ এবং প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ তাঁর দেহমনকে বিচলিত করতে পারেনা, সকলকে উপলব্ধি ক'রে জয় ক'রে তিনি হয়েছেন শান্ত সমাহিত।

আত্মবোধ কিভাবে প্রসার লাভ করে এবং নিম্নস্তর থেকে ক্রমশঃ উচ্চস্তরে উঠতে থাকে তা আমাদের জীবনের বাল্য-কৈশোরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারি। বাল্যে শিশুর জানাশোনার পরিধি সংকীর্ণ, জীবনে

কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়, কোন্ জিনিসের যথার্থ কি মূল্য তা সে জানে না। পাখীর রঙিন পালক, রঙিন কাচের টুকরা, এক পয়সা দামের ভেপু বাঁশি, মাটির খেলনা, কাগজের ফুল, টিনের ছুরি— এগুলিই তার কাছে মহামূল্যবান। সে ভাবে, সে যখন বাবার মত বড় হবে তখন খেলনা কিনে ঘর ভ'রে ফেল্‌বে।

বালক কৈশোরে এসে পৌছে; তার কামনার জিনিসে দেখা দেয় পরিবর্তন। মাটির খেলনা, পাখীর পালক আর তার মন ভুলায় না। সে চায় ছোট আকারের সাইকেল, মোটরগাড়ি, চায় এয়ারগান, ছোট বন্দুক; অজানার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়, কামনা করে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বাহবা, আত্মীয় স্বজনের প্রশংসা; হতে চায় শিল্পী, সাহিত্যিক, যান্ত্রিক, আবিষ্কারক; কিশোর প্রাণশক্তিতে চঞ্চল।

কিশোর উপনীত হয় যৌবনে। এয়ারগান আর অল্প কিছু নিয়ে হৈচৈ আর পছন্দ হয় না। প্রতিষ্ঠা, যশঃ, প্রতিপত্তি এ সব নেশার মত পেয়ে বসে। বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মধ্যে সে পায় আনন্দ; যদিও তার সঙ্গে দুঃখবোধ মেশান থাকে তবু সংসারী মানুষ 'লাভক্ষতি টানাটানি,' 'কলহ সংশয়' ঝেড়ে ফেলতে পারে না। পরমহংসদেব বলতেন, শুক্‌না হাড় চিবানোর সময় কুকুরের গাল কেটে রক্ত ঝরে, তবু সে তা ফেলে দেয় না, ভাবে ও রক্ত বুঝি ঐ শুকনা অস্থি থেকেই নির্গত অমৃতরস। মায়ায় বদ্ধ সংসারী মানুষেরও সেই দশা। অহংবোধ সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বিস্তৃত হয় বৃহত্তর গণ্ডীতে; শুধু নিজের এবং নিজের পরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গেই সে নিজেকে জড়িত রাখে না, স্বজাতি-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি তাকে সংযুক্ত করে বৃহত্তর মানব সমাজের সুখদুঃখ হর্ষবেদনার আলোড়নের সঙ্গে। বাল্যের ক্ষুদ্র খেলাঘরের কোণ ছেড়ে সে গিয়ে দাঁড়ায় সংসারের 'আঘাত সংঘাত মাঝে।'

এদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক, 'কোটিকে গুটি' আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায় অনাসক্তির দিকে; এরা জাগতিক সম্পদে তৃপ্ত হয় না, অল্পে এদের সুখ নাই। 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্'। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের সুখের উপাদানে কত প্রভেদ! একজন বয়স্ক সংসারী ব্যক্তি শিশুর খেলার সামগ্রী পোড়ামাটির টুক্‌রা আর রঙির পুতির দানাকে যে ভাবে তুচ্ছ মনে করে, যোগী সাধকের স্তরে পেঁীছে মানুষ সাধারণ সংসারী

মানুষের কামনাবাসার সামগ্রীকে দেখে ঠিক সেই দৃষ্টিতে। পরমহংসদেব মাটি আর টাকা দুহাতে নিয়ে বিচার ক'রে দেখতেন দুইই এক আর ছুঁড়ে ফেলতেন গঙ্গার জলে। দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার এক দিগম্বর নাগা সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি পেলে তিনি খুশী হন ; তিনি হয়ত এক মহাদেশ দান করতে প্রস্তুত ছিলেন। সাধু শুধু উত্তরে বলেছিলেন, মহাবীর যেন একটু স'রে দাঁড়ান যাতে তাঁর গায়ে সূর্যের আলো এসে পড়তে পারে। এইটুকু পেলেই তিনি খুশী !

চরিত্র

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও আনুষঙ্গিক প্রক্ষোভ বা ভাবাবেগের কথা আমরা পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। প্রাণীমাত্রের জীবনেই প্রবৃত্তিগুলি সক্রিয় রয়েছে; এগুলি তাদের জীবনের প্রধান চালক, সকল প্রকার আচরণের শক্তিকেন্দ্র। প্রক্ষোভ মানুষের জীবনেও রয়েছে, তবে বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে সে এর প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার আচরণে এনেছে বৈচিত্র্য। মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছে কতক প্রবৃত্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে মনে বিভিন্নরূপে স্থায়ী রস বা সেন্টিমেণ্ট গ'ড়ে তুলে'। প্রীতি, ঘৃণা, লজ্জা, ঈর্ষা, অনুতাপ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মিশ্ররসের বিচিত্র প্রকাশ মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর জীবনে এমনভাবে ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করে না। মানুষের মনের আকাশে চলে নানা ভাবরসের মিশ্ররঙের আল্পনা। এর মধ্যে যে-মানুষের জীবনে যে-ভাবটি প্রধান, যে প্রবৃত্তি ও রসটি অন্য-গুলিকে ছাপিয়ে ওঠে, তারই রঙ অন্য ভাবকে করে রঞ্জিত, সেইটি প্রকাশের ভিতর দিয়ে পরিতৃপ্ত হবার সময় অন্য ভাব ও প্রবৃত্তির মোড় কতকটা ফিরিয়ে দেয়। এক কথায়, মানুষ ভাবরস-প্রধান জীব, বিভিন্ন রসের সমাবেশ তার জীবনের গতিপ্রকৃতি নিধারণ করে।

পশুপক্ষীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে প্রবৃত্তি, শ্রীঅরবিন্দের কথায় প্রাকাম্য; বিপুল এর শক্তি। এর প্রকাশ দেখা দেয় যে-দৈহিক প্রক্রিয়ায় তাকে বলি প্রক্ষোভ। মানুষের জীবনে প্রাকাম্য ও প্রক্ষোভ ছাড়াও রয়েছে নানা প্রবৃত্তি সঞ্জাত রস। এসবই জীবন ও আচরণের উপাদান। পশুর জীবনে রসের স্থান নাই, আচরণে নূতনত্বের বা মহত্বের বিকাশ নাই। মানুষ জীবনগঠনের এই উপাদানগুলি দিয়ে নিজের জীবনসৌধ গ'ড়ে তোলার শক্তি ও সুযোগ পেয়েছে। এটি মানুষের পরম লাভ।

চরিত্র বলতে কি বুঝি

ইটপাথর, কড়িবরগা, চূণসুরকি—এ সব গৃহনির্মাণের উপাদান কিন্তু এগুলি স্তূপাকার ক'রে রাখলেই ভবন নির্মিত হ'ল না; মালমশলা অনুযায়ী নক্সা ক'রে নিয়ে দিনে দিনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে অগ্রসর হ'য়ে পরিকল্পনা সার্থক ক'রে তুলতে হয়। মানুষের জীবন গ'ড়ে তোলার ব্যাপারেও এ কথাটি সমানভাবে খাটে। দেহমনের উপাদানগুলি ব্যবহার ক'রে মানুষ তার

জীবনকে একটি বিশিষ্ট রূপদান করে ; এ রূপ বাইরের দিকে ততখানি নয় যতখানি ভিতরের দিকে। মানুষের নিজহাতে গড়া এই জীবনায়নকে আমরা বলি চরিত্র। মানুষ চেষ্টা করুক বা না করুক তার জীবন একটি রূপ গ্রহণ করেই ; তাই আমরা কত বিভিন্ন চরিত্রের লোক দেখতে পাই—কোনটি দুর্বল কোনটি সবল, কোনটি অসম্পূর্ণ কোনটি উদাসীন, কোনটি কোমল কোনটি দৃঢ়, কোনটি হীন নিষ্প্রভ, কোনটি মনুষ্যত্বের গরিমায় দৃপ্ত। গাছ যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় আপনা আপনি ফুলেফলে বিকশিত হ'য়ে ওঠে মানুষ তেমনিভাবে আপনা আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় না। উন্নত চরিত্র গ'ড়ে তুলতে মানুষকে দীর্ঘ দিন ধ'রে সাধনা করতে হয়। এতেই মানুষের গৌরব ; তার জীবন সুন্দর ক'রে, মহান ক'রে রচনা করবার অনেকখানি অধিকার তাকে দিয়েছেন ভাগ্যবিধাতা। চরিত্র গঠন এই জীবনরচনারই পদ্ধতি।

আমাদের সমাজে চরিত্র শব্দটি সাধারণতঃ যৌনজীবন সংক্রান্ত বিশেষ আচরণের সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু যৌনজীবনই মানুষের জীবনের সবখানি নয় ; তাই সর্বাঙ্গীণ জীবনবিকাশের বৃহত্তর এবং পূর্ণতর অর্থে আমরা এখানে চরিত্র কথাটি প্রয়োগ করছি।

কিভাবে চরিত্র গ'ড়ে ওঠে

জীবনের কতকগুলি মৌলিক উপাদান নিয়ে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয়। শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন জীবনের এই সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে যাবার কালে প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি ও পরিবেশের প্রভাব অনুসারে এক বিশিষ্ট মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করে। চরিত্রগঠনের কাল হিসাবে শৈশব ও বাল্যজীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানবশিশু নিজের অজানিতে, পরিজনদের চোখের সামনে কিন্তু মনের অগোচরে কিভাবে ধীরে ধীরে তার মনের কাঠামো গ'ড়ে তোলে তা লক্ষ্য করলে কৌতূহলী পিতামাতা আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করতে পারবেন।

শৈশবে

যেদিন শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল সেদিন থেকেই তার চরিত্রগঠন সুরু হল। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও সত্য। শিশুর প্রথম সম্বন্ধ তার মাতৃস্তনের সঙ্গে ; মাকে তখন সে চেনেনি, কেবল ক্ষুধার তৃপ্তি স্তন্যরসধারার সন্ধান

পেয়েছে। প্রথম প্রথম ক্ষুধা লাগলে বা অন্য কোন কারণে অস্বস্তি বোধ হ'লে সে কাঁদে। প্রথমে শিশুর ক্রন্দন তার অসুবিধা দূর করার আবেদন। পরে সে যখন বুঝতে পারে কাঁদলেই সুবিধা পাওয়া যায় তখন অনেক সময় প্রকৃত প্রয়োজন না থাকলেও সে কাঁদে, আবদার করে, অতিরিক্ত কিছু পেতে চায়। তার মনের গড়ন সুরু হয়েছে। সন্তানের সব রকম আবদার রাখলে, তার সামান্য চিৎকারে ব্যস্ত হ'য়ে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছু দিলে এবং এইভাবে তার সকল ইচ্ছাই পূরণ করার ব্যবস্থা করলে শিশু ক্রমে জেদী, অসহিষ্ণু ও অত্যাচারী হ'য়ে ওঠে। কোন বাসনা মিটাতে গিয়ে বাধা না পেলে ক্রমে তার দাবীর মাত্রা বেড়ে যায়; এমন স্বভাবের ভিত্তিপত্তন হয় যার ফলে বয়স্ক জীবনে তার দুর্ভোগ অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, কেননা মানুষের সকল রকম কামনা-বাসনা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হ'তে পারে না। সমাজে দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে গেলে নিজের অনেকটা স্বার্থত্যাগ করতে হবেই। কিন্তু যে-শিশু কেবল ভোগ করতে শিখেছে, কেবল নিজের সুখ ষোল-আনায় আদায় করতে অভ্যাস করেছে নিজের পরিবারের গণ্ডীর ভিতরে, সে বৃহত্তর সমাজে রূঢ় আঘাত পাবেই। সেখানে তার আবদার মেটাবে কে? কাজেই শিশুর প্রতি অত্যধিক আদর দেখাতে গিয়ে আমরা অনেক সময় তার জীবনে ভাবী দুঃখের বীজ বপন ক'রে রাখি। সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর প্রদর্শন যেমন অন্যায়, তেমনি তাকে আত্মসংযম ও অপরের প্রতি বিবেচনা করার সুশিক্ষা না দিয়ে দুর্বিনীত এবং স্বার্থপর ক'রে তোলাও শিশুর পক্ষেই ক্ষতিকর। বুদ্ধিমতী জননীকে স্নেহ এবং উপেক্ষা, আদর ও শাসনের মধ্যে কল্যাণকর মাত্রা বজায় রেখে আচরণ করতে হয়। সন্তান-পালনে মায়ের দায়িত্ব তাই কোমল ও কঠোরের মিশ্রণে পূর্ণ। সদ্-জননীর পক্ষে শিশুর জীবন বিকাশ ও চরিত্রগঠনের পদ্ধতিটি ভাল ক'রে জানা একান্ত আবশ্যক।

মানবশিশু শৈশবে যে আচরণে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছে বাল্যেও তাই কিছুটা ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সুরু করে। তখন কেবল জননী নয়, তাকে পরিবারের আরও অনেকের সংস্পর্শে আসতে হয়। বাবা, ছোটভাই, বড়ভাই, বোন—এ ছাড়া খেলার সাথীও আছে। এদের সঙ্গে মিশে,' এদের আচরণ দেখে, এদের কাছ থেকে

বাল্যকালে

যেরূপ ব্যবহার লাভ করে তার ভিতর দিয়ে বালক মানসিক গঠনের দিকে অনেকটা এগিয়ে যায়। বালকের অনুভব ক্ষমতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বেড়েছে, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তা বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারে, অন্যের আচরণ দেখে' অনুকরণ করার কামনা জাগে তার মনে, প্রশংসায় খুশী হয়, নিন্দায় বিষণ্ণ হয়। তখন তার মন ক্রমে বিস্তার লাভ করছে। এ বয়সে বালক উপদেশ অনুসরণ করতে ততটা পটু নয় যতটা পটু কোন কিছু দেখে' তা অনুকরণ করতে। বালক তার পরিবেশ থেকে এবং তার সাথী ও পরিজনদের আচরণ থেকে ভাবধারা গ্রহণ করতে থাকে। এই পর্যায়ে তাই উন্নত চরিত্রগঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা চালু রাখা বড়ই কঠিন ; বালক পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে মিশতে শিখেছে ; তার সঙ্গীসাথীর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা তার অভিভাবকের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর হয় না।

বালক সাধারণতঃ স্বার্থপর। তাকে উদারতা শেখানোর দায়িত্ব পরিজনদের। একই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে সেদিকে পিতা-মাতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বালক নিজের বাড়িতে যেরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয়, অন্য পরিবারের বালকদের সঙ্গে ব্যবহারে তার প্রভাব পড়ে। বালকবালিকার পোষাক পরিচ্ছদ যাতে বিনয় ও মার্জিতরুচি-প্রকাশক হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। দামী এবং জাঁকজমকশালী পরিচ্ছদ বালককে গর্বিত করে, মলিন বেশ মনে জাগায় আত্মদীনতা। এর কোনটিই স্বাভাবিক আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।

শৈশবের শিক্ষায় কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে বাল্যে তা সংশোধন ক'রে নেওয়া চলে তবে এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ, অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি এবং সস্নেহ শাসন আবশ্যক। চাণক্য বলেছেন ঃ

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত লালন পালন করা দরকার, দশ বৎসর শিক্ষা দিতে হবে প্রয়োজনমত প্রহারের ভিতর দিয়ে, ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করলে পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মত আচরণ করতে হবে। এই নীতি থেকে একটি কথা বোঝা যায় যে, ক্রমবৃদ্ধির পথে মানুষের চরিত্রগঠনের যে বিভিন্ন পর্যায় আছে

এবং প্রত্যেক পর্যায়ে তার মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রেখে যে বিভিন্নরূপ আচরণ করা প্রয়োজন লোকচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিত যথার্থভাবেই তার বিধান দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগের মনোবিজ্ঞানী লালন অর্থে কেবল আদরআপ্যায়ন আর তাড়না বলতে কীল-চড়-বেতের প্রয়োগ শিশু ও বালকের পক্ষে কল্যাণকর ব'লে মেনে নেননি। আদরের সঙ্গে দৃঢ়তা ও শাসনের সঙ্গে সহানুভূতি উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত না থাকলে শিশুর চরিত্রগঠনে বিকৃতি দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে অত্যধিক আদরের হয়; স্বার্থত্যাগ করার অভ্যাস প্রায়ই তাদের গ'ড়ে ওঠে না; জেদী ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়ায় বয়স্কজীবনে অন্যের সঙ্গে মিল রেখে চলতে এরূপ ছেলেদের অনেককেই বেগ পেতে হয়। পরিবারে একাধিক ছেলেমেয়ে থাকা শিশুর আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূল। তারা বয়স্ক ব্যক্তিদের আচরণ থেকে শিক্ষালাভ করে, তেমনি বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারের ভিতর দিয়ে।

বাল্যকালে মানুষের চরিত্র কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে না কিন্তু এ সময়ে যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তার ওপরই গ'ড়ে ওঠে তার পরবর্তী জীবন। এ বয়সকে বলা চলে ভাবসংগ্রহ ও প্রস্তুতির যুগ। বালক বৃহত্তর মানবসমাজে নিজে যে অংশ গ্রহণ করবে তার শিক্ষানবিশি করছে নিজের পরিবারে। এক একটি গৃহ বা পরিবার মানবসমাজেরই ক্ষুদ্র অংশ; ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা, সহানুভূতি, সুরুচি, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, বিনয়, আত্মমর্যাদাবোধ প্রভৃতি মানসিক গুণ যা মানুষের জীবন মহনীয় ও সমৃদ্ধ ক'রে তোলে তার সঙ্গে বালক যাতে নিজের পরিবারের মধ্যেই পরিচিত হ'তে পারে এমন স্বাভাবিক পরিবেশ থাকলে বালক যে 'অমানুষ' হ'য়ে গ'ড়ে উঠবে না সে সম্বন্ধে কতকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। গৃহ মানুষের চরিত্রগঠন-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়।

কৈশোরে

বাল্যের জীবনধারা কৈশোরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে পূর্ণতার দিকে। বালক এখন আর বালক নয়, বয়স্ক মানবও নয়; বালকের চপলতা ও উদ্দামতা এবং বয়স্কের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য মিশেছে তার আচরণে। মানুষের এই বয়ঃসন্ধিক্ষণ যেন নদী ও সাগরের সংযোগস্থল; কৈশোরের শেষ দিকে বয়স্ক-জীবন যাপনের জন্য সে দেহে-মনে বুদ্ধিতে আচরণে অনেকখানি প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে।

বাল্যে ও কৈশোরে মানুষের চরিত্রগঠনে সবগুলি মানসিক গুণের সমানভাবে বিকাশ বাস্তবজীবনে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আমাদের মতে উন্নত চরিত্রের মূলভিত্তি হল প্রধান চারিটি গুণ—আত্মমর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সুরুচি, বিনয়। সন্তানের যাঁরা মঙ্গলকামনা করেন বালকবালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের প্রতিদিনকার আচরণের ভিতর এগুলি যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে সে বিষয়ে তাঁদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কিভাবে একাজ সম্ভব তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

আত্মমর্যাদাবোধ

এটি হ'ল উন্নত চরিত্রের প্রধান স্তম্ভ। সভ্য মানুষের জীবন আত্মমর্যাদাবোধকে কেন্দ্র ক'রেই শোভন সুন্দর রূপ লাভ করেছে; এ বোধের অভাব ঘটলে অথবা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত না হলে মানুষ সম্মান, প্রতিষ্ঠা আত্মোন্নতি এক কথায় মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না। বালক প্রশংসা পেলে খুশী হয়, তিরস্কার ও অবহেলা পেলে বিষণ্ণ হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। এই মানসিক ভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে পিতামাতা ও শিক্ষককে। ভাল কাজে উৎসাহ দিয়ে, প্রশংসা ক'রে তার মনে উন্নতির কামনা সবল ক'রে রাখতে হবে; যে-ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়, তা থেকে বিরত রাখবার জন্য তার প্রতি অনুৎসাহ দেখাতে হবে। বালক-কিশোরের প্রতি বিশ্বাস তাদের মনে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার প্রকৃষ্ট উপায়।

সন্তানের মনে এই বোধ পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগিয়ে তুলতে হ'লে পিতামাতাকে হ'তে হবে ন্যায়নিষ্ঠ, উদার এবং সহানুভূতিশীল। তাঁদের আচরণ থেকে ছেলেমেয়েরা শিখবে: সব রকম অসুবিধা, সব রকম ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী আছি কিন্তু অন্যায়ভাবে বা অপরকে ঠকিয়ে কোন লাভই কামনা করি না।

মানুষের জীবনে সুখের সূর্যকিরণ চিরদিনই ঝলমল ক'রে আনন্দ দেয় না, দুঃখের অন্ধকার নিশা আসে ব্যথা নিরাশা বহন ক'রে। কিশোরকে দুঃখের বেগ ধারণ করতে হবে নির্ভীক চিত্তে। সে যেন অন্তর থেকে বলতে পারে: ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অটল রব।

আর্থিক অসচ্ছলতা কিশোরের কাছে, শুধু কিশোর কেন সকলের কাছেই

অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক। কিন্তু সৎভাবে জীবন যাপন করার এবং নিজের অবস্থা—তা যেমনি হোক—উন্নতমস্তকে বহন করায় হীনতা নাই, আত্মমর্যাদার গৌরব আছে। কিশোর যেন রবীন্দ্রনাথের দৃপ্ত কথাগুলি নিজস্ব ক'রে নিতে পারে :

সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ॥

আত্মমর্যাদাবোধ অতিরিক্ত উগ্র হ'য়ে উঠলে মানুষ হয় অসামাজিক ও অহংকারী। জ্ঞানের অল্পতা থেকে অহংকারের উৎপত্তি ; কিশোর যদি শোনে সে যে-গুণ, যোগ্যতা বা অবস্থার বড়াই করে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী মানসিক ও জাগতিক সম্পদ অনেকের রয়েছে তখন তার অহমিকা বেড়ে উঠার উৎসাহ পাবে না।

নিষ্ঠা

চরিত্রে এগুণ ছাড়া কোন মানুষের জীবন উন্নত ও সফল হ'তে পারে না। বাল্যকাল থেকে এগুণের অভ্যাস করা আবশ্যক। বালক কিশোর যে-কোন কাজই করুক তা যেন সে যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে সম্পূর্ণ করতে অভ্যাস করে, কোন প্রকারে হেলাফেলা ক'রে কাজ করার অভ্যাস করলে তা তার আত্মোন্নতির পথে সর্বপ্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। কিশোর যে কাজটুকু করবে তা নিখুঁত ক'রে করুক, যেটুকু শিখবে তা ভাল ক'রে শিখুক—এই মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলতে হবে। তা করতে গেলেই অধ্যবসায়, ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন হবে। এগুণগুলি উন্নত চরিত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। নিগ্রো বালক বুকার টি ওয়াশিংটনের আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না ; কালো আদমীকে বিদ্যানিকেতনে ঢুকতে দেওয়া হত না কিন্তু বালকের অসীম আগ্রহ ছিল বিদ্যা অর্জন করার। একদিন এক বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি তাঁর মনোবাসনা জানালেন ; তাঁকে একটি কক্ষ পরিষ্কার করতে অনুমতি দেওয়া হ'ল। বালকটি সেই বিদ্যালয়ের কক্ষ এমন যত্নের সঙ্গে এমন নিখুতভাবে ঝেড়ে মেজে পরিষ্কার

ঝকঝকে ক'রে রাখলেন যে, শিক্ষকগণ তা দেখে বালকের নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে বই নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে অনুমতি দিলেন। এই নিষ্ঠার পরিচয় না দিলে নিগ্রো বালকের আকাঙ্ক্ষা কোনদিনই সফল হবার সুযোগ পেত না।

সুরুচি

সাধারণ মানুষের জীবনে এ জিনিসটির বড়ই অভাব দেখা যায়। এগুণ ব্যতীত কোন চরিত্র আকর্ষণীয় হয় না ; ফুলের সৌন্দর্যের মত সুরুচি মানুষের চরিত্রকে সুষমামণ্ডিত করে। বাল্যকাল থেকেই মনে এবং আচরণে সুরুচির অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হয়। বালক কিশোর তাদের নিজেদের ব্যবহারের জিনিস বইখাতাপত্র, জামাকাপড়, জুতা মোজা পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রাখতে অভ্যাস করলে, নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যত্ন নিতে শিখলে, দেহের শুচিতা রক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলে সুরুচি-শিক্ষার ভিত্তি পত্তন হয়েছে বলা চলে। কিশোরের আচরণে সুরুচি দৃঢ়মূল হ'য়ে গেলে তার সুফল দেখা দেবে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পোষাক-পরিচ্ছদে, ব্যবহারে, কথায় এবং চিন্তাধারায় পড়বে সুরুচির ছাপ। সুরুচিশীল মানুষ অন্যের ওপর আনন্দদায়ক প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে।

বিনয়

এ মানসিক ও আচরণগত গুণটি মানব চরিত্রের ভূষণ। সকল রকম যোগ্যতাসম্পন্ন হ'লেও অবিনয়ী ব্যক্তি লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না, কারণ নম্রতার অভাবে তার আচরণ অপরের কাছে প্রীতিপ্রদ হয় না।

কিশোরের জীবনে বিনয় প্রকাশ অভ্যাস করানো দরকার। তখন এর অর্থ ও উপযোগিতা বুঝবার মত মানসিক শক্তির স্ফুরণ তার হয়েছে। অল্পবয়স্ক বালক স্বভাবধর্মবশতঃ আচরণে বিনয় প্রকাশ করতে পারে না, তার জীবনে তখন আত্মজাহির করার প্রবৃত্তি প্রবল। বুদ্ধিদ্বারা একে মার্জিত ক'রে নিয়ে বিনয় মিশ্রিত আত্মমর্যাদাবোধের ভিতর দিয়ে সে প্রবৃত্তির প্রকাশ করতে তখনও শেখেনি। কৈশোর বিনয়-শিক্ষার উপযুক্ত কাল।

আত্মবিশ্লেষণ

যে-কয়টি সদভ্যাস গঠনের কথা আলোচনা করা হ'ল এগুলি সফল জীবনের রচনার উপযুক্ত মালমসলা। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগুলির প্রয়োগ করা চলে, কিম্বা উদ্দেশ্যবিহীনভাবেও এদের কর্ষণা সম্ভবপর। যেমন গৃহনির্মাণের উপকরণ থাকলে পূর্বে কোন প্রকার নক্সা বা পরিকল্পনা স্থির না ক'রেও ইঁটের ওপর ইঁট সাজিয়ে কোন কিছু গ'ড়ে তোলা যায়; এরূপভাবে-নির্মিত গৃহ যে চৌকোণা-মিলানো হবে তা আশা করা দুরূহ, কোন গতিকে হ'লেও তা যে সৌধ হবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মানুষের চরিত্রগঠন সম্পর্কেও এই ধরণের কথা বলা যায়। অনেক লোকের মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ নির্দিষ্টরূপে চরিত্রগঠনের জন্য সজ্ঞান চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না; ফলে মানব-সমাজে অসম্পূর্ণ চরিত্রের লোকের সংখ্যাই বেশী। মানুষ যদি নিজেকে জানার চেষ্টা করত, তার মনের প্রকৃতি, অন্তর্নিহিত শক্তি, আত্মবিকাশের সম্ভাবনা ও উপায় সম্বন্ধে কিছুটা গভীরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস করত, তবে তার জীবন অধিকতর সমৃদ্ধ ও সফল হ'য়ে উঠত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শিশু, বালক, কিশোর—যারা অন্য বিজ্ঞ বয়স্কলোকের পরিচালনা ব্যতীত আত্মবিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে না—তাদের কথা বাদ দিলেও কয়জন বয়স্কব্যক্তি নিজের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখে দোষগুলি অপসারণ ক'রে নিখুঁত চরিত্র গ'ড়ে তোলার চেষ্টা ক'রে থাকে? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, কোন্ শক্তি মানুষের সকলপ্রকার কর্মের প্রেরণা যোগায়, কোন্ শক্তি তার পক্ষে কল্যাণকর কোন্‌টি বা অকল্যাণের সোপান, কিভাবে শিব-শক্তির বৃদ্ধি ও অশিব-শক্তির দমন সম্ভবপর, কিভাবে নিজের জীবন যথাসাধ্য সুন্দর ক'রে রূপায়িত করা যায় সে সম্বন্ধে খুব বেশী লোক চিন্তা ক'রে দেখে না। অধিকাংশ মানুষ অপরের আচরণ যতখানি পর্যবেক্ষণ করে, নিজের আচরণ ততখানি যাচাই ক'রে দেখে না; অপরের সমালোচনা যতটা করে, নিজের সমালোচনা তার শতভাগের একভাগও করে না। নিজের অন্তরের দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নাই, তাদের দৃষ্টি বাইরের দিকে; সবচেয়ে কাছের বস্তু মন, অথচ তাই তাদের কাছে সবচেয়ে অপরিচিত।

নিকটের চেয়ে দূরের জিনিসের প্রতি মানুষের যে চিরন্তন আকর্ষণ রয়েছে তা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

বহুদিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু ;
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

প্রকৃতির রাজ্যে বিরাট ও বিশালের মধ্যে যেমন মহান সৌন্দর্য আছে ক্ষুদ্র সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে তেমনি অপূর্ব নিপুণতা ও মনোমুগ্ধকর রূপের প্রকাশ। ভাবুকের চোখে সামান্য জিনিসও অসামান্য হ'য়ে দেখা দেয়। মানুষের অন্তর-রাজ্য সম্বন্ধেও একথাটি প্রয়োগ করা চলে। বিশ্বের মানুষ অপর সকলের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত অথচ তার নিজের মন-শিশিরবিন্দুটির প্রতি নজর দেওয়ার ফুরসৎ হয় না! কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ ব্যতীত, নিজের প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে মোহমুক্ত জ্ঞান ব্যতীত বলিষ্ঠ চরিত্রগঠন কখনই সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ মনীষীর কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

জীবনে মানুষের যতগুলি কাজ আছে তার মধ্যে চরিত্র গ'ড়ে তোলার কাজটিই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এ কাজটি সফলতার সঙ্গে করতে হলে তাকে শান্তচিত্তে সযত্নে নিজের অন্তরের প্রবণতাগুলি পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে হবে ; আত্মপ্রবঞ্চনা যাতে তার দোষত্রুটিগুলি ঢেকে রেখে তার গুণগুলিকে বড় ক'রে না দেখায় সে সম্বন্ধে তাকে সতর্ক হতে হবে ; নৈরাশ্য তাকে নিরুৎসাহ ক'রে তার কল্যাণকৃৎ শক্তিকে যাতে পঙ্গু ক'রে না দেয় সেদিকেও রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি। নিজের প্রকৃতির ওপর তার কোন ক্ষমতা নাই—দুর্বল অদৃষ্টবাদীর এই কথা যেমন তাকে পরিহার করতে হবে, তেমনি তাকে একথাটিও স্পষ্ট ক'রে মানতে হবে যে, তার শক্তি অসীম নয়।

আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে সার্থক চরিত্র গ'ড়ে তুলতে হ'লে আত্ম-বিশ্লেষণ যেমন আবশ্যক তেমনি প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ ক'রে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার। এর জন্য কিশোর ও বয়স্ক ব্যক্তিরা দুইটি উপায় অবলম্বন করতে পারে। প্রথম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা বিপুল উদ্যমে তা সফল করার কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারে ; দ্বিতীয়, কোন একটি উন্নত জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ ক'রে সেটি বা কতক উন্নত চরিত্রের বিভিন্ন গুণ নিজের জীবনে বিকশিত ক'রে তুলতে যত্নবান হ'তে পারে। এই দুইটি পন্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

বাল্যের ছোট গণ্ডী পার হয়ে কিশোর যখন বৃহত্তর পরিচয়ের ক্ষেত্রে এসে পেঁ ৗছে তখন থেকে তার ক্রমবর্ধমান আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মজাহির-প্রবৃত্তি নূতন নূতন দিকে তাকে আকৃষ্ট করে। যশঃ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে যারা সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছে, কিশোরের মনেও জাগে তাদের মত এরূপ সম্মানিত স্থান অর্জনের বাসনা। উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার কর্মশক্তিতে অতিরিক্ত প্রেরণা সঞ্চার করে। আমাদের মনে প্রশংসা অর্জন করার এবং প্রশংসার্হ হওয়ার দুইটি কামনা পাশাপাশি বিরাজ করে। দুইটি প্রায় এক মনে হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশংসা অর্জন করার কামনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। উন্নতি এবং সাফল্য মানুষের মনে মোহজাল বিস্তার করে ; আরো সাফল্যের দিকে সে এগিয়ে যেতে চায় ; উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সে যে উপায় গ্রহণ করে তা ন্যায় কি অন্যায়, বৃহত্তর মানব কল্যাণের দিক থেকে তা বাঞ্ছনীয় কি অবাঞ্ছনীয় তা সে প্রায়ই ভেবে দেখে না। তার কাছে সাফল্যই মুখ্য সাফল্য অর্জনের পন্থা গৌণ। তা ছাড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনই তৃপ্ত হয়না। 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে' অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত ইহা ক্রমশঃ বেড়েই চলে। আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তির দরুণ মনোব্যথাও মানুষকে ভোগ করতে হয়। কথিত আছে জয় করার মত আরো পৃথিবী নাই ব'লে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার একদিন কাঁদছিলেন ! 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিজয়দৃপ্ত দুর্যোধনের মুখে যে ভাষা দিয়েছেন তাতে অতৃপ্ত দুরাকাঙ্ক্ষার কথা ধ্বনিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে মৃদু ভৎর্সনা ক'রে বললেন—অখণ্ড রাজত্ব জিনি সুখ তোর কই রে দুর্মতি ?

দুর্যোধন উত্তরে বললেন ঃ

*　　*　　*　　*

ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস......
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

শুধু বিজয়গৌরব সম্বন্ধেই নয়, কোন বিষয়েই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি সাধিত হয় না। যে রাজনৈতিক জীবনে জনপ্রিয়তা ও যশঃ কামনা করে তার কামনার পরিতৃপ্তি নাই, যে ধনসঞ্চয়ের দীপ্ত বাসনায় মেতে ওঠে কিছুতেই তার সম্পদ-তৃষ্ণার নিবৃত্তি ঘটে না। তাই উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্মচঞ্চল ক'রে রাখে, তাকে মানসিক শান্তি দান করে না; তার তৃষ্ণা প্রখর ক'রে তোলে, পরিতৃপ্ত করে না।

আদর্শ

আদর্শের অনুসরণ করতে গেলে মানুষের এইরূপ অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নাই, প্রতিযোগিতা তার নিজের সঙ্গে। অপর ব্যক্তির যে গুণগুলি তার মনকে আকৃষ্ট করে, সেগুলি সে নিজে অর্জন করতে চায়। এইভাবে অর্জন করার ব্যাপারে আত্মসাধনাই একমাত্র পন্থা; এখানে ফাঁকির কোন স্থান নাই কিম্বা কোন সহজ সংক্ষিপ্ত উপায়ে কোন আদর্শ চরিত্রের সমকক্ষ হওয়ার পন্থা নাই। দীর্ঘদিন ধ'রে নীরব একনিষ্ঠ চেষ্টার ভিতর দিয়াই মানুষ আত্মশক্তিকে বিকশিত করে এবং মহান চরিত্রের অধিকারী হয়। অনেক সময় ভাবপ্রবণ কিশোরগণ মানুষের বিভিন্ন শক্তি-বিকাশের পিছনে যে নীরব সাধনা আছে তা উপলব্ধি করতে পারে না, যে গুণের বহিঃপ্রকাশ দেখে অন্য গুণীলোকের আচরণে তাই তারা নিজেরা পাওয়ার কামনা করে; যেমন কোন বাগ্মীর বক্তৃতাশক্তি, লেখকের রচনা-কৌশল, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার, সাধকের অধ্যাত্মসমৃদ্ধি কিশোর তরুণকে সহজেই আকৃষ্ট করে; তারা ভাবে—যদি ঐরকম গুণ আয়ত্ত করা যেত! কেউ কেউ হয়ত কিছু কিছু অনুকরণ করতে সুরু করে কিন্তু একথাটি অনেকেই ভেবে দেখে না যে, যাঁদের গুণ অন্যকে মুগ্ধ করে তাঁরা হঠাৎ বা সামান্য চেষ্টাতে সে সব গুণের অধিকারী হন নি। গাছে যখন

ফুল ফোটে তখন তার সৌন্দর্য ও সৌরভ অন্যকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু ফুল ফোটাবার জন্য গাছের যে নীরব, একনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চলেছে তার কথা আমরা কয়জনে ভেবে দেখি? মাটি থেকে, জল থেকে, আলোবাতাস থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে উদ্ভিদ পুষ্ট ক'রে তোলে তার দেহ আর আয়োজন করে পুষ্পবিকাশের। মানুষের জীবনেও চলেছে এমনি ধারা নীরব শক্তি-প্রকাশের সাধনা। সাধনা বাদ দিয়ে মানসিক শক্তির স্ফুরণ আশা করা বৃথা; অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক সময় কিশোরগণ অজ্ঞতার বশে ও দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ে অপারগ হ'য়ে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত চরিত্র গ'ড়ে তোলে। উপযুক্ত গুরুর সহায়তা নিয়ে সাধনপথে এগিয়ে যাওয়াই যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় তেমনি মানসিক গুণরাজির বিকাশসাধন ক'রে উন্নত, সার্থক চরিত্রের অধিকারী হতেও মানুষকে বিশেষ ক'রে বাল্যে ও কৈশোরে উপযুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসতে হবে; কারণ শুধু তত্ত্বকথা আর নিছক উপদেশ কিশোরের মনে দাগ কাটে না। তারা প্রাণবান মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করে, যেমন প্রদীপ্ত আলোকশিখা থেকেই অন্য প্রদীপ জ্বালানো সম্ভবপর হয় তেমনি।

ভারতের আদর্শ

ভারতবর্ষের মাটির গুণেই হোক্ কিম্বা এখানকার জলবায়ুর প্রভাবেই হোক্ এ দেশের অধিবাসীরা চিরদিনই আত্মমুখী, সাধন-অনুরাগী; নিজেদের অন্তর-শতদলকে পূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলার সাধনাই এদের কাছে প্রধান। 'আমি বিশ্বজয়ী বীর হ'ব, বিশ্বের মানবজাতিকে পদানত ক'রে রেখে বিশ্বের ধনসম্পদ আমি ভোগ করব' এমন কামনা কোন শক্তিমান ভারতবাসীও মনে পোষণ করেনি। জাগতিক সমৃদ্ধি ও ধনরত্নের চেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন তাদের কাছে শ্রেয় এবং প্রেয় ছিল। তাই প্রাচীন ভারতে তপোবন জাতীয় জীবনে একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করেছিল। তপোবন ছিল অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র, মানবজীবন গ'ড়ে তোলার, চরিত্রের শুভ্রনির্মল শক্তিবিকাশের পুণ্যকেন্দ্র।

তাই ব'লে একথা অনুমান করা ঠিক হবে না যে, প্রাচীন ভারত অধ্যাত্মজীবনকেই একমাত্র পরমার্থ ব'লে গ্রহণ করে জাগতিক সমৃদ্ধির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ধর্ম ও অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এদের মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ মিলন-সাধনের চেষ্টা হয়েছিল এদেশের সমাজজীবনে। ভারতের এই মহান জীবনাদর্শের কথা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

সাংসারিক জীবনে

* * * *

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

ভারতীয়ের দৃষ্টিতে তিনিই শ্রেষ্ঠ সংসারী ব্যক্তি যিনি ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ক্ষমাশীল, যিনি সম্পদকালে উদ্ধত আচরণ দ্বারা পাছে কাহাকেও আঘাত দেন এই ভয়ে বিনম্র হয়ে থাকেন, যিনি বিপৎ-কালে নির্ভীকভাবে উন্নতমস্তকে দুঃখ সহ্য করেন, যিনি ভোগবাসনার অপরিমিত সামগ্রী পেয়েও স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে প্রশান্তচিত্ত হ'তে পারেন। সংযম দ্বারা শক্তিকে, ত্যাগ দ্বারা ভোগকে যিনি মহীয়ান করতে পেরেছেন, তিনিই পেয়েছেন ভারতবাসীর অন্তরে গৌরবের স্থান। রবীন্দ্রনাথের অপূর্বসুন্দর ভাষায় আদর্শ চরিত্রের রূপটি 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় মহামুনি বাল্মীকির কথায় ফুটে উঠেছে। তমসার তীরে বাল্মীকির আশ্রম ; সেখানে নারদ এসেছেন পিতামহ ব্রহ্মার দূতরূপে কবিকে অনুরোধ করতে যা'তে তিনি কোন দেবতার কীর্তিগাথা অবলম্বন ক'রে মহাকাব্য রচনা করেন ; কবি নারদকে বললেন, তিনি একজন আদর্শচরিত্র সংসারী মানুষের জীবনবৃত্তান্ত অন্য সংসারী লোকের সম্মুখে তুলে ধরতে চান। এইরূপ আদর্শ-চরিত্র লোক কে হতে পারেন তা জানবার জন্য বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

* * * *

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ বৃহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

ভারতবর্ষে এই ছিল পূর্ণমানবত্বের, আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ। সমাজ যা আকাঙ্ক্ষার বস্তু ব'লে মনে করত, সমাজের ধারক ও বাহক ব্যক্তির মধ্যে তা বিকাশ সাধনের আয়োজন করা হত শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়ে। সমাজের প্রভাব ও পারিবারিক জীবনের পরিবেশ এ ভাব বিকাশের পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু আদর্শ চরিত্র গ'ড়ে তোলা চিরদিনই দুঃসাধ্য এবং দুঃসাধ্য, দুর্লভ বলেই এর মূল্য এত বেশী।

পৃথিবী জুড়ে মানুষে মানুষে দৈহিক গড়নে, জীবন প্রেরণার মূল উপাদান প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সব মানুষেরই জীবন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। এই ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য হেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন-সংগ্রামে দেখা দিয়েছে পার্থক্য ; তার সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার ও জীবনের মূল্যবোধ মিলিত হ'য়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের জাতীয় চরিত্রে এনে দিয়েছে মূলগত পার্থক্য।

জাতীয় চরিত্র

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের ও ভারতের অধিবাসীদের জাতীয় আদর্শের অন্তর্নিহিত বিভেদটি উপলব্ধি ক'রে বলেছেন, পাশ্চাত্য হল বিশ্বামিত্রের দেশ—কর্মচঞ্চল, প্রাণবান, রাজসিক গুণ প্রধান আর প্রাচ্য বশিষ্ঠের দেশ—শান্ত সমাহিত, অন্তর্মুখী, ত্যাগী, সাত্ত্বিক গুণ প্রধান।

ইউরোপের জাতিবর্গ জাগতিক উন্নতি সাধন ক'রে জীবনটাকে ভোগ করতে চায় পরিপূর্ণভাবে ; তাদের কাছে ইহজীবনই প্রধান। প্রাচ্যের জাতি, বিশেষ ক'রে ভারতবাসী হিন্দুর আদর্শ জাগতিক ভোগবিলাস নয়, ত্যাগ ও বাসনার নিবৃত্তি। পাশ্চাত্য হয়েছে কর্মস্থান, প্রাচ্য ধর্মস্থান। মানব সভ্যতার রচয়িতা হিসাবে ইউরোপ দান করেছে শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, যোদ্ধা, দার্শনিক ; এশিয়া দিয়েছে ঈশ্বরপ্রেমিক যোগী। বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, যিশু,

চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—এঁরা সবাই ত্যাগের পথে, আত্মোপলব্ধির পথে অধ্যাত্ম জগতের সন্ধান দিয়েছেন ; মানবপ্রেমের বাণী প্রচার ক'রে এঁরা মানুষের মনের উদারতা বৃদ্ধি করেছেন, মানুষকে নিছক পশুজীবনের উর্ধ্বে তুলে তার জীবনকে করেছেন মহনীয় ঐশ্বর্যে মণ্ডিত।

বস্তুতান্ত্রিকতার ও আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য

একথাটি এখানে উল্লেখ করা চলে যে, বিশ্বব্যাপী মানবসমাজ যদি কঠোর আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়বিরোধ, ত্যাগ ও নেতিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহকালের চেয়ে পরকালের প্রতিই যদি তাদের বেশী আকর্ষণ থাকে তবে মানুষের সমাজব্যবস্থায়ও সভ্যতায় পড়বে ক্ষয়িষ্ণুতার ছাপ, বর্তমান জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ, বলিষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী ক'রে তোলার উদ্যম যাবে কমে। পক্ষান্তরে, কেবল জাগতিক ঐশ্বর্যলাভেই মানুষের মন তৃপ্ত হয় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরে যে সূক্ষ্ম-অনুভূতির অধ্যাত্মরাজ্য সেখানকার রসাস্বাদ করার আকুলতা জাগে উন্নতস্তরের মানুষের মনে। নিছক জড়বাদের মধ্যে মানুষের মন পরম সার্থকতা লাভ করে না, ভোগের বস্তু যতই পাওয়া যায় মনে নির্মল তৃপ্তি আসে না, তৃষ্ণাকে তা আরো বৃদ্ধি করে, অবশেষে আসে অবসাদ ; বাসনা-তৃষ্ণা নিবারণের উপায় খুঁজতে, স্থায়ী আনন্দের উৎস সন্ধান করতে, মানুষকে বস্তুময় স্থূল জগৎ ছেড়ে মনোজগতে অগ্রসর হতে হয়। চিৎ-শক্তির বিকাশই অধ্যাত্মসাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথম পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছান যায় না। মানবসাধারণের সুস্থ জীবনবিকাশের জন্য, বহুর কল্যাণের নিমিত্ত, জীবনের এই দুই আদর্শের সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের আত্মার মূর্তপ্রতীক ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ জীবনবিকাশের জন্য পরমপুরুষের নিকট যে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন তার মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও স্রষ্টার পদে আত্মসমর্পণের বাসনা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ঃ

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত্ত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥

এই ভাবসমৃদ্ধ কবিতায় যে কামনা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা, উদ্যম ও নির্ভীকতা হবে মানব-চরিত্রের ভূষণ ; আত্মশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ নিজেকে অপর সকলের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবে না ; উদ্ধত অকল্যাণকর দুর্বিনীত হয়েও উঠবে না ; প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত তার চিত্ত-শতদল সকল শক্তির যিনি আধার তাঁর চরণে সমর্পণ ক'রে রাখবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন ঃ সংসারের সকল কাজের মধ্যে মন রাখবে ঈশ্বরের দিকে ; যেমন দেখা যায় ঢেঁকিতে ধান ভানার সময় মা তার কোলের শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়ায়, অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য থাকে হাত ঢেঁকির নীচে না পড়ে, তেমনি।

চরিত্রগঠনে প্রতিবন্ধক

আমরা সকলেই চাই আমাদের জীবনকে একটি স্বাভাবিক রূপদান করতে। বৃদ্ধির এই কামনা সকল মানুষের, সকল প্রাণীর, সকল জীবন্ত পদার্থমাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। চলমান বিশ্বে চলেছে সবাই, যে এগিয়ে যেতে পারে না, যার বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না সে পিছিয়ে পড়ে বিলুপ্তির দিকে। জন্মের পর থেকে শিশু বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে ; তার বৃদ্ধিতে আছে জটিলতা, কেননা শুধু তা তার একার ওপরই নির্ভর করেনা ; যাদের মধ্যে সে লালিত হয়, যাদের সংস্পর্শে সে বেড়ে ওঠে তাদের প্রভাব পড়ে তার জীবনে, সেও অন্যের জীবনকে তেমনিভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখে শিশুকে মানুষ ক'রে তোলা যায় না, তার

পিতামাতার অজ্ঞতা

অমানবোচিত বিকাশে কোন সার্থকতাও নাই। শিশু চোখ মেলে যখন চারিদিক দেখতে সুরু করে তখন সে রয়েছে তার পরিবারে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে। এখানেই তার অভ্যাস ও আচরণ শিক্ষার সূত্রপাত। অধিকাংশ পিতামাতাই মানবজীবন-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ ; তাই তাঁরা শিশুর জীবন গ'ড়ে তুলতে তার চরিত্রকে কোন একটি নির্দিষ্টরূপ দিতে চেষ্টা করেন না ; শিশুকে পালন করতে তাঁরা যে পরিবেশ রচনা করেন, যেরূপ আচার ব্যবহারের ভিতর দিয়ে শিশু বড় হতে থাকে তদনুসারে তার চরিত্রের ভিত্তিটি স্থাপিত হয়। শিশু যেন পরিবেশের স্পঞ্জ ; যা সে দেখে, যেরূপ আচরণ পায় সেই অনুসারে তার মনের কাঠামো রূপ গ্রহণ করে। আমরা বয়স্করা শিশুকে যতখানি নির্বোধ বা অপরের আচরণের প্রতি উদাসীন মনে করি, বাস্তবিক পক্ষে সে ততখানি বোকা বা উদাসীন নয়।

পরিচালনার অভাব

বাল্যে ও কৈশোরে বালকবালিকা যখন আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কামনায় কঠোর শ্রম স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না তখন তাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ তুলে ধ'রে আমরা কয়জনে তাদের চরিত্রগঠনে সাহায্য ক'রে থাকি ? লাউ কুমড়া প্রভৃতি লতানে গাছ বেড়ে ওঠার সময় এদের আকর্ষ দিয়ে কোন কিছু জড়িয়ে ধ'রে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। কিশোরের মনও তেমনি অবলম্বনের যোগ্য কোন আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ পেলে এবং সেদিকে তারা আকৃষ্ট হলে আত্মশক্তি বিকাশের উদ্দীপনা লাভ করে। দেশে হাজার হাজার, লাখ লাখ পরিবারের মধ্যে কতটি পরিবার কিশোরের চরিত্র-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ও উচ্চ আদর্শ তার সামনে রেখে জীবনগঠনে সহায়তা করে ? গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ জওহরলালের কিশোর বয়সের পরিবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে এঁদের ভাবী-জীবনের চরিত্র-কাঠামো তৈরি হয়েছিল কৈশোরেই।

গান্ধীজীর বাবা ছিলেন সাত্ত্বিক প্রকৃতির সত্যাশ্রয়ী, ভগবদ্ভক্ত পুরুষ ; মা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ব্রতচারিণী, স্নেহশীলা মহিলা ; সংযম ও অধ্যবসায়, ত্যাগ ও নিষ্ঠা, সেবা ও সত্যব্রতগ্রহণ গান্ধীজীর জীবনে আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিকও নয়। বাল্য ও কৈশোরে তিনি ধীরে ধীরে এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে কাব্যসংগীতশিল্পের ইন্দ্রপুরীতে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে দাদারা শিল্প ও সাহিত্যের যে সুরুচিপূর্ণ

জীবন্ত পরিবেশ রচনা করেছিলেন, মহর্ষির অধ্যাত্মসাধনার আলোকে তা হয়েছিল মহৎ চরিত্র তৈরির পুণ্যক্ষেত্র ; ঠাকুরপরিবারের গঙ্গোত্রীক্ষেত্র থেকেই রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের উৎপত্তি স্বাভাবিক।

ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র পুত্র জওহরলাল বাপমায়ের অত্যধিক আদরে 'নবকার্তিক' হ'য়ে ওঠেন নি। পিতা মোতিলাল নেহরুর সিংহবিক্রম, অসাধারণ ত্যাগ ও দীপ্ত স্বদেশপ্রেম কিশোরকে এক মহান আদর্শের প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট করেছিল। নেহরু-চরিত্র কোমলে ও কঠোরে মিশ্রিত ; কৈশোর থেকেই এরূপ গ'ড়ে উঠতে সুরু করেছিল।

যে কয়জন মহামানবের কৈশোরের কথা এখানে উল্লেখ করেছি তাঁদের চরিত্রগঠনে কেবল পরিবেশই দায়ী নয়, বংশগতি বা বংশের ধারাও যোগ্য শক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছে তাঁদের জীবনে। বস্তুতঃ সকল মানুষের জীবনেই বংশগতি ও পরিবেশ দুইই প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। পরিবেশ, আদর্শ অনুসরণ ও উপযুক্ত পরিচালনা কিভাবে কিশোরকে সার্থক চরিত্র গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই আমরা কয়েকজন শক্তিমান পুরুষের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছি।

* * * *

কৈশোর কামনার ব্যর্থতা

বাস্তবজীবনের ঘূর্ণিবাত্যায় প'ড়ে অধিকাংশ তরুণ সাময়িকভাবে দিশেহারা হয়ে যায়। কৈশোরে তারা মনে মনে যে স্বপ্নজাল বুনেছে, যেরূপ কর্ম-জীবনের ছবি এঁকেছে কামনা বাসনার রঙ দিয়ে, অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিযশঃপ্রার্থী কিশোরের নিষ্ফল পরিণামের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন—'ছোট ছোট কালিদাস কত ডোবে পাথারে' শুধু 'কালিদাস' কেন, এমন কত ভাবী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, শিল্পী আবিষ্কারক অকালে শুকিয়ে যায়। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আগে কিশোর মনে মনে নিজের কর্মজীবনের যে পরিকল্পনা করে তার বদলে অবস্থার চাপে সে যখন নূতন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে পড়ে তখন তার মনের অবস্থাটি কেমন হয় ? বিপরীত দিক থেকে আগত স্রোতের মিলনে জলের বুকে যেমন আলোড়ন জাগে তেমনি। তবে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যে শক্তি মানুষের আছে তার ফলে, প্রয়োজনের তাগিদে নূতন ক্ষেত্রেও সে মনোনিবেশ

করে কিন্তু পূর্বের কামনা বাসনা বেশীর ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই মনের তলায় চাপা প'ড়ে থাকে। শুধু অন্তরে যাদের বিপুল নিষ্ঠা, কৌতূহল যাদের অপরিসীম, সব রকম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রেও যারা মনের স্বপ্নকে সার্থক করতে চায় তারাই ভিন্নরূপ কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকলেও কৈশোরের আদর্শ সার্থক করতে চেষ্টা ক'রে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা, স্যার আশুতোষের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা, স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণের বিজ্ঞান-সাধনা, রামানুজমের গণিতানুরাগ দৃঢ় এবং নিষ্ঠাবান চরিত্রের পরিচায়ক।

পরিশেষে একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি। নিজেদের মনঃপ্রকৃতি, অন্তরের প্রবণতা, সহজাত প্রবৃত্তির শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে কি আমরা সচেতন? আমরা কী চাই, জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিভাবে চললে আমাদের জীবনকে যথাসাধ্য সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারি তা কি ধীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখি? আমরা নিজেদের যেমন ভালভাবে জানিনে তেমনি যাদের সঙ্গে সমাজে বাস করতে হয়, কর্মজীবনে একত্র চলতে হয়, পরিবারে সুখদুঃখ হর্ষবেদনার সমভাগী হতে হয় তাদের মনোজগতের খবরও সঠিকভাবে রাখি না। তাই একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস ক'রেও আমরা পরস্পর থেকে কত দূরে!

সমাজের বেশীর ভাগ লোকের যেমন জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না, তেমনি আত্মোন্নতির জন্য সানুরাগ ও সক্রিয় চেষ্টায় খুব কম সময়ই ব্যয়িত হয়। আমাদের প্রতিদিনকার কাজের মধ্যে কতটা সময় নিদ্রা ও আলস্যে অপব্যয় করি, কতটা সময় বাজে কথায় ও পরচর্চায় অতিবাহিত করি, কতটা সময় ভাবী বংশধর শিশু সন্তানদের গ'ড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করি, কতটা সময় শিল্প সাহিত্যললিতকলা অধ্যাত্ম চিন্তার ভিতর দিয়ে মনকে সরস ও সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি তা স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলেই আমাদের জীবনের স্বরূপটি বুঝতে পারা যাবে। কোন্ মহাশিল্পী এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের ভিতরে আত্মবিকাশের অন্তহীন প্রেরণা দিয়েছেন তা বুদ্ধির অগম্য তবে এইটুকু বুঝতে পারি যে, মানুষের মধ্যে তিনি দিয়েছেন সৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ, তাই তার চরিত্রগঠন ও জীবন বিকাশ হয়েছে একটি বড় আর্ট।

মানবপ্রকৃতির কয়েকটি দিক

মানবজীবনের মূল উপাদান ও তার আচরণের গোপন উৎসস্থল সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। মানুষ প্রাণিজগতে ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে এসেছে ; অত্যন্ত সরল থেকে অত্যন্ত জটিল হয়েছে তার দেহ ও মনের গঠন এবং তার ক্রিয়াকলাপ। কোটি কোটি বছর ধ'রে নীরবে এবং অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে যে বিবর্তনের কালচক্র, তার ভিতর দিয়ে জীবজগতে বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষও তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, সূর্যপ্রদক্ষিণ-রতা পৃথিবীর শূন্যপথে পরিক্রমণ যেমন আমরা অনুভব করতে পারিনে, তেমনি। তা-ছাড়া, মানুষের জীবন কয়দিনের ? পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবজীবন ক্ষণস্থায়ী জলবিম্বের মত ; সামান্য একটি কণা জলের উপর জেগে ওঠে, কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তার পরমুহূর্তে বিদীর্ণ হয়ে মিশে যায় জলের সঙ্গে ! এই অল্পকালস্থায়ী জীবনেও মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার আলোড়ন চলেছে তার মনোজগতে। শঙ্করাচার্য জীবনের এই দিকটি দেখে বলেছেন ঃ

নলিনী দলগত জলমতি তরলং
এতজ্জীবনমতিশয় চপলম্
বৃদ্ধি-ব্যাধি-ব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্।

পদ্মের পাপড়ির ওপরে জলবিন্দুর মত মানবজীবন অতিশয় চপল ; জরা-ব্যাধিশোক দুঃখে মানুষ অভিভূত। এই তো জীবন ! তবে এইটি জীবনের সমগ্র রূপ নয়। জীবনে দুঃখ বেদনা যেমন আছে, তেমনি আছে আনন্দ। অমারজনীর দুর্যোগময় ঘোর অন্ধকার যেমন চিরস্থায়ী নয়, প্রাণজাগানো সোনারবরণ সূর্যকিরণে পৃথিবী যেমন হেসে ওঠে তেমনি মানুষের জীবনে আছে দুঃখসুখের আঁধার-আলো-মিশানো আল্পনা। কেবল একটানা দুঃখের জীবন হলে মানুষ তা সহ্য করতে পারত না ; আনন্দের অমৃত সবকিছু সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। উদ্ভিদের আলোর দিকে শাখা প্রসারিত করার মত মানুষ আনন্দের সন্ধানে তার অন্তর-শাখাকে প্রসারিত ক'রে দেয় আনন্দের উৎসের দিকে। আনন্দলাভের কামনায় মানুষ প্রবৃত্ত হয় নানা বিচিত্র কাজে—সবকিছুর উদ্দেশ্য আত্মতৃপ্তিলাভ। এই কর্মের বৈচিত্র্যের জন্য মানব

সমাজে হয়েছে বিচিত্র মানুষের মেলা। এদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক রকম নয়; কর্মক্ষমতাও এক প্রকার নয় তাই তাদের আচরণে ও কর্মের সাফল্যে রয়েছে পার্থক্য।

পূর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন মিশ্র-ভাব বা রস আমাদের জীবনকে এক একটি বিশেষ রূপদান করে। প্রত্যেক মানুষ তার মন ও ভাবকল্পনা নিয়ে নিজের একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গ'ড়ে তোলে। এই স্বতন্ত্রতার মধ্যে মানুষের স্বভাবের কয়েকটি বিশেষ দিক চোখে পড়ে; এগুলি জীবন-প্রেরণার মূল উৎস না হলেও আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এর কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্।

আলস্য

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতিজ গুণ কমবেশী মাত্রায় সকলের মধ্যেই রয়েছে। নিদ্রা, মোহ, জড়তা, আলস্য তমোগুণ থেকে উদ্ভূত। এগুলি মানুষের আত্মশক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক। সৃষ্টিলীলার মর্মস্থিত রহস্য হ'ল প্রাণের অভিযান; প্রাণশক্তি জড়তাকে, আলস্যকে অভিভূত ক'রে নব নব রূপে বিকশিত হ'য়ে উঠছে। মানুষের যতকিছু উন্নতি তাও জড়তাকে পরাভূত ক'রে রাজসিক কর্মপ্রচেষ্টা ও সাত্ত্বিক জ্ঞানপ্রকাশের ভিতর দিয়ে সংঘটিত হচ্ছে। মানুষের জীবনে তাই অহরহ চলেছে দ্বন্দ্ব—জড়তার সঙ্গে রাজসিকতার ও সাত্ত্বিকতার সংগ্রাম ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে, জাতীয় জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে। আলস্য পরিহার ক'রে উদ্যমের সঙ্গে কর্মে প্রবৃত্ত না হ'লে মানুষের উন্নতিসাধনের অন্য কোন পন্থা নাই।

সব মানুষের মধ্যে কর্মের উদ্যম সমানমাত্রায় থাকে না অথচ একনিষ্ঠ চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়া কোন কাজই সম্পন্ন হতে পারে না। মার্কিন বিজ্ঞানী এডিসন বহু যান্ত্রিক আবিষ্কারের জন্য প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক ব'লে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন। প্রতিভা বলতে কি বোঝায় এবং প্রতিভালাভের উপায় কি তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'প্রতিভা বলতে বোঝায় শতকরা দুইভাগ বুদ্ধিশক্তি আর ৯৮ ভাগ গলদ্‌ঘর্ম।' অর্থাৎ অনলস চেষ্টা দ্বারাই মানুষ মহৎ কাজ সম্পাদন করতে পারে, অন্য উপায়ে নয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায়, চেষ্টা ও উদ্যমের অভাবে অনেকের নানাবিধ

মানসিক শক্তি অবিকশিত থেকে যায় ; আলস্য ত্যাগ ক'রে কাজ না করার ফলে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা মনের মধ্যে রঙিন স্বপ্নরূপেই থেকে যায়, বাস্তবে পরিণত হয় না। শাস্ত্র বলেছেন ঃ

আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্তব্যস্য চ কর্মনঃ
ক্ষিপ্রমক্রিয়মানস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্ ।

আদেয়, প্রদেয় এবং কর্তব্যকর্ম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে না করলে কাল তার রস পান ক'রে নেয়, সে কাজ সম্পাদন করা আর হ'য়ে ওঠে না। অলস প্রকৃতির লোকের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা নিজেদের জীবনের মূল্যবান সময় বৃথা কাটিয়ে তো দেয়ই সেই সঙ্গে তাদের আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি গ'ড়ে তোলে মনে মনে। যে-মানুষের মধ্যে আলস্য বেশী সে প্রাণিজগতে মানুষের স্তরে উন্নীত হলেও মনুষ্যত্ব অর্জন তার সাধ্যায়ত্ত নয়।

বিশ্বজগতে যে সৃষ্টিলীলা চলেছে তাতে জড়কে অভিভূত ক'রে প্রাণশক্তি বিজয়ী হয়ে এসেছে। জড়তা জীবনের বিপরীত শক্তি, তাতে নাই আনন্দের প্রকাশ। প্রাণশক্তি চঞ্চল, উন্মাদনাময়। এক কথায় বলা চলে জীবনই উত্তম, জড়তা মৃত্যু। প্রাণিজগতে জীবনধারণের জন্যই জীবকে উত্তমশীল হতে হয় ; তার আত্মরক্ষা, খাদ্যসংগ্রহ, বংশবৃদ্ধি—এ সবই অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সম্পাদন করতে হয়। উত্তমহীন এখানে বেঁচে থাকার অযোগ্য।

জড়তা বনাম উদ্যম

মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাস ক'রে সমাজব্যবস্থা স্থাপন করেছে ব'লে তার জীবনে প্রতিযোগিতার ধারা গেছে বদলে। তার অবসর আছে, আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাবার জন্য সাধনা করার সময় আছে ; তার বুদ্ধি আছে, উন্নত জীবন লাভের উপায় দেখানোর গুরু ও পরিচালক আছে। আবার সঞ্চিত ধনসম্পত্তির ওপর বা অপরের দয়ার ওপর নির্ভর ক'রে উত্তমহীন, জীবন ধারণের সুযোগও মানুষ পেয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ জীবনের কোন মর্যাদা নাই ; এরূপ লোক স্বচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের যে গৌরব ও বিমল আত্মতৃপ্তি আছে তা থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকে।

সৌন্দর্য-প্রীতি

সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবধর্ম। প্রাণিজগতে সৌন্দর্য উপলব্ধি ক'রে আনন্দ অনুভব করার মত মানসিক যোগ্যতা মানুষ ছাড়া

অন্য কোন জীবের নাই। অরণ্যের শ্যামল শোভা, নীল আকাশে বিচিত্র রঙের আলিম্পন, নীলসাগরের বুকে সাদা ফেনার মুকুট-পরা ঢেউ এর আন্দোলন, দূর চক্রবালে দুই নীলের শান্ত মিলনদৃশ্য শুধু নয়নকেই আনন্দ দেয় না, বিস্ময়মাখানো পুলকে মন বিমুগ্ধ করে। যদি প্রশ্ন করা যায়—বাইরের সুন্দর দৃশ্য মনে উল্লাস আনে কেন? তবে তার উত্তর দেওয়া সহজ হবে না। শুধু এইটুকু বলা চলে—সৌন্দর্য-অনুভূতি মানুষের মনের একটি বৈশিষ্ট্য; সকল জীবের মজ্জাতে এ শক্তি কোন প্রবৃত্তির মত মিশে' নাই, এতে শুধু মানুষেরই গৌরবময় অধিকার। বিভিন্ন রঙের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ ও সুঠাম আকৃতির প্রতি মানুষের মনে নিগূঢ় আকর্ষণ আছে; বাইরে তাই এরূপ কিছু দেখলে খুশীতে মন নেচে ওঠে; মানুষের শিল্পী মন কখন কখনও সৌন্দর্য দেখে আত্মহারা হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাল্যকালে একদিন অদ্ভুত তন্ময়তার পরিচয় দিয়েছিলেনঃ জ্যৈষ্ঠ মাস, মাঠ অনেক দূর পর্যন্ত কচি সতেজ সবুজ ধানে ভরা, কালবৈশাখীর কাজলকালো মেঘ আসন্ন ঝড়ের মুখে আকাশের একপ্রান্ত ছেয়ে এগিয়ে আসছে, সেই মেঘের কোল দিয়ে বকের শুভ্র সারি উড়ে চলেছে—নয়নাভিরাম এই দৃশ্য দেখে বালক গদাধর আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ধানখেতের আলের ওপর।

ফুলের কুঁড়ি কেমন ক'রে ধীরে ধীরে পাপড়ি খুলে দিয়ে সৌন্দর্য বিকাশ করে তা দেখবার জন্য একজন ইংরেজ কবি সারারাত্রি জেগে কুঁড়ির কাছে ব'সে ছিলেন!

প্রকৃতির রাজ্যে লতাপাতা, ফুলফল প্রভৃতির গড়ন ও রঙ লক্ষ্য করলে যেন কোন নিপুণ শিল্পীর কলাকৌশলের পরিচয় মেলে। শুধু প্রয়োজন মেটানোই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সৃষ্টি যাতে সুন্দর ও নয়ন লোভন হয় সেদিকেও যেন স্রষ্টার দৃষ্টি রয়েছে। সৃষ্টির মধ্যে যেখানে যে জিনিসটি থাকলে ভাল হত সেখানে তাই রয়েছে। যেটির আকৃতি যেমন হলে সবচেয়ে সুবিধা হত তাই হয়েছে; এ হ'ল প্রয়োজনের দিক; এই সঙ্গে সৌন্দর্যের সংমিশ্রণও ঘটেছে।

প্রয়োজন ও সৌন্দর্য বোধ

সৌন্দর্য উপলব্ধি করার যে শক্তি লাভ করেছে মানুষের উন্নত মন, তা তার সমগ্র জীবনের ওপর আনন্দদায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষ তার বাসগৃহ, তার পরিবেশ, তার ব্যবহারের জিনিসপত্র কেবল কাজের উপযোগী ক'রেই ক্ষান্ত হয় না, তা শ্রীময় ক'রে তুলতেও যত্নবান হয়। তাই রুচিশীল

মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতির, বিভিন্ন আকৃতির গৃহ, মন্দির, সৌধ গ'ড়ে তোলে; রঙে, কারুকার্যে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; রূপবিলাসী মানুষ খাদ্যফসল ফলিয়েই তৃপ্ত হয় না, মনের ও চোখের তৃপ্তির জন্য পুষ্পোদ্যান রচনা করে; যেমন তেমন রঙের পোষাক পরিচ্ছদে প্রয়োজন মিটলেও তাতেই মানুষ খুশী হয় না, রঙের খেলা ও শিল্পের সুষমা তাতে থাকা চাই।

রূপচর্চা ও সৌন্দর্যপ্রীতি মানুষের জীবনকে শোভন সুন্দর করে। সুন্দর কিছু দেখে হরষিত না হয় এমন লোক কে আছে? মানবমনের এই চিরন্তন রূপ তৃষ্ণার প্রতি লক্ষ্য রেখেই শিল্পী-ব্যবসায়ী তাদের পণ্যদ্রব্যের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকে না; এদের সৌষ্ঠব বাড়ানোর ও প্রতিযোগিতা চলে। কারণ ক্রেতা একই প্রকার গুণ সম্পন্ন দুইটি জিনিসের মধ্যে যেটি শোভন সুশ্রী সেটিই পছন্দ করে, এর জন্য যদি দাম কিছু বেশী দিতে হয় তাতে সে বিমুখ হয় না। ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে রুচি ও সুষমা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। সুন্দর জিনিস মানুষের মনে কিরূপ আনন্দময় প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে আমাদের আচরণ থেকেই তা বুঝতে পারি: কদাকার মাটির পাত্রে অথবা অতি সাধারণ ধরণের চিনামাটির কাপে আর চমৎকার কারুকার্য করা সুশ্রী চিনামাটির কাপে চা দিলে কোন্‌টি নিতে ইচ্ছা হবে, কোন্‌টি থেকে পান ক'রে বেশী আনন্দ পাওয়া যাবে তা বুঝতে মোটেই ভাবতে হয় না। ইংরেজ কবি চিরন্তন সত্যটি বলেছেন—'সুন্দর জিনিস চিরদিনকার আনন্দ'।

প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ

মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বোধ যখন মানুষকে তার নিজের কৃত্রিম পরিবেশ থেকে প্রকৃতির বৃহত্তর, মহত্তর, বিচিত্রতর রূপ-লীলার রাজ্যে নিয়ে যায় তখন তার হৃদয় হয় আনন্দে ভরপুর। আমাদের চারিদিকে জলে, স্থলে, আকাশে গাছপালায় দিনে রাতে ঋতুতে ঋতুতে যে রঙবদলের পালা চলে ভাবুককে তা মুগ্ধ করে; প্রকৃতি তার কাছে মনে হয় জীবন্ত।

শীতের আড়ষ্টতা কেটে গেলে গাছপালায় যে সজীব প্রাণের বিকাশ দেখা দেয় তার মধ্যে রয়েছে উদ্ভিদের শ্যামল উচ্ছ্বাস। কচি পাতায় ডালপালা ভ'রে যায়, কুঁড়ির প্রাচুর্য আসে শাখায় শাখায়, যেন সাজের উৎসব। তারপর আসে পুষ্প সমারোহ। প্রকৃতি যেন যৌবনলীলায় মেতে ওঠে। এ দৃশ্য কাকে না মুগ্ধ করে!

ফুলের পর আসে ফলের ফসল। আসে গ্রীষ্ম ঋতুর খামখেয়ালি, ঝড় বাদলের পাগলামি, বজ্রবিদ্যুতের শাসন তর্জন। নীরব শান্ত প্রকৃতি কখনও কখনও অকস্মাৎ রুদ্র রূপ ধারণ করে। নিবিড় কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলে, গাছপালা মাতে ঝড়ের নৃত্যে, বিদ্যুতের সোনার চাবুক পড়ে কালো ঘোড়ার পিঠে, দিগদিগন্ত কাঁপে তার গর্জনে। প্রকৃতিতে নটরাজের এই রুদ্র রূপ ভাবুকের মনে আনে বিস্ময়মাখানো পুলকের অনুভূতি।

গর্জনের পর আসে বর্ষণের পালা। নীলাঞ্জন মেঘমালায় গগন আচ্ছন্ন; বনভূমি শ্যাম ও বর্ষণ প্রতীক্ষায় শিহরিত। উল্লসিত কবির মন প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হয়ে ময়ূরের মত নেচে ওঠে। প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মন অদৃশ্য নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

শরতের রূপ শুভ্র নির্মল; পুঞ্জ পুঞ্জ নবনীতশুভ্র মেঘ, নির্মল নীল আকাশে রঙের দীপ্তি, শিউলি ও কাশফুলের শুভ্র কোমলতা, কর্পূরের প্রলেপ মাখানো জ্যোৎস্নাকিরণ, শিশিরবিন্দুর ঝলমল, সোনালি রবির আলো, সব মিলে শরৎ-প্রকৃতির একটি সাত্ত্বিক মধুর রূপ ফুটে ওঠে।

হেমন্ত আসে কুয়াসার মিহি আবরণ নিয়ে রিক্তফসল মাঠে, ফলহীন বনানীর ওপর দিয়ে। ঘাসের রঙ, গাছপালার রঙ ক্রমে আসে মলিন হ'য়ে। এর পর আসে শীত, প্রকৃতির মধ্যে দেখা দেয় বার্ধক্যের জড়তা; এ যেন নবজীবন লাভের জন্য প্রকৃতির নীরব সাধনা। শীতের কৃচ্ছ্র সাধনের পর আবার ফিরে আসে বসন্তের পুষ্পবিভোর দিনের স্বপ্ন; কচি পত্রপল্লবের ঝালর ঝুলিয়ে, রঙিন ফুলের নিশান উড়িয়ে উড়িয়ে প্রকৃতি নবজীবনের জয়বার্তা ঘোষণা করে।

এইভাবে বর্ষে বর্ষে নিয়মিতকালে প্রকৃতির রঙমহলে পরিবর্তন ঘটে; ঋতুচক্র নীরবে আবর্তিত হয়ে যায়। দিনরাত্রি, আলো-আঁধার ভাবুকের মন-বীণার তারে বিচিত্র সুরের ঝংকার তোলে। প্রকৃতির এই প্রভাবের কথা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি;
নতুবা দিবসনিশি প্রভেদে এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী।

কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়েছে যাহায় ;
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ ওঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য প্রকৃতির নীরব ভাষা মানুষ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃতি যোগায় তার আনন্দের উপকরণ, তার কল্পনায় লাগায় রঙের ছাপ, তার ব্যথাক্লিষ্ট মনে আনে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ পরশ। বর্তমানের সভ্যমানুষ প্রকৃতির উদার সঙ্গ থেকে দূরে স'রে গেছে। শহর নগরের ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে প্রকৃতির শান্তশ্রীর দিকে চাইবার, তা থেকে আনন্দ অনুভব করার অবসর আর নাই যন্ত্রযুগের মানুষের। প্রকৃতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষ গ'ড়ে তুলেছে যে পরিবেশ তাতে কর্ম-জীবনের চাঞ্চল্য হৈ-হুল্লোড় আছে কিন্তু প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য নাই ; প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে দূরে স'রে এসে মানুষ বড় সুখী হয়নি। প্রকৃতির পূজারী ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ খেদ ক'রে এই কথাটিই বলেছেন :

আমরা হয়েছি অতিমাত্রায় সংসারী
আয় ক'রে আর খরচ ক'রে
আমরা আমাদের সকল শক্তির অপচয় করি ;
প্রকৃতির মধ্যে যে রয়েছে আমাদের সম্পদ
তার দিকে ফিরে তাকাই নে।
তুচ্ছ জিনিসের জন্য
আমরা বিকিয়ে দিয়েছি আমাদের অন্তর।
এই যে সমুদ্র
চাঁদকে বুকে ধরার জন্য তার প্রশান্ত বক্ষ দিয়েছে মেলে ;
এই যে গর্জায়মান বাতাস
ঘুমন্ত ফুলের মতন এখন শান্ত হয়ে পড়েছে ;
এর সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে
আমাদের মনের তার আর এক সুরে বাঁধা নেই ;
এগুলি
আমাদের মনকে আর দোলা দেয় না।

* * *

বর্তমানের মানুষ সত্যই প্রকৃতির প্রভাব থেকে নিজকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়েছে। নিজের জটিল কর্মজীবন ও সমাজ, অর্থোপার্জনের জন্য নিরন্তর কর্মব্যস্ততা, বহুলোকের সমাবেশ, নাগরিক জীবন ও নাগরিক সভ্যতা মানুষকে এমনভাবে নাগপাশে বেঁধে ফেলেছে যে, বাইরের দিকে তাকাবার অবসর আর তার নাই। রেসের ঘোড়ার মত সে ছুটেছে অন্য সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে। কিন্তু আদি থেকেই এরূপ অবস্থা ছিল না।

প্রকৃতি ও মানুষ

প্রকৃতির সঙ্গে আদিমানবের যে খুব একটা মধুর সম্পর্ক ছিল না তা সহজেই অনুমান ক'রে নেওয়া যায়। মানুষ তখন একরকম অসহায়; হিংস্র পশুর সঙ্গে গায়ের জোরে প্রতিযোগিতা ক'রে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, আবার বুদ্ধি বলে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অভাবমুক্ত করার সাধ্যও তার ছিল না। একদিকে বনের হিংস্র জীবজন্তু, অন্যদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতি—এ দুয়ের হাত থেকে তাকে আত্ম-রক্ষা করতে হয়েছে। শীতগ্রীষ্ম, ঝড়বাদল নূতন নূতন সমস্যা নিয়ে আসত তার সম্মুখে। এরই মধ্যে মানুষ যখন নিজেকে এবং তার পরিজনদের কিছুটা নিরাপদ করতে পেরেছিল তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মানসিক অবস্থা তার গ'ড়ে উঠেছিল। রুদ্ররূপ তার মনে জাগিয়েছে ভয়ও বিস্ময়, ললিত মধুর রূপ জাগিয়েছে আনন্দ।

পাহাড় পর্বতের গুহা ছেড়ে এসে মানুষ যখন নিরাপদ আরণ্যক জীবন গ'ড়ে তুলেছিল তখন থেকে প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ কেবল ভীতির নয়, কেবল প্রীতিরও নয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মধ্যে দাবাগ্নি যখন লেলিহান জিহ্বা দিয়ে বনের পর বন ভস্মসাৎ ক'রে ফেলত অসহায় মানুষ সেই প্রচণ্ড সুন্দর ভয়াল মূর্তি দূর থেকে নিরীক্ষণ করত; ঝড়ঝঞ্ঝা গাছপালা ভেঙেচুরে তার পর্ণকুটির তছনছ ক'রে দিয়ে যেত, প্রভঞ্জনের এই রুদ্ররূপের প্রতি ছিল তার ভয়; নিবিড় কালো মেঘ থেকে বজ্র গ'র্জে পড়ত বৃক্ষচূড়ায়, প্রাণান্ত ঘটাত মানুষের—মানুষ সমীহ করত একে কোন এক শক্তিমান পুরুষের ক্রোধের দীপ্ত প্রকাশ মনে ক'রে। আবার, সন্ধ্যাকাশের শান্ত উদাস গাম্ভীর্য, ঊষার নির্মল তরুণ স্নিগ্ধরূপ প্রকৃতির কল্যাণময় মধুরভাবের আভাস নিয়ে আসত মানুষের মনে। তখন প্রকৃতি ছিল মানুষের জীবনকে ঘিরে; সৃষ্টির শিবশক্তি ও রুদ্রশক্তি, পালনকারী প্রভাব ও ধ্বংসকারী তেজ

উভয়ের সঙ্গেই মানুষ পরিচিত ছিল। প্রকৃতির রুদ্রশক্তিকে প্রসন্ন করার জন্য মানুষ পূজা নিবেদন করেছে, শান্ত শ্রীময়ীরূপের প্রশস্তি গেয়েছে আনন্দিত কণ্ঠে।

ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে আসতে মানুষ যখন নিজের জীবনযাত্রা নিরাপদ ও শোভন ক'রে এনেছিল তখন প্রকৃতির রুদ্ররূপকে ভয় করার তার বিশেষ কারণ ছিল না। প্রাচীন ভারতের আরণ্যক সভ্যতার মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের যে নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল এমন আর কোন মানবজাতির ইতিহাসে হয়েছে কিনা সন্দেহ। এখানে প্রকৃতি হয়েছিল মানুষের পরম মিত্র, তার আনন্দের অংশীদার, তার দুঃখের সান্ত্বনাস্থল।

তারপর ক্রমে আরণ্যক সভ্যতার পরিবতে গ'ড়ে উঠল নগর সভ্যতা। মানুষের জীবনযাত্রা হ'তে লাগল জটিল কর্মবহুল। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রাধান্য স্থাপন করেছে অনেকখানি; প্রকৃতির রুদ্রশক্তিকে সে আর ভয় করে না, কতক শক্তিকে সে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত নিজের সেবার কাজে লাগিয়েছে। সহরবাসী মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে আগের মত সম্পর্ক আর নাই। এমন লোকও বিরল নয় যে সারা জীবনে কোন দিন নক্ষত্রভরা নীরব আকাশের দিকে চেয়ে দেখেনি, সূর্যাস্তের সময়কার নীরব বিদায়দৃশ্য ও বর্ণের সমারোহ প্রত্যক্ষ করেনি, উষাকালের স্নিগ্ধ মনোরম সৌন্দর্য অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেনি, গাছপালার পত্রপল্লবে উচ্ছ্বাসময় শ্যামলতা দেখে চোখের তৃপ্তিসাধন করেনি।

এর ফলে কি আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় বস্তুতান্ত্রিক হ'য়ে জীবনকে একঘেয়ে ও সরসতাহীন ক'রে ফেলিনি? জার্মানীর সাম্রাজ্যনির্মাতা কর্মদক্ষ রাজনীতিবিদ ভন্ বিস্মার্ক শেষ বয়সে কাইজারকর্তৃক পদচ্যুত হয়ে যখন তাঁর পল্লীতে নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন তখন প্রকৃতির দিকে তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়ে। জীবনের সায়াহ্নে তাঁর মর্মস্থল ভেদ ক'রে দীর্ঘশ্বাসসহ যে কথাকয়টি বেরিয়ে এসেছিল তা যেমন সত্য, তেমনি করুণ। বসন্ত সমাগমে তাঁর বাংলোর সম্মুখস্থ গাছপালা কচি চিক্কণ সবুজ পাতায় ঝলমল ক'রে উথলিত হ'য়ে উঠেছে দেখে উল্লসিত বৃদ্ধ খেদ ক'রে বলেছিলেন—হায়! প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য আগে কোনদিন চেয়ে দেখিনি। জীবনের মূল্যবান দিনগুলি বৃথা নষ্ট করেছি; আর তো ফিরে পাবার উপায় নাই!

সুখদুঃখ

সুখ এবং দুঃখ উভয়ই অনুভূতির ব্যাপার। বাইরের অথবা ভিতরের কোন সাড়া বা উত্তেজনা মনে যে আলোড়ন জাগায় তারই প্রকাশ দেখি সুখ দুঃখের অভিব্যক্তিতে। বয়স্ক মানুষের জীবনে এর সাড়া এবং প্রকাশ উভয়ই হয় অত্যন্ত জটিল। কিন্তু, ইতর প্রাণী ও শিশুর জীবনে এর সরল রূপটি চোখে পড়ে।

পশুর জীবনে

পশুর জীবনে প্রবৃত্তির তাড়না একান্ত প্রবল; প্রবৃত্তির তাগিদে প্রবৃত্তি কর্তৃক চালিত হয়েই জীব সবরকম আচরণ ক'রে থাকে। প্রবৃত্তির স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই কোন আবেগ সার্থকতা লাভ করলে তা সাময়িক তৃপ্তি আনে, উত্তেজিত হয়ে পরিতৃপ্ত না হলে পীড়া দিতে থাকে। ক্ষুধার্ত জীব যখন উদরপূর্ণ ক'রে আহার করে তখন ক্ষুৎ-প্রবৃত্তি তৃপ্ত হওয়ার দরুণ যে সুখ বা আরাম অনুভব করে, তা তাদের আচরণ দেখে অনুমান করা সহজ। তেমনি ক্ষুধায় কাতর হলে হাবভাবে জীবের অস্বস্তির প্রকাশ বোঝা যায়। মৌলিক প্রবৃত্তির সার্থকতায় যে তৃপ্তি ও ব্যাহত হওয়ায় যে অস্বস্তি তা হল নিম্নস্তরের অনুভূতি। কিছুটা উন্নত ধরণের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় কতক জীবের বিশেষ করে স্ত্রী-জীবের, সন্তান হারাণোর দুঃখ-প্রকাশে। যে সকল জীব তাদের সন্তান কিছুদিন পর্যন্ত নিজেরা পালন করে তারা সন্তান হারা হলে কাতরশব্দ ও ব্যথাপ্রকাশক হাবভাবের ভিতর তাদের দুঃখের অভিব্যক্তি বোঝা যায়। কুকুর বিড়াল, গরু ঘোড়ার সন্তান বিয়োগজনিত দুঃখের প্রকাশ এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত যে, অনুভূতিশীল মানুষের মনে তা সমবেদনা জাগিয়ে তোলে।

দেহের পীড়নজনিত কষ্ট পশুপক্ষী কাতরশব্দ ক'রে প্রকাশ ক'রে থাকে। সে চীৎকারশব্দ তাদের স্বাভাবিক শব্দের চেয়ে পৃথক; শুনলেই বোঝা যায় তা ব্যথা-প্রকাশক কিনা। জীবের অঙ্গহানি ঘটানো মানেই তাকে ব্যথা দেওয়া কিন্তু শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে গিয়ে টিকটিকি যখন স্বেচ্ছায় তার লেজ খসিয়ে ফেলে পালিয়ে যায় এবং তার বিচ্ছিন্ন লেজটি আছাড়িবিছাড়ি করতে থাকে তখন ব্যথা অনুভব করে কে? লেজটি? না, টিকটিকি? হয়ত কেউই না। 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' যখন সবই শেষ হতে

বসে তখন অর্ধেকখানি ত্যাগ ক'রে বাকিটা বাঁচানো বুদ্ধিমানেরই কাজ। তাই টিকটিকির লেজাংশ বর্জন করা বোধ হয় প্রকৃতির শেখানো কৌশল। স্থূল প্রবৃত্তির অতৃপ্তি, অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তির ব্যাঘাত এবং দেহের নিপীড়ন— ইতর প্রাণিজগতে দুঃখবোধ জাগিয়ে তোলার এই কয়টি হল উপায়। মানুষ মনোময় জীব। তার জীবনে সুখ দুঃখের উপায় এবং প্রকাশ হয়েছে বিচিত্র এবং ব্যাপক।

মানুষের জীবনে

শৈশবে মানুষ যে ধরণের সুখ দুঃখের প্রকাশ দেখায় ইতর প্রাণীর সুখ দুঃখের সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য নাই। ক্ষুধায় কাতর হলে শিশু কাঁদে, ক্ষুধার নিবৃত্তি হলে শান্ত হয়। শিশুর কান্না তার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আবেদনমাত্র। দৈহিক কষ্ট অনুভব করলে তা সে প্রকাশ করে কাতরোক্তি বা মূক অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে শিশু দৈহিক কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করে। ক্রমে বয়স্ক লোকদের আচরণ দেখে সে শেখে যে, দৈহিক কষ্টে কান্নাকাটি না ক'রে নীরবে তা সহ্য করাই আত্মমর্যাদার পরিচায়ক। শিশু, বালক ও কিশোরের জীবনে কামনা বাসনার বিষয় বস্তুতে বিশেষ জটিলতা নাই, কামনার পরিধি বেশী বিস্তৃত নয়। কিন্তু, তাদের এই চাওয়া পাওয়ার সরল সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কামনা এমন তীব্র যে, ছোট্ট বাসনাটুকু পূর্ণ হ'লে যেমন তাদের আনন্দের অবধি থাকে না, তেমনি তা পূর্ণ না হলে দুঃখবোধ অত্যন্ত কঠোর হয়ে বুকে বাজে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সুখ-দুঃখ' কবিতায় শিশুমনের এই রহস্যটি জীবন্ত ক'রে তুলেছেন ঃ যে মেয়েটি স্নানযাত্রার মেলায় তালপাতার বাঁশি কিনেছে তার মত আনন্দোৎফুল্ল আর কেউ নয়।

শৈশবে ও বাল্যে

আজকে দিনের মেলা-মেশা
যতই খুসি যতই নেশা,
সবার চেয়ে আনন্দময়
ঐ মেয়েটির হাসি
এক পয়সায় কিনেছে ও
তালপাতার এক বাঁশী।

বাজে বাঁশি, পাতার বাঁশি
আনন্দের স্বরে
হাজার লোকের হর্ষ-ধ্বনি
সবার উপরে।

আবার যে-ছেলেটি একটি পয়সার অভাবে তার মনের মতন জিনিসটি কিনতে পারেনি তার মনের দুঃখের সীমা নাই।

আজকে দিনের দুঃখ যত
নাইরে দুঃখ উহার মতো
ঐ যে ছেলে কাতর চোখে
দোকান পানে চাহি!
একটি রাঙা-লাঠি কিন্‌বে,
একটি পয়সা নাহি।

শৈশব, বাল্য, কৈশোর ছাড়িয়ে মানুষ যখন বয়স্ক সত্তা লাভ করে এবং ক্রমশঃ সংসার আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তখন থেকে সুরু হয় মানুষের জীবনব্যাপী সংগ্রাম, দুঃখকে জয় ক'রে সুখ লাভের সংগ্রাম।

বয়স্কমানুষের জীবনে

সমগ্র মানুষের গতিশীল জীবন ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নানারূপ বিচিত্র কর্মকোলাহলের মধ্য দিয়ে মানব যাত্রী সুখের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। এই চলার বিরাম নাই, উদ্যমের শিথিলতা নাই। সুখ কোথায়? কি করলে মানুষ সুখের সন্ধান পাবে? স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি সার্থকতা লাভ করলেই মানুষের তৃপ্তি; কিন্তু এ তৃপ্তিও স্থায়ী নয়, এ লাভ করার পথে প্রতিবন্ধকও অনেক। যার জীবনে যে প্রবৃত্তিটি প্রবল তার প্রেরণায় মানুষ কাজে উদ্বুদ্ধ হয়; প্রতিবন্ধক দূর ক'রে, বাধাবিপত্তি জয় ক'রে সে সাফল্যের আনন্দ লাভ করার জন্য ধাবিত হয়। সংসারী মানুষ সবাই অর্থোপার্জন ক'রে নিজের পরিজন নিয়ে সুখে বাস করতে চায়। এ কামনাকে শক্তি যোগায় অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তি, যৌনপ্রবৃত্তি, যূথ-প্রবৃত্তি। মানুষ চায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা, যশ, প্রতিপত্তি। আত্মজাহির ও আত্মপ্রাধান্য প্রবৃত্তি রয়েছে এ কামনার মূলে। বাসনা সার্থক করার পথে প্রতিবন্ধক আসে অন্য মানুষের কাছ থেকে, মানুষের গড়া সমাজের কাছ থেকে,

নির্মম প্রকৃতির কাছ থেকে। বাসনা পরিতৃপ্ত হওয়ায় সে আনন্দ লাভ করে, তা ব্যাহত হওয়ায় দুঃখে তার অন্তর ভ'রে ওঠে। আবার, যে আনন্দ সে পায় তাতেই তার মন তৃপ্ত থাকে না ; আরো বেশী আনন্দ, আরো বেশী প্রতিপত্তি, আরো বেশী সম্পদ—এই আরোর কামনা মানুষকে শান্তি দেয় না। 'যারে বাঁধি ধ'রে তার মাঝে আর রাগিণী খুঁজিয়া পাই না'—এই হল বাসনা মরীচিকার পিছনে মানব মনের চিরন্তন ধাওয়ার স্বরূপ। কামনার সামগ্রী যতক্ষণ আয়ত্ত না হয় ততক্ষণই তা একান্ত কাম্য আকর্ষণের বস্তু ; তা অধিগত হলে মানুষ তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না, আবার ব্যগ্র দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেয় সম্মুখের দিকে, বলে—এ তো পেলাম, আরো বেশী চাই।

মানুষের বাসনার নিবৃত্তি নাই ; ফুটা-পাত্রে জল ঢেলে তা পূর্ণ ক'রে রাখার কিংবা আগুনে ঘৃত নিক্ষেপ ক'রে তা শান্ত করার চেষ্টা যেমন বৃথা সুখের সন্ধানে ছুটে সুখ লাভ করার প্রয়াসও তেমনি নিষ্ফল। অভাব থেকে দুঃখের উৎপত্তি। মানুষ নিজেই জানে না কি পেলে তার অভাব মিটবে ; অভাব তার মনের চিরন্তন স্বভাব—যতই লাভ করুক অভাব তার কিছুতেই ঘুচবে না, সুতরাং দুঃখও তার নিঃশেষ হয়ে যাবে না। তবে কি জীবন কেবলই দুঃখময় ? না, তাও নয়।

মেঘ ও রৌদ্রের মত মানুষের জীবনে দুঃখ ও সুখ দুইই পাশাপাশি রয়েছে। সুখ না থাকলে কেবল একটানা দুঃখের ভার বহন ক'রে মানুষ বেঁচে থাকতে পারত না। সুখের আস্বাদন মানুষ কিছুটা পায় বলেই অধিকতর সুখের আশায় দুঃখকেও সে শান্ত চিত্তে বহন করতে পারে।

দুঃখ এড়াবার উপায় কি ?

দুঃখ পীড়াদায়ক, সুখ আনন্দদায়ক। মানুষ দুঃখ এড়াতে চায়, তাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য তার অন্তহীন প্রয়াস। কিন্তু এর উপায় তো সে জানে না। সাধারণ মানুষ তার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানে না, কোন্ শক্তি কোন্ প্রেরণা তাকে কামনা বাসনাময় কর্মের পথে চালিয়ে নিয়ে যায় তার কোন খোঁজখবর সে রাখে না। বিকসিত পুষ্পের সৌরভ প্রকাশের মত মানুষের অন্তরের রঙিন কামনা বাসনা সার্থকতা লাভের জন্য উন্মুখ হ'য়ে

ওঠে; প্রবৃত্ত হয় সে নানা কাজে এবং এইভাবেই সুখ দুঃখের আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই যাহা পাই তাহা চাই না॥

সুখ-মরীচিকার পিছনে আত্মজ্ঞানান্ধ মানুষ এমনি ক'রেই তৃষ্ণার্ত হ'য়ে ছুটে বেড়ায়। আত্মজ্ঞানী প্রজ্ঞাশীল সাধক জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে দুঃখের কারণ নির্ণয় করেছেন আর মানুষকে দিয়েছেন সেই পথের সন্ধান যা অনুসরণ ক'রে চললে দুঃখের জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব। তাঁদের উপদেশের সারকথা হল—নিবৃত্তি পরমাগতি; বাসনার নিবৃত্তি ঘটলে দুঃখের হবে অবসান, কেননা বাসনাই তৃষ্ণা জাগিয়ে রাখে মনে। কেউ উপদেশ দিয়েছেন নিকাম কর্ম অনুষ্ঠান করতে অর্থাৎ বাসনা চরিতার্থ হোক্ বা না হোক্, লাভ বা লোকসান, জয় বা পরাজয় যাই হোক না কেন কিছু দ্বারাই বিচলিত না হতে। এ সকলের মূল কথা হল নিজের মনকে আত্মবশে রাখতে পারলেই তবে মানুষ দুঃখযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু এর চেয়ে কঠিনতর কাজ মানুষের পক্ষে আর কিছু নাই। আদিম প্রবৃত্তি-গুলি চিরন্তন আবেগ ও তীব্রতা নিয়ে নগ্নরূপে প্রকাশ পেতে চায়। মনকে তারা মুহূর্তের জন্য শান্ত হতে দেয় না। বুদ্ধি ও সংযমের শৃঙ্খলে প্রবৃত্তি-গুলিকে বদ্ধ ক'রে রেখে জ্ঞানী মানুষ মনকে নিজের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করে। গীতাতে অর্জ্জুনের মত শক্তিমান ব্যক্তিও বলেছেন, বায়ুকে দমন ক'রে রাখা যেমন কঠিন মনকে বশ করাও তেমনি দুরূহ। শ্রীভগবান একথা স্বীকার করেছেন এবং এর উপায় নির্দেশ ক'রে বলেছেন, 'একথা সত্য যে, মন চঞ্চল ব'লে তাকে বশ করা কঠিন। কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়।' এই দুঃসাধ্য সাধনের জন্য যুগ যুগ ধ'রে কতক মানুষ নানাভাবে সাধনা ক'রে চলেছে, কিন্তু সমগ্রভাবে মানব জাতির দুঃখত্রাণের সমস্যার কোন সমাধান হয়নি, হওয়া সম্ভবপরও নয়।

পৃথিবী-জোড়া মানুষের জীবন ধারা লক্ষ্য করলে মনে হয় সকল দেশেই মানুষের জীবন যেন সুখের সন্ধানে এক অন্তহীন অভিযান। এই অভিযানে

দুইটি বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ পৃথক প্রণালী অবলম্বিত হয়েছে। কতক চিন্তাশীল অন্তর্দর্শী মানুষ সুখের সন্ধান করেছেন মানসজগতে, অন্তর-লোকে। তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন আধ্যাত্ম সাধনার পথে। নিজেদের সাধনার দীপ্তিতে, জ্ঞানের আলোকে তাঁরা অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মানুষকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ, বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়াস, যীশু, চৈতন্য, ভারতবর্ষের সাধুসন্ত, পরমহংসদেব প্রভৃতি এই আধ্যাত্ম-পথের পথিক।

দ্বিতীয় প্রণালীর অভিযানের পরিচয় পাই সমগ্রভাবে মানুষের জাগতিক সুখসমৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টার মধ্যে। মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলেছে; অধিকতর সুখ সমৃদ্ধির কামনায় স্থাপন করেছে রাজ্য, সাম্রাজ্য; দেশ জয় ক'রে অন্যের সম্পদ আহরণ করেছে কিন্তু তবু আশা মেটেনি। বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে নিজের সেবায় লাগিয়েছে, জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে সে অনেকখানি আধিপত্য স্থাপন করেছেন; রাজতন্ত্র ভেঙে সে স্থাপন করেছে গণতন্ত্র, মানুষের অভাব মোচনের জন্য চলেছে বিশ্বব্যাপী কর্মতৎপরতা। মানুষ ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি করেছেন। বিলাসব্যসনের সামগ্রী তৈরি করেছে প্রচুর ও অভিনব, কিন্তু জাগতিক ঐশ্বর্য মানুষের সকল দুঃখের অবসান ঘটাতে পারেনি। সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই মানুষের মনের অভাব মেটে না; এমন সময় আসে যখন পার্থিব ঐশ্বর্যকে ধূলিমুষ্টির মত তুচ্ছ মনে ক'রে সে অপার্থিব ঐশ্বর্যের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তখন তার অন্তর থেকে ধ্বনিত হয়—

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ অন্তর্যামী
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান মম মন তোমারে চায়।

* * *

যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে।
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়
মনে মনে মন তোমারে চায়॥

—গীতাঞ্জলি

নিছক বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে যে মানুষের কাম্য পরম শান্তি মেলে না তা মানুষ উপলব্ধি করে যখন দেখে যে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার বস্তু পূর্ণমাত্রায় ভোগ ক'রেও তার মনের অভাব দূর হয় না। তার মনে হয় শান্তি এখানে নাই, আছে অন্য কোথাও। একজন ইংরেজ কবির 'ঈশ্বরের দান' শীর্ষক একটি কবিতায় এই ভাবটি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ ঈশ্বর পরিপূর্ণমাত্রায় কতকগুলি সম্পদ মানুষকে দান করলেন—এগুলি হল সৌন্দর্য, পার্থিব সম্পদ, যশ, প্রতিপত্তি। সব দান ক'রে নিজের কাছে তিনি রেখে দিলেন শান্তি ; তাঁর উদ্দেশ্য এই যে, সংসারে মানুষ যাবতীয় কাম্য সম্পদ ভোগ ক'রেও যখন তৃপ্ত হবে না তখন মানসিক শান্তির সন্ধানে সে একদিন সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টার কাজেই উপনীত হবে।

সাধারণ সংসারী মানুষের জীবনে

আধ্যাত্ম জীবনের ক্ষুরধার পথে যাঁরা আত্মজয়ের সাধনায় অগ্রসর হন তাঁরা ভাগবত-জীবনই পরম কাম্য বলে গ্রহণ করেছেন। জাগতিক সম্পদ ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু পরিপূর্ণ মাত্রায় উপভোগ ক'রেও যাঁরা পরমা শান্তির জন্য আকুল হন তাঁদের জীবনেও যে মহত্তর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই দুই শ্রেণীর লোকসংখ্যাই নিতান্ত কম ; দুঃখদৈন্য অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করে, জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করার সামর্থ্য নাই এমন সাধারণ সংসারী মানুষই তো জগতে বেশী। এরূপ মানুষের জীবনে দুঃখকে যথাসম্ভব পরিহার ক'রে সুখ লাভ করার উপায় কি? সংসারী মানুষের পক্ষে এ এক সনাতন সমস্যা।

সুখ লাভের উপায় কি

মৌমাছি যেমন বিভিন্ন ফুল থেকে সংগৃহীত বিন্দু বিন্দু রস মধুতে পরিণত করে, সংগৃহীত ফুলের রেণু নিজের জারক রসের সাহায্যে পরিণত করে মোমে, মানুষের সেরূপ কোন যান্ত্রিক কৌশল জানা নাই যা দিয়ে দুঃখকে সে সুখে পরিণত করতে পারে। সুখ এবং দুঃখ অনুভূতির বিষয় ; মানুষের কামনা বাসনার সার্থকতায় সুখ, তার ব্যর্থতায় দুঃখ। যার জীবনে এই দ্বন্দ্ব যত প্রবল তার সুখ ও দুঃখের অনুভূতিও তত তীব্র। সংসারী মানুষ প্রধানতঃ কিভাবে নিজের-তৈরি দুঃখজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তা জানা থাকলে অনেক সময় এই দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত এড়িয়ে

যাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থপরতা—এই তিনটি মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব

মানুষের সবগুলি প্রবৃত্তি সমানভাবে প্রবল থাকে না; কোন একটি প্রবৃত্তি প্রধান হ'য়ে সার্থকতা পেতে চায়। এই প্রধান প্রবৃত্তির স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষের জীবনকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করে। এই প্রধান প্রবৃত্তি অন্য কোন প্রবৃত্তির কাছ থেকে বাধা পেলে সুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। যেমন—একব্যক্তি হয়ত সাহিত্য সাধনায় আনন্দ পায়; সাহিত্যক্ষেত্রে যশোলাভ তার প্রধান কাম্য। দাম্পত্যজীবনে পত্নীর প্রতি তার নিবিড় অনুরাগ আছে কিন্তু পত্নী তার প্রধান কাম্য উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন। শুধু তাই নয়, নিজের আচরণ দ্বারা গৃহে সে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা স্বামীর কর্মসাধনাকে অনুপ্রাণিত না ক'রে পদে পদে ব্যাহত করে। প্রীতি ও আত্মমর্যাদা তাকে স্ত্রীর প্রতি কঠোর হতে দেয় না, অথচ স্ত্রী তার প্রধান সুখের প্রতিবন্ধক। এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে স্বামী বেচারার মানসিক অবস্থাটি চিন্তা ক'রে দেখুন দেখি। তার প্রধান প্রবৃত্তি সার্থকতা লাভ করে যে কাজের ভিতর দিয়ে তা ছেড়ে দিলে জীবন তার কাছে হয়ে পড়ে অনেকটা নীরস ও অর্থহীন; আবার, যে এতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাকে আঘাত দিয়ে বা পরিত্যাগ ক'রেও তার সুখ নাই, কেননা তার সঙ্গে রয়েছে প্রীতির সম্বন্ধ জড়ানো! এরূপ অবস্থায় মানুষের মনের রুদ্ধ ব্যথা গুমরে উঠতে থাকে। জীবন তার কাছে মনে হয় বেসুরো বাদ্যযন্ত্রের মত:

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবন-বীণা ঠিক স্বরে তাই
বাজে না রে।
এই বেসুরো জটিলতায়
পরাণ আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।

জীবন-বীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।

—গীতাঞ্জলি

*　*　*

যে ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা একটি কাল্পনিক নমুনা মাত্র। নানাভাবে এ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হতে পারে কামনা বহুল মানুষের মনে। বুদ্ধিমানের পক্ষে অন্তর্দ্বন্দ্ব যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই সমীচীন। আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা নিজের প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে এমন একটি সুসমঞ্জস ভাব গ'ড়ে তোলা উচিত যাতে অন্য প্রবৃত্তির সহযোগিতার ভিতর দিয়ে প্রধান প্রবৃত্তি কল্যাণকর সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

দুরাকাঙ্ক্ষা

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে দুর্লভ কোন কিছু লাভ করার জন্য উৎসাহিত করে। এই প্রবৃত্তি প্রধান হলে মানুষ তা সফল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম সাগ্রহে বরণ ক'রে নেয়। কিন্তু আকাঙ্ক্ষার বস্তু যদি তার সাধ্যায়াত্ত না হয় তবে নিষ্ফলতার ব্যথায় জীবন হয় পরিপূর্ণ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির ব্যর্থ-বাসনার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইংরেজি সাহিত্যে মহাকবি ব'লে গৌরব অর্জন ছিল তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সাধ। যশ ও প্রেমের সন্ধানে মত্ত হয়ে ছুটাছুটি ক'রে কবি 'আত্মবিলাপে' তাঁর জীবনের ব্যর্থ পরিণতির দুঃখ প্রকাশ করেছেন :

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?

*　*　*

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

কর্মজীবনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তাই আশাভঙ্গ জনিত দুঃখ—তার মাত্রা কম হোক বা বেশী হোক—মানুষের জীবনে চিরদিনই থাকবে। কিন্তু আশা পূর্ণ না হলে হা হুতাশ ক'রে মনস্তাপ প্রকাশ করা কিংবা মনোদুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়া বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিচায়ক নয়। মানুষের কর্মের সাফল্য শুধু তার নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে না, পারিপার্শ্বিক প্রভাব এবং অপরাপর লোকের সহযোগিতার দ্বারা তা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া মানুষের শক্তি অসীম নয়। একথা স্মরণ রেখে মানুষ তার ভাগ্য বা ভাগ্যবিপর্যয়কে গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ আত্মশক্তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে সচেতন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অসাধ্য সাধনের আশায় উৎফুল্ল হন না, ব্যর্থতায়ও বিচলিত হন না। সাংসারিক জীবনে শান্তিলাভের জন্য মানসিক স্থৈর্য এবং জীবনের প্রতি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের একান্ত আবশ্যক।

স্বার্থপরতা

সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে আত্মমুখী ক'রে তোলে এবং আত্মসুখের সন্ধানে সে যতই সুখ সুখ ক'রে আকুল হয়ে ছোটে, সুখ ততই থাকে তার নাগালের বাইরে। মানুষের বৃহত্তর জীবপ্রবাহ থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। অপরের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ দেবার তার অবসর নাই, ইচ্ছাও নাই। অপরের উন্নতিতে সে হয় ঈর্ষান্বিত। ঈর্ষা মানুষের বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখে যে তুষের আগুন তা কেবল তাকে দগ্ধ করে, জীবনে শান্তি দেয় না।

পক্ষান্তরে, মানুষের জীবনধারা লক্ষ্য ক'রে দেখা যায় সুখলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে স্থির ক'রে নিয়ে মানুষ যদি সুখের জন্য লালায়িত হয়ে না ওঠে তবেই বরং সুখ লাভ করা সহজ হয়। শুনতে আপাত অসম্ভব মনে হলেও একথাটি নিঃসংশয়ে সত্য যে, মানুষ অপরের সুখবিধানের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেই নিজে প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারে, অন্যথায় নয়। নিজে দুঃখ ভোগ ক'রেও অপরের মঙ্গল সাধন করায় যে অনাবিল আনন্দ মেলে তার তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্বার্থের জীবনযাত্রায়

সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হালকা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।'

জীবমানব ও পরমমানব

সৃষ্টির লীলায় যে প্রথম প্রাণকণিকার আবির্ভাব ঘটেছিল ধরণীতে আজ তারই বিচিত্র প্রকাশ দেখি পৃথিবীর সর্বত্র। বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সেই প্রাণপ্রবাহ তৃণলতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষীর জীবনে ব্যাপ্ত হয়েছে; সৃষ্টির চরম পরিণতি দেখা দিয়েছে মানুষের স্তরে এসে পৌঁছে। সমগ্র সৃষ্টি ব্যপে যে চৈতন্য বিরাজিত রয়েছে তার প্রকাশ সর্বত্র সমান নয়। ইট পাথর প্রভৃতি জড়পদার্থে চৈতন্য রয়েছে সুপ্ত, উদ্ভিদে তার ক্ষীণ প্রকাশ, পশুপক্ষীতেও এ প্রকাশ অস্পষ্ট, মানুষে চৈতন্যের প্রকাশ দীপ্ত ও উজ্জ্বল। প্রাণকণা থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণের অভিব্যক্তির গতি দেখতে পাই বহির্মুখী; জীবদেহের নানা পরিবর্তন সাধন করতে করতে প্রাণ যেন বিকশিত পল্লবিত হয়ে উঠেছে। মানুষের পর্যায়ে পৌঁছে এই অভিব্যক্তির গতি হয়েছে অন্তর্মুখী। যে সৃষ্টিব্যাপার চলেছিল প্রাণীদের দেহকে নিয়ে তার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মানুষের মনের দিকে। মানুষ নিজের অন্তরে এক রহস্যময় নূতন জগতের সন্ধান পেল যা তার পূর্বে বা পরে অন্য কোন জীব পায়নি।

আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে যে প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের আলোচনা করেছি সেগুলি মানুষের জীবধর্ম থেকে সঞ্জাত। ঐ সব প্রবৃত্তি কমবেশী মাত্রায় অন্যান্য জীবের মধ্যেও বিদ্যমান, এমন কি উদ্ভিদের মধ্যেও তার কোন কোনটির অতিক্ষীণ আভাস দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি, জ্ঞান ও কর্মশক্তি প্রয়োগ ক'রে মানুষ নিজের জীবনযাত্রায় যে উন্নতি সাধন করেছে অন্য জীবের পক্ষে তা সম্ভবপর হয়নি। তবু সে জীব; জীবধর্ম তার মধ্যে সক্রিয় রয়েছে, অন্যান্য জীবের মতই সে প্রবৃত্তির প্রেরণায় জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে চলেছে। কাজেই তাকে বলা যায় জীবমানব।

কিন্তু, শুধু জীবধর্ম পালন ক'রে, বুদ্ধিমান, শক্তিমান জীবের মত ধরণীর ধূলি আঁকড়ে বাস করতেই তার তৃপ্তি নাই। সে অন্তররাজ্যে যে নূতন আলোকের সন্ধান পেয়েছে তা দিয়ে নিজেকে আর বিশ্বজগতকে ভাল ক'রে বুঝতে চায়। 'সে বুঝেছে, সে সহজ নয়, তার মধ্যে একটা রহস্য আছে, এই রহস্যের আবরণ উদ্ঘাটিত হতে হতে তবে সে আপনাকে চিনবে।'

অন্তরের এই আলোকতীর্থযাত্রী যে মানুষ সে জীবমানবেরই আরেকটি রূপ ; তাকে বলি পরমমানব।

সৃষ্টির মধ্যে সকল জীবজন্তু যেমন জীবনযাত্রা নির্বাহ ক'রে চলেছে নিজ নিজ প্রবৃত্তির তাগিদে ও দেহের শক্তিতে, মানুষও তেমনি চলেছিল। প্রবৃত্তির নির্দিষ্ট আবেগের মধ্যেই জৈব প্রয়োজনে তার জীবন ধারণ, আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সাধারণ পশুর মত। কিন্তু যখন তার নিজের অন্তরকে ও বহির্বিশ্বকে জানার কৌতূহল জেগে উঠল তার চিত্তে, তখন জীবনের একটা দিক তার কাছে হয়ে দাঁড়াল পরম আকর্ষণের বিষয় ; তার ক্ষুদ্র জীবনের বাইরে যে অনন্ত জীবন বিস্তৃত রয়েছে, সেই জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। স্থূল প্রবৃত্তি দ্বারা আবদ্ধ জীবের সঙ্গে মানুষের কি তফাৎ রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে একটি রূপক প্রয়োগ করে তা বর্ণনা করেছেন ঃ

'জীবকে কল্পনা করা যাক, সে যেন জীবযাত্রার একটা রেলগাড়ির মধ্যেই জন্মায়, বেঁচে থাকে এবং মরে। এই গাড়ি সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ির নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ির সীমার মধ্যে তার আহার বিহারের সন্ধান চলছে নিচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধাবিপত্তি যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানালা পর্যন্ত পৌঁছায় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।

'মানুষ খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানালা। জানতে পেরেছে, গাড়ির মধ্যেই সব-কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ হয়েও যা বাকি আছে তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না। যেটুকু আলো গাড়ির প্রয়োজনের পক্ষে যথোপযুক্ত, বাইরে তারই বিস্তার অবাধ অজস্র। সেই আলো তাকে ডাকে কেন। ঐ প্রয়োজনাতীত বাইরেটার প্রতি উদাসীন থাকলে ক্ষতি কী ছিল। দিন তো চলে যেত, যেমন চলছে হাজার লক্ষ প্রাণীর। কিন্তু, মানুষকে অস্থির ক'রে তুললে যে। বললে, তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতিনির্দিষ্ট সাম্রাজ্য প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সে জয় করতে বেরুল আপন স্বরাজ। এই

জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই ; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।'

মানুষ সাধারণ জীবের মত কেবল জীবযাত্রা নির্বাহ ক'রেই ক্ষান্ত হল না ; তার জীবন ধারণের পক্ষে যা একান্ত আবশ্যক নয়, যা তার প্রবৃত্তির সার্থকতা আনে না, আনে বরং ত্যাগের দুঃখ তা লাভ করাই মানুষ পরম কাম্য ব'লে গ্রহণ করে। বিশ্বসংসারের যাবতীয় সাধারণ প্রাণী প্রবৃত্তির তাড়নায় একই বাঁধা পথে একই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় জীবন যাপন ক'রে চলেছে—আত্মরক্ষা, আহার সংস্থান, সন্তান উৎপাদন, এই হল তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এতেই তারা ব্যাপৃত কিন্তু মানুষ বুঝতে পেরেছে তার জীবনের মধ্যে একটি গভীর অর্থ আছে। এই রহস্যের উদ্ঘাটন না করলেও তার জীবন যাপনে কোন অসুবিধা নাই, এই অর্থ উপলব্ধি করতে পারলে পশুবৎ বেঁচে থাকার সংগ্রামে সে যে অধিকতর শক্তি অর্জন করতে পারবে তাও নয়, তবু অজানার আকর্ষণ তাকে শান্তি দেয় না। তার মনে জেগে ওঠে মহাকৌতূহল ; নিজেকেই সে প্রশ্ন করে—এই যে রূপরস শব্দ গন্ধময় পৃথিবী, কে একে তৈরি করল - কোন্ শক্তি জীবকুলকে নির্দিষ্ট পথে চালিয়ে নিয়ে চলেছে ? কি তার উদ্দেশ্য ? আমি কে ? কোথায় ছিলাম, কেন এলাম, কোথায় যাব এই নশ্বর দেহের বিনাশ ঘটলে ? কি আমার জীবনের লক্ষ্য, স্থূল বিষয়বস্তু ভোগ এবং মৃত্যুবরণ, না জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ত্যাগের ভিতর দিয়ে অমরত্ব অর্জন ?

মানুষের হয়েছে দুই জগৎ নিয়ে সমস্যা ; স্থূল দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জীব-জগৎ, জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত অন্তর জগৎ—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন ধর্মমত, পূজাপার্বণ, আচার অনুষ্ঠান। বর্তমান জীবনের সুখদুঃখই তার কাছে চরম নয়, ধরার ধূলিতে তার জীবনের পরিসমাপ্তিও নয় ; বর্তমান জীবনের ভিতর দিয়ে উন্নততর জীবনে উপনীত হবার কামনা জেগে থাকে তার মনে। সে তখন বিচার করে কোন্‌টি পাপ কোনটি পুণ্য অর্থাৎ কোন্‌টি তার মহত্তর জীবন লাভের সহায়ক, কোনটি অন্তরায়। পশুর জীবনে পাপপুণ্য বোধ নাই, তার আছে কেবল জীবধর্ম পালন করার পথে সুবিধা বা অসুবিধা। সে অসুবিধা বর্জন ক'রে সর্বদা সুবিধা গ্রহণ করতে চেষ্টিত ; মানুষ অনেক সময় এই সুবিধা হেলায় তুচ্ছ

ক'রে ত্যাগের পথে তপস্যার পথে অগ্রসর হয় মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ;

'মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব, আর-এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়েয় সামঞ্জস্য চেষ্টাই মানবের মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত। নইলে কেবল সুবিধা-অসুবিধা প্রিয়-অপ্রিয় প্রবল থাকত জৈবিক ক্ষেত্রে জীবধর্মে ; পাপ-পুণ্য কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো অর্থই থাকত না।'

জীবমানব

আমরা দেখি, মানুষ দলবদ্ধ হ'য়ে সংসারে বাস করে। সহজাত প্রবৃত্তি তাদের সকল কাজের তাগিদ জোগায় ; কামনা বাসনা সুখদুঃখ দ্বারা তারা উদ্বেলিত। তাদের মধ্যে জীবধর্ম প্রবল। জীবধর্মবশেই মানুষ জীবিকা উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়, পুত্রকলত্র পরিজন নিয়ে গৃহস্থালি করে, সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা গ'ড়ে তোলে। জীবরূপে মানুষ বাঁচতে চায় সুখে স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে সমৃদ্ধিতে। কিন্তু এতেই মানুষের পরিচয় শেষ হল না।

মানুষের প্রধান পরিচয় তার চেতনা শক্তির দীপ্তিতে, তার মনের সম্পদে। জ্ঞানের আলোক সম্পাত ক'রে সে বিশ্বের রহস্য জানতে চায়, অন্তরে অন্তরে সে অনুভব করে এমন এক শক্তি যার পূর্ণ স্বরূপ সে উপলব্ধি করতে পারে না শুধু বুঝতে পারে যে তা অতীব রহস্যময় এবং তারই লীলা পরিব্যাপ্ত রয়েছে সর্ব চরাচরে। স্থূল জগতের ওপারে যে সূক্ষ্ম চিন্ময় জগৎ, যেখানকার শক্তিতে সমস্ত বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত, তার স্বরূপ জানবার বাসনায় কৌতূহলী মানব সকল প্রকার জাগতিক সুখ সম্পদ বিসর্জন দিয়েছে, এমন কি মৃত্যুবরণ করেছে হাসিমুখে। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ আরো কত কত সাধু মহাজন মানুষের অন্তর্লোকের পথে পরম শক্তির সন্ধান পেয়েছেন যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—যার আলোকে সবকিছু আলোকিত। ভারতের ঋষি স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত সর্বশক্তির আধার পরম পুরুষের দর্শন পেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্বজনকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে

জ্যোতির্ময়। তারে জেনে, তাঁর পানে চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

* * *

মানুষ ও বিশ্বরহস্য

সৃষ্টির লীলায় মানুষের স্থান কোথায় এবং মানুষ কি ভাবে সৃষ্টি-রহস্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে তা না বললে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দুইটি পৃথক পথে মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির মূল রহস্য অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে—একটি যোগ সাধনার পথ, অন্যটি বিজ্ঞান সাধনার পথ। অনুসন্ধানের পথ এবং প্রক্রিয়া পৃথক হলেও সাধনার নিষ্ঠা ও গভীরতা দুইপক্ষেরই সমান।

যোগীর দৃষ্টিতে

আত্মজ্ঞান লাভের সাধনায় যোগী সন্ধান পেয়েছেন চৈতন্যময় পরম-শক্তির যার বিভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাই বিশ্বময়। এই শক্তিকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম। সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মময়, সর্ব বস্তুতে ব্রহ্ম বিরাজিত। কবির কথায়—

আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধর-সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে।

সর্বত্র বিরাজিত থাকলেও চৈতন্যের প্রকাশ সৃষ্টির সর্বস্তরে সমান নয়। জড় বস্তুর মধ্যে চেতনা সুপ্ত ; এই সুপ্ত চেতনার বিকাশ হয়েছে প্রাণীর স্তরে। সেখানে চৈতন্যের প্রাণময় অজস্র বিকাশ লক্ষ কোটি জীবজন্তুর মধ্যে। মানুষের মধ্যে এই প্রাণচৈতন্য আর এক ধাপ উপরের স্তরে উঠে সজ্ঞান মানসিক শক্তিরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে ব্রহ্মচৈতন্য যথাক্রমে সুপ্ত, অর্ধ সুপ্ত, প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তিরূপে বিরাজিত, এবং ক্রমশঃ একস্তর থেকে অন্যস্তরে স্ফুরিত বিকশিত হয়ে উঠেছে। যোগী তাই বিশ্বে দেখেন ব্রহ্মশক্তির লীলা ; পূর্ণ চেতনা শক্তি জড়বস্তুর মধ্যে লুকোচুরি খেলার মত সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয় আবার বিভিন্ন স্তরে স্তরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মের এই লীলাকে বলেছেন double ladder of consciousness অর্থাৎ মই বেয়ে চৈতন্য শক্তির

একবার অবতরণ আবার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে উর্ধ্ব দিকে আরোহণ। ভগবান খণ্ডের মধ্যে, সীমার মধ্যে আত্মবিকাশ ক'রে বিভিন্ন অবস্থায় তার রসাস্বাদ ক'রে, লীলাবৈচিত্র্য ঘটিয়ে আবার অখণ্ডতা, অসীমতা ও অনন্তের মহিমা প্রকাশ করছেন। নিম্ন চেতনার স্তরে বিচিত্র রূপান্তর সৃষ্টি ক'রে তার ওপর ক্রমে ক্রমে পর্যায়ে পর্যায়ে উর্ধ্ব লোকের আলোকপাত করা—এই চলেছে ভগবানের আলো-আঁধারের খেলা। এই লীলার নিম্নপ্রান্তে সুপ্তচৈতন্য জড়পিণ্ড আর সর্বোচ্চ প্রান্তে পূর্ণ চৈতন্য মানব।

বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন তাঁর স্থূল দৃষ্টিতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ক'রে। যেখানে তাঁর স্বাভাবিক চোখের শক্তিতে কুলোয় নি সেখানে সূক্ষ্ম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তৈরিকরেছেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যন্ত্র, আবার দূরের জিনিসকে নজরের সীমানায় আনার জন্য নির্মাণ করেছেন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর যন্ত্রচক্ষু। নিশ্চল প্রস্তরখণ্ড বা যে-কোন জড়পদার্থ যা খালিচোখে দেখে মনে হয় প্রাণের লেশমাত্রচিহ্নহীন তার মধ্যেও বিজ্ঞানী দেখতে পেয়েছেন অতিসূক্ষ্ম প্রাণকণিকার সদাচঞ্চল অবিরাম নৃত্য। চৈতন্যকণা সেখানে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজিত। উদ্ভিদের জীবনে এই চেতনা যেন কিছুটা জেগে উঠেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন উদ্ভিদের সুখদুঃখ আনন্দবেদনার অনুভূতি আছে, তাদের মধ্যে চৈতন্য অর্ধজাগ্রত। প্রাণীর জীবনে এই চেতনা জাগ্রত হয়েছে; প্রাণশক্তি প্রবৃত্তির আবেগে অন্ধবেগে চালিত হয়, প্রাণী প্রবৃত্তির বশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে নিখুঁতভাবে কিন্তু তার মধ্যে উচ্চস্তরের মানসশক্তি বা পূর্ণচৈতন্য শক্তি নাই; এ শক্তি লাভ করেছে মানুষ; মানুষ তাই প্রবৃত্তির আবেগকে মনন শক্তি দিয়ে দমন করতে পারে যা পশুর পক্ষে অসাধ্য। তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে, মানুষ মাত্রেই পূর্ণচৈতন্যের অধিকারী হয়েছে; তা মোটেই নয়। কেবল মানুষেরই এ শক্তি লাভের সামর্থ্য আছে এইমাত্র কিন্তু বাস্তব জগতে আত্মচেতনাশক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত। মানুষ সাধনা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ অপসারণ করতে করতে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে। এইটেই মানুষের পরমগৌরব।

মানুষ ও তার জীবন

বিজ্ঞানীর তথ্যবিচার দিয়েই বুঝি, কিংবা সাধকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই অনুভব

করি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বিশ্বজগতে এক অতি বিস্ময়কর শক্তির লীলা চলেছে এবং চেতনাশক্তি জড় থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্য দিয়ে মানুষের স্তরে এসে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। প্রাণিজগতে স্ফুরিত হয়েছে প্রাণশক্তি; মানুষ তার চেয়ে এক ডিগ্রী উপরের শক্তি, মনঃশক্তি লাভ করেছে। এই শক্তি দিয়ে সে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যও তার কাছে প্রতিভাত হয় এরই মাধ্যমে। মানুষের পর্যায়ে এসে তাই সৃষ্টির লীলায় অভিনবত্ব দেখা দিয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে—মানুষ কি তার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন? কোন্ শক্তি তাকে আত্মবিকাশে ও জীবনগঠনে সহায়তা করে তা কি সে জানে? কি তার জীবনের আদর্শ, তার কাম্য লক্ষ্য?

মানুষের জীবন ও সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুইটি আদিম প্রবৃত্তি—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যৌনকামনা—হয়েছে তার সমাজ জীবন ও সভ্যতার মূল ভিত্তি। আদিমানব আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে তার বুদ্ধি ও দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করেছে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে; এর ভিতর দিয়ে সে তার অহংবোধ পরিতৃপ্ত করতে ও আত্মসুখ বৃদ্ধি করতে চেষ্টিত হয়েছে। চলেছে জীবন সংগ্রাম, শুধু বন্য পশু ও প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গেই নয়, তারই মত অন্য মানবের সঙ্গেও। তার উদরপূরণ ও দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের পথে যারা হয়েছে প্রতিবন্ধক তাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের বিনষ্ট করেছে, অথবা নিজে দুর্বল হলে নিজেই বিনষ্ট হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সে উদ্ভাবন করেছে হাতিয়ার যা দিয়ে শত্রুকে সে সহজেই কাবু করতে পারে। যৌনপ্রবৃত্তির বশে সে বংশবৃদ্ধি করেছে। প্রথম অবস্থায় হয়ত তার পরিবার বা পারিবারিক বন্ধন ছিল না, বন্য পশুর মত দৈহিক শক্তিতে অন্য প্রতিযোগীকে পরাস্ত ক'রে সে যৌনকামনা তৃপ্ত করেছে; সন্তানপালনের দায় পুরুষের ছিল না।

কালক্রমে মানুষ পরিবার স্থাপন ক'রে বাস করতে সুরু করেছে—সে হয়েছে পরিবারের ভর্তা, পরিজনদের পালক। আত্মরক্ষা ও জীবিকা অর্জনের সুবিধার জন্য মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করার সুবিধা উপলব্ধি করেছে, গড়ে তুলেছে কুল বা গোষ্ঠী ও সমাজ। একত্র বসবাস করতে গিয়ে মানুষ বুঝেছে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য এমন

কি জীবন বিসর্জন দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। সে বুঝেছে উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষের জীবনে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি পারিবারিক সামাজিক জীবনে কোন ক্ষেত্রেই কল্যাণকর নয়। কতকগুলি বাধানিষেধ, নিয়মকানুন সে প্রবর্তন করেছে সমষ্টির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ নিয়ম কেউ ভঙ্গ করলে, অপরাধীকে শাস্তিদানের জন্য, সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য—এক কথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য সমাজে এক-জনকে প্রধানপদে নির্বাচিত করা হয়েছে। এইভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রপতি বা রাজা প্রজার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ করতেন এবং প্রজাসমষ্টির কল্যাণের জন্যই তা ব্যয় করা হত।

মানুষ এইভাবে তার জীবন ও সমাজব্যবস্থা নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করতে করতে সভ্যতার পথে এগিয়ে চলল। সমাজ বা রাষ্ট্রের সেবা এবং আত্মো-ন্নতির জন্য কাজের বিভাগ ক'রে নেওয়া যে সুবিধাজনক তা মানুষ বুঝতে পেরেছিল এবং সমাজে গুণ অনুসারে কর্মের বিভাগও ঘটেছিল ধীরে ধীরে। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে চারবর্ণের লোক—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র। আধ্যাত্মসাধনার পথে তপস্যার আলোকে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, জীবনের এই ঊর্ধ্বলোকের দিকে যাঁদের মানসিক প্রবণতা তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। সাধন ভজন, তপস্যা আরাধনা, অধ্যয়ন অধ্যাপনা এই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

সমাজে কাজের বিভাগ

শত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়ের। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য—এর ভার নিয়েছিল বৈশ্য; সাধারণ কাজে নিযুক্ত থাকত শূদ্রগণ। এইভাবে সকলের সমবেত চেষ্টায় মানুষ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের উপায় উদ্ভাবন করেছিল এবং ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। ভারতীয় সমাজে এই উন্নতি হয়েছিল সুসমঞ্জস; জাগতিক সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টা যেমন চলেছিল, তেমনি চলেছিল আত্মজ্ঞান লাভের সাধনা। ভারতীয় সভ্যতায় ধর্মের স্থান সকলের উপরে।

* * *

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের জীবন ও সভ্যতার গতি প্রায় একই পথে প্রবাহিত হয়েছে, তবে ভিন্নরূপ প্রাকৃতিক পবিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থায় ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনের মূল উপাদান সকলেরই একই প্রকার—সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রাণশক্তি, মনঃশক্তি সকলের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। জীবনে বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণ করায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনে প্রাণশক্তি ও মনঃশক্তি বিকাশে তারতম্য ঘটেছে; কোন জাতি প্রাকৃত শক্তির অনুশীলন করেছে ইহ জগতে প্রাধান্য লাভের জন্য, ভোগের ভিতর দিয়ে কামনা বাসনা চরিতার্থ করার উৎসাহে; তারা স্বভাবত বাস্তবনিষ্ঠ, কর্মঠ, জাগতিক উন্নতির জন্য উদ্যমশীল আবার কোন জাতি শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করাই জীবনের পরম কাম্য ব'লে গ্রহণ করেছে। এরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় ও অন্তর্মুখী।

যুগের পর যুগ পার হয়ে গেছে, মানুষের জয়যাত্রা চলেছে অব্যাহত। এগিয়ে চলার পথে সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ বর্তমান যুগে এসে উপনীত হয়েছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের জীবনযাত্রায় পার্থক্য ঘটেছে অনেক, কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনের ধারা গেছে বদলে কিন্তু মানুষের অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে এমন চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেনি যার ফলে আত্মজ্ঞান লাভ সহজতর হতে পারে।

জীবনের আদর্শ

আজ পৃথিবী জুড়ে দেখি মানুষের মেলা, বিভিন্ন জাতির মানুষ। নিজ নিজ জাতীয় জীবন সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টায় তারা কর্মব্যস্ত রয়েছে। জাগতিক জীবনকে শোভন, সুন্দর, শক্তিশালী ও অভাবমুক্ত করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সকল দেশেরই অধিকাংশ মানুষ জীবনের পার্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই ব্যস্ত, স্বার্থের সন্ধানে তারা ছুটাছুটি করে, প্রবৃত্তি তাদের প্রধান চালক। তবু, সকল সমাজেই এমন লোক কিছুসংখ্যক আছেনই যাঁরা উন্নততর আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে যত্নবান, যদিও তাঁদের ধর্মসাধনার পথ ও প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব; নিজের মানসিক গঠন ও চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী সে নিজের জীবনের আদর্শ স্থির ক'রে নিতে পারে; কাজেই সকলেই যে একই আদর্শ গ্রহণ করবে তা কখনই আশা করা যায় না। তবে মানুষের

সকল প্রকার শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশেই যে মানবজীবনের সার্থকতা একথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এই বিকাশ লাভের উপায় স্বরূপ আমরা চারিটি ধারার উল্লেখ করতে পারি—এগুলি হ'ল জ্ঞান, শক্তি, শ্রী ও কর্ম।

জ্ঞান

জ্ঞানের আলোতেই অন্তর হয় আলোকিত; অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানুষের মন তমোগুণে আবৃত, তাতে চেতনার দীপ্তি নাই, কর্মের উদ্দীপনা নাই। এ জ্ঞান শুধু অধ্যাত্ম জ্ঞান নয়, শুধু জাগতিক বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানও নয়; এ দুয়ের সংমিশ্রণ। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব। জ্ঞানদানের জন্য সমাজে শিক্ষায়তন আছে কিন্তু শুধু পার্থিব জীবনসম্বন্ধীয় শিক্ষা মানুষকে জীবনের পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারে না; এবং যে মানুষ পরমার্থ জীবন সম্বন্ধে উদাসীন সে অন্তরের দীনতারই পরিচয় দেয়। আমাদের কাম্য বাইরের জ্ঞান ও ভিতরের জ্ঞান।

শক্তি

কি কর্মজীবনে, কি ধর্মজীবনে শক্তি বিনা কোন ক্ষেত্রেই সফলতা লাভ হয় না। কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা মানসিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। বুদ্ধিদীপ্ত মন দ্বারা পরিচালিত শক্তিকে আত্মোন্নতির এবং অপর সকলের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করাতেই শক্তির সার্থকতা। আসুরিক শক্তি নয়, মানুষের অকল্যাণকর ধ্বংসকারী শক্তি নয়, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের জন্য জ্ঞানোজ্জ্বল শক্তিই আমাদের কাম্য।

শ্রী

জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়ে জীবনে ফুটে ওঠে মহিমান্বিত সুষমা; কর্ম হয় নিখুঁত ও নয়নের আনন্দদায়ক। আমাদের কর্মজীবনে প্রতিনিয়ত দেখতে পাই, সৌন্দর্যবোধহীন, সুরুচিবিহীন মানুষের কাজ প্রীতিদায়ক হয় না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে সৌন্দর্যবুদ্ধির বিকাশ একান্ত আবশ্যক।

কর্ম

কর্মকে আশ্রয় ক'রে কর্মের ভিতর দিয়েই জ্ঞান শক্তি ও শ্রীর প্রকাশ ঘটে। অনলস কর্ম ব্যতীত মানুষের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই, সে উন্নতি পার্থিব জগতেই হোক বা আধ্যাত্মিক জগতেই হোক।

আমরা দেখতে পেয়েছি প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য চারবর্ণের লোকের কাজের বিভাগ হয়েছিল, সকলের সমন্বয়ে সমাজ-দেহ ছিল সম্পূর্ণ। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আমরা এই চারিটি ধারার পরিচয় পাই ; এদের সব কয়টির সুসমঞ্জস বিকাশসাধন মানবজীবনের কাম্য লক্ষ্য। ব্রাহ্মণের শুভ্র জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের দীপ্ত তেজ, বৈশ্যের শ্রীময়ী সম্পদ, শূদ্রের অক্লান্ত নিষ্ঠাময় কর্ম—এ সবের সমন্বয়েই মানুষের জীবন হয় শোভন ও সার্থক।

মানুষের ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিবর্তন চলেছে ; একটি ক্ষুদ্র জীবকোষকে অবলম্বন ক'রে যে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল এই ধরার কোন এক স্থানে, আজ তা সমগ্র বসুন্ধরায় ব্যাপ্ত হয়েছে নানা আকৃতিতে, নানা রূপে, নানা বৈচিত্র্যে। সৃষ্টির এই শোভাযাত্রায় মানুষ এসেছে সকলের পরে। ভূতত্ত্ব-বিদের হিসাবে পৃথিবীর বয়স দুশো কোটি বছর কিন্তু এই বয়সের তুলনায় মানুষের অস্তিত্বকাল কত অল্প 'পৃথ্বী-পরিচয়' পুস্তকে শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত একটি গাণিতিক উপমার ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন :

'মনে করা যাক সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর উপর যে সব ঘটনা ঘটেছে তার ধারাবাহিক ইতিহাসের একটি 'ফিল্‌ম্' দেখাতে ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে ; প্রথম বারো ঘণ্টায় যে বিস্ময়কর দৃশ্য আমাদের চোখে ফুটে উঠবে তার সবই আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত, তারপর ৮ ঘণ্টায় দেখতে পাওয়া যাবে কী ক'রে প্রাণের প্রথম প্রকাশ হোলো একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন ক'রে, অগ্রসর হয়ে চলেছে। তারপর তিন ঘণ্টা পনর মিনিট সময়ের মধ্যে দেখতে পাওয়াযাবে অতি অদ্ভুত আকারের সব অতিকায় জীবজন্তুর আবির্ভাব ও দেহের শক্তি হাড়মাংসের অসামঞ্জস্য থাকায় তাদের লোপ পাওয়া। তারপর ৪৫ মিনিটের ভিতর দেখা যাবে স্তন্যপায়ী জীবের প্রকাশ। এই ফিলম্ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড আগে দেখব মানুষের প্রথম আবির্ভাব ; ভূতত্ত্বের ২৪ ঘণ্টায় মানবজাতির ইতিহাসের অস্তিত্ব পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি নয়।'

তবু এই সময়ের মধ্যে মানুষ প্রকৃতির ওপর এবং মানস রাজ্যে যে শক্তির

পরিচয় দিয়েছে তা চিন্তা করলে মনে হয় অতি বিস্ময়কর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে তার সম্মুখে। আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করতে করতে হয়ত এক সময় মানুষ একদিকে প্রাকৃতির শক্তির ওপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করবে, অন্যদিকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে উর্ধ্বলোকের মনঃশক্তিতে, যে শক্তি সমগ্র বিশ্বজগতের মূল কারণ। দুই দেশের দুইজন মহামনীষীর চিন্তাধারায় আমরা এইরূপ ভাবী মানবের আভাস পাই।

অতিমানব

জার্মান দার্শনিক নীট্শে বলেছেন সুপারম্যান অর্থাৎ অতিমানবের কথা। তিনি ধারণা করেছেন অভিব্যক্তির পথে মানুষ চরম শক্তির অধিকারী হয়ে জগতে প্রভুত্ব করবে, প্রাণশক্তিতে সে হবে অপ্রতিহত। নীট্শের অতিমানবের চরিত্রে কোমলতার স্থান নাই; সে দুর্বলের দুর্বলতায় অবজ্ঞার হাসি হাসে, দুর্বলকে চূর্ণ করতে তার দ্বিধা নাই; শক্তিমানের সঙ্গে লড়ার জন্য সে প্রস্তুত। করুণা, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি নীট্শের কাছে অবজ্ঞার উপহাসের বস্তু। নীট্শের অতিমানব আসুরিক শক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত—আত্মপ্রতিষ্ঠা, শক্তির বিকাশ, অপরিমেয় ভোগ তার জীবনের লক্ষ্য, নীতিবোধের কোন বাধানিষেধ সে মানতে রাজী নয়। জার্মানীর জাতীয় আদর্শই যেন নীট্শের আদর্শ অতিমানবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

দিব্যমানব

শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, বিবর্তনের পথে মানুষ চেতনাশক্তির প্রাধান্যে ক্রমশ পশুশক্তি বর্জন ক'রে ভাগবত শক্তির অধিকারী হবে, সে পরিণত হবে দিব্যমানবে। সে দিন হয়ত সুদূর ভবিষ্যতের অন্ধকারে নিহিত কিন্তু আজ যা ভবিষ্যৎ, মানুষের অন্তহীন যাত্রাপথে তাই একদিন বর্তমান হয়ে উঠবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাইকোলজি অব্ সোস্যাল ডেভেলাপ্মেন্ট গ্রন্থে দিব্যমানবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রমোদকুমার সেন লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দ' পুস্তক থেকে ভারতীয় সাধকের কথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি।

'আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন ঋষিই হইতেছেন দিব্যমানব জাতির অগ্রণী। তাঁহার যেমন উর্দ্ধের জ্ঞান আছে, তেমনি তিনি উপলব্ধি করেন সৃষ্টির রহস্য।

তাঁহার মধ্যে খণ্ডতা নাই, কিন্তু তিনি খণ্ডতার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন। ক্ষণে ক্ষণে অবতারের জন্ম সম্ভব নয়; ঋষিই হইতেছেন মানুষের উর্দ্ধায়ণের দিশারী। অবতার যেমন মানুষের জীবন চেতনার রূপান্তরের জন্য মানবরূপ গ্রহণ করেন, ঋষি মানবের মধ্যে থাকিয়া রূপান্তরে সহায়তা করেন। ঋষির মধ্যে ভাগবত জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে স্ফুরণ হয় তাহাতে সাধারণ মানুষের তাহা উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় এবং মানুষের হৃদয়ে মহা-ঐক্য ও মহাছন্দের আভাস আসে। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক সমষ্টি গড়িতে পারেন ঋষি। এই কারণেই ভারতে ঋষি আদৃত; ভারতের লোক ঋষির আশ্রয় লইয়াছে এবং ঋষির তপস্যায় অমঙ্গল হইতে ত্রাণ পাইয়া আলোর সন্ধান পাইয়াছে। সত্যই, মানবের গুরু এবং দিশারী অহংবুদ্ধি পরায়ণ, দাম্ভিক, ঘোরকর্ম্মা নেতা নহে; বিশ্বপ্রেমিক, উদারহৃদয়, সত্যদর্শী, ভাগবত চেতনার আধার ঋষি—দিব্যমানব। তাঁহার আধারকে কেন্দ্র করিয়া পার্থিব-সত্তার সকল স্তরে ভাগবত সত্তা ও চেতনা-বিকাশের সম্ভাবনা, মানবজীবনের বহু যুগাকাঙ্ক্ষিত দিব্যরূপান্তরের সূচনা।'

মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ ক'রে তার প্রবৃত্তির স্বরূপ অবগত হয়ে তার অতীত জীবনধারা লক্ষ্য ক'রে, তার কামনা বাসনা কোন্ দিকে তাকে চালিত করতে চায় তা দেখে বোঝা যায়, মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে উচ্চতর মানসিক শক্তির যে প্রতিযোগিতা চলেছে তাতে মানসিক শক্তিই জয়ী হয়ে এসেছে; নইলে মানুষের অধ্যাত্মচিন্তা, পরার্থে আত্মদান, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ সম্ভবপর হত না; মানুষ তবে বনমানুষের স্তরেই থেকে যেত। নবভারতের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ধ্যাননেত্রে যে দিব্যমানবের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছেন তা যে বর্তমানের জীবমানবকে পরমমানবের পর্যায়ে নিয়ে যাবে না তা কে বলতে পারে?

দ্বিতীয় খণ্ড

শিশু ও কিশোর

...It is the human being that counts and it counts much more as a child than as a grown-up.

—Jawaharlal Nehru

শিশু ও তার বৃদ্ধি

তুলসীদাস বলেছেন ঃ 'তুলসী, যব জগমে আয়ে সব হসে তুম্ রোয়।' তুমি যেদিন জগতে এলে সেদিন সবাই হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। শিশু পরিবারে আসে পরিজনদের অনিন্দধ্বনির মধ্যে। জন্মমুহূর্ত থেকে তার সুরু হল নূতন স্বতন্ত্র জীবন। কিন্তু তার জীবনের সূত্রপাত হয়েছে এর প্রায় দশ মাস পূর্বে তার মাতৃজঠরে, যে ক্ষণটিতে তার পিতার এবং মাতার দেহনিঃসৃত বীজকণিকার মিলন ঘটেছে জরায়ুর মধ্যে। গাছের বোঁটায় যেমন ফল লেগে থাকে তেমনি ক্ষুদ্র ভ্রূণ জরায়ুর সঙ্গে লেগে থেকে, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে দিনে দিনে বড় হ'য়ে মানুষের আকার ধারণ করেছে। জরায়ুর মধ্যেও শিশু যেন ক্রমবিবর্তনের পথে কতকগুলি স্তর পার হয়ে আসে। প্রথম থেকেই ভ্রূণ মানুষের আকার পায় না। প্রথমে তা দেখতে কতকটা মাছের মত, তারপর পাখীর মত, গরুছাগল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর মত, বানরের বাচ্চার মত, অবশেষে মানুষের মত রূপ ধারণ করে। দুইশো সত্তর দিন বা তার দুইচার দিন কমবেশী সময় শিশু মাতৃজঠরে থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে তার দেহের গড়ন ও যন্ত্রসমূহ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার ফুসফুসের মধ্যে প্রথম বাতাস প্রবেশ করে, নূতন অনুভূতিতে শিশু কেঁদে ওঠে ; তখন থেকেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ সুরু হল এবং একাজ চলবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। শিশুর প্রথম কান্না যেন অসহায়ের আবেদন।

বৃদ্ধির মধ্যে ছন্দ

দিন দিন যেমন শিশু বেড়ে উঠতে থাকে, তার দেহের পুষ্টির সঙ্গে বুদ্ধি ও মনের অন্যান্য শক্তির বিকাশও ঘটে। মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে ; এ বৈশিষ্ট্য কমবেশী পরিমাণে সব মানুষের জীবনেই দেখা দেয়। বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে —যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য, জীর্ণদশা। মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন তার ভাবানুবাদ এই রকম দাঁড়ায় ঃ

প্রথমে সে কচিশিশু
ধাত্রী কোলে কাঁদে ওঙা ওঙা

দুধ খায়, দই বমি করে।
ইস্কুলের ছাত্র তারপর ;
চক্ চক্ করে মুখ প্রভাতবেলায়
নাকে কাঁদে, নাহি যেতে চায়
বিদ্যালয়ে ; থলিটি ঝুলায়ে
কাঁধে, অনিচ্ছুক শামুকের মত
ধীরে যায় বিদ্যালয় পানে।
তারপর প্রেমিকের পালা।
ঘন ঘন ফেলে দীর্ঘশ্বাস
কামারের হাপরের মত ; প্রেয়সীরে
লক্ষ্য ক'রে লেখে সে কবিতা
করুণ উচ্ছ্বাস ভরা। তারপর
সৈনিক জীবন। শপথ গ্রহণ করে
কথায় কথায় ; মুখে গোঁফ
চিতাবাঘ সম। ঈর্ষান্বিত
সম্মানের তরে, কলহে নিপুণ ;
প্রশংসা বুদ্‌বুদ্ লাগি কামানের মুখে
বক্ষ দেয় পাতি।
তারপর বিচারক ; সুগোল উদর,
মাথায় সুন্দর টুপী, ছাঁটা-দাড়ি,
চক্ষে কঠোরতা। কথা বলে বিজ্ঞসম
আধুনিক দৃষ্টান্ত সহিত।
ষষ্ঠস্তর আসে তারপর। শীর্ণদেহ,
চশ্‌মা আসে নাকের ডগায় ; যৌবনের
প্যান্টালুন করে ঢল্‌ঢল্ ক্ষীণ উরু
কোমরের 'পরে ; দৃপ্ত কণ্ঠস্বর
চিঁচিঁ করে শিশুর কণ্ঠের মত।
সর্বশেষ দৃশ্য তারপর। এখানেই শেষ
বিচিত্র জীবন-নাট্য। দ্বিতীয় শৈশব
আসে, বিস্মৃতিতে ভরা—দন্তহীন
দৃষ্টিহীন, স্বাদহীন, সর্বকিছুহীন॥

শেকস্‌পিয়র মানুষের জীবন-পথে সাত অবস্থার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে নানা গবেষণার ফলে শিশু ও কিশোরের দেহের বৃদ্ধি ও মনের বিকাশ কিভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ইংলণ্ডে ৪২ হাজারেরও বেশী শিশু বালকবালিকা ও কিশোর-কিশোরীর এক থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছরের দেহের ওজন ও বৃদ্ধির মাপ নিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে দেখা যায় মানবদেহের ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ছন্দ রয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত মানুষ ঠিক একই ভাবে বরাবর সমান তালে বাড়ে না ; তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের বৃদ্ধিতেও পার্থক্য আছে। পৃথিবীর যে অঞ্চলেই লোক বাস করুক না কেন, বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর ফলে গায়ের রঙে ও গড়নে কিছুটা তারতম্য দেখা গেলেও মানুষের জীবনধারা ও ক্রমবৃদ্ধির সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

দেহের বৃদ্ধি অনুসারে মানুষের জন্ম থেকে বয়স্ক সত্তা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শৈশব, ছয় থেকে এগার বা বারো বছর পর্যন্ত বাল্যকাল, বারো থেকে ষোল বছর পর্যন্ত কৈশোর। দেখা যায়, প্রথম পাঁচ বছরে দেহ যে পরিমাণে বাড়ে পরবর্তী কালে অন্য কোন সময়ে পাঁচ বছর কালের মধ্যে ঐ পরিমাণ বাড়ে না। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের বাড় বেশী, দশ থেকে পনর পর্যন্ত বয়সে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বাড় বেশী, আবার ষোল থেকে দেহের বৃদ্ধিতে ছেলেরা মেয়েদের ছাড়িয়ে যায়।

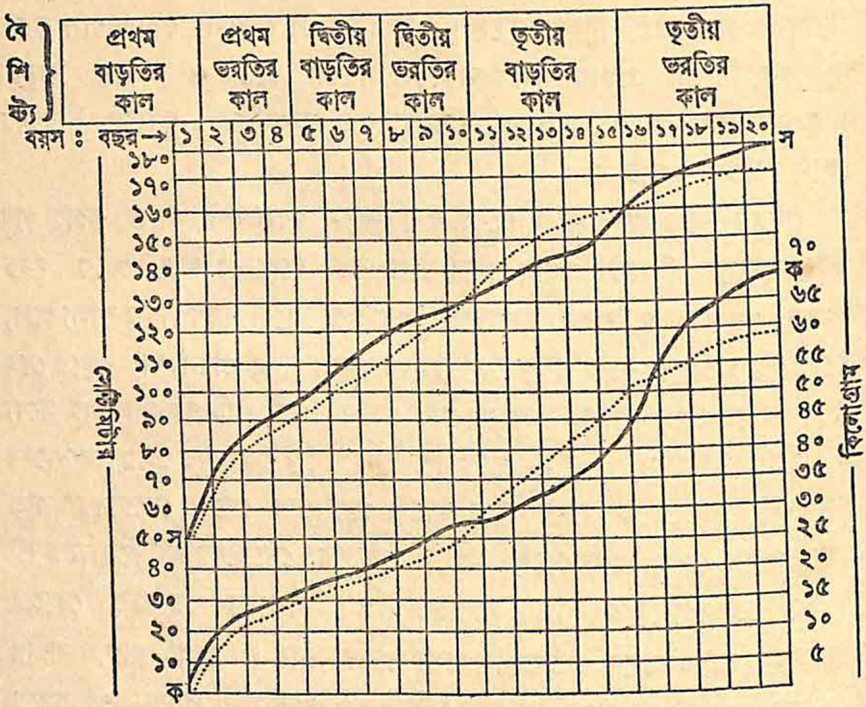
এই তো হল দেহের বৃদ্ধির সাধারণ গতি। বছরের পর বছর দেহের বাড় লক্ষ্য ক'রে আরো কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায়, শরীর কিছুদিন বেশ চটপট বাড়ে তারপর কিছুদিন বৃদ্ধিতে মন্দা পড়ে—এই সময়ে আগের বৃদ্ধিটুকু যেন কায়েম করা হয়। তারপর আবার বৃদ্ধিতে বেগ আসে, তারপর আবার কিছুদিন যায় মন্দগতিতে। এইভাবে এক থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে তিনটি ধাপ দ্রুত-বৃদ্ধি ও তিন ধাপ ধীরবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। দ্রুতবৃদ্ধির সময়কে আমরা বাড়তির ও ধীরবৃদ্ধির সময়কে ভরতির কাল বলতে পারি।

এখানে যে চার্ট * দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যাবে কিভাবে শিশুর বাড়তি ও ভরতির গতি চলতে থাকে। প্রথম বছরে শিশুর বৃদ্ধি হয় খুব

* Creative Education and the Future : O. A. Wheeler. P. 94.

দ্রুত ; তারপর দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত ভরতির কাল, ধীরগতিতে বৃদ্ধি। পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত বাড়তির দ্বিতীয় ধাপ, আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত ধীরগতিতে ভরতির সময়। বাড়তির তৃতীয় ধাপ চলে এগার থেকে পনর বছর পর্যন্ত, ষোল থেকে কুড়ি পর্যন্ত ভরতির যুগ ; তখন বৃদ্ধি চলে ধীর-গতিতে, কৈশোর পার হয়ে বালক বালিকা তরুণ-যৌবনে উপনীত হয়।

দৈহিক বৃদ্ধির ছন্দ



বালক——এক টানা রেখা

বালিকা······বিন্দু-চিহ্নিত রেখা

ক-কিলোগ্রাম : এক কিলোগ্রাম প্রায় ১ সের ৬ তোলার সমান

স-সেন্টিমিটার : দশ সেন্টিমিটার প্রায় ৪ ইঞ্চির সমান

কাচ চারাগাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় গাছের মাথার মুকুলটি এক সময়ে বেশ তাড়াতাড়ি কিছুটা বেড়ে ওঠে ; তখন সে অংশ থাকে কোমল, পাতা চিকণ সবুজ বা রঙিন। তারপর ঐ অংশটুকু শক্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন বৃদ্ধি বন্ধ থাকে। ডাঁটা শক্ত হলে আবার মাথার মুকুল আর এক

ধাপ বাড়ে। শিশুর বৃদ্ধিতেও প্রকৃতির এই কৌশল স্পষ্ট চোখে পড়ে। শিশু প্রথম বছরে বেশ একটু লম্বা হয়ে ওঠে ; পরের তিন বছর দৈর্ঘে বাড়ে কম, দেহটা পুষ্ট হতে থাকে ; যেন মুকুলের ডাঁটা শক্ত হওয়ার যুগ। আবার পাঁচ থেকে সাত এই তিন বছরে শিশু বেশ খানিকটা লম্বা হয়, এটি বাড়তির যুগ। এই বাড়তির সময় শৈশবের মোটাসোটা নাহুসভাব থাকে না, বালক যেন অল্পদিনের মধ্যে রোগাটে হয়ে যায়, মুখ হয় লম্বাটে ধরণের দুধের দাঁত পড়তে সুরু করে এবং সেখানে স্থায়ী-দাঁত ওঠে। মস্তিষ্ক দ্রুত বেড়ে ওঠে, সাত বছর বয়সের মধ্যেই ওজনে প্রায় পূর্ণতা লাভ করে। এই বৃদ্ধির সময় দেহের ঝোঁক থাকে লম্বা হয়ে ওঠার দিকে, রোগ প্রতিষেধ ক্ষমতা থাকে কম। তখন সাধারণতঃ হুপিংকাশি, হাম ও জলবসন্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই সময়ে বালকবালিকাকে শীর্ণ হতে দেখে অনেক মা-বাবা তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এজন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ নাই ; বেড়ে ওঠার সময় দেহের শীর্ণতা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে। ভরতির যুগে বালকের দেহ আবার পুষ্ট হতে থাকে। এই সময় কোন কোন বালকবালিকার টন্‌সিলের অসুখ হতে দেখা যায়, কিন্তু মাংসপেশী বেশ সবল হয়ে ওঠে।

শিশুর ক্রমবিকাশ ও বয়োধর্ম

পুষ্পবিহীন উদ্যানের মত শিশুবিহীন গৃহ একান্তই নিরানন্দময়। পিতা-মাতার অফুরন্ত স্নেহ সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে বিকশিত হয়ে ওঠে। এ স্নেহ স্বভাবজাত। শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু শুধু অন্ধ স্নেহই শিশুকে যথাযথ বিকাশে সহায়তা করে না। এর জন্য চাই শিশুর প্রকৃতি ও স্বভাব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও শিশুকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য ধৈর্য এবং অধ্যবসায়। মানবসভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে যে শিশুর দল তাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং কি করা যেতে পারে তা প্রত্যেক মা-বাবাকে ভেবে দেখতে হবে।

আমাদের দেশে কচি শিশুদের যত্ন পরিচর্যা ও শিক্ষার জন্য কোন রকম সাধারণ শিক্ষালয় নাই ; বাড়িতেও আমরা তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাইনে। গরীবের ঘরে শিশু অনাদরে অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠে, আগাছা যেমন বেড়ে ওঠে কীটপতঙ্গ পশুপক্ষীর অত্যাচার সহ্য ক'রেও ; বিকৃত বিকলাঙ্গ হয় হয়ত। মধ্যবিত্তের মধ্যেও শিশুর জীবন আনন্দময় নয়। তাদের শরীর ও মনের বিকাশের পক্ষে যা সহায়ক হতে পারে এমন জিনিস তারা বেশী পায় না। ধনীর ঘরের তুলাল বেতনভোগী আয়া চাকরের পরিচর্যায় মানুষ হয়ে ওঠে, কিন্তু যেখানে স্নেহশীল পিতার সহানুভূতি এবং বুদ্ধিমতী মাতার সদাজাগ্রত কল্যাণদৃষ্টি নিবদ্ধ নাই, সেখানে কি ভাড়া-করা অজ্ঞ লোকের পরিচর্যা এর অভাব দূর করতে পারে ? তিনচার বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য আমরা কি করি ? তু-একটি কাঠের বা রবারের রঙিন বল, টিনের বাঁশী, কাগজের ফুল আর হোমিওপ্যাথী নক্সভমিকা, ক্যামোমিলা পডোফাইলাম এরূপ গোটাতুইতিন শিশি। এই হল অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকরণ। শিশুকাল থেকেই যে সন্তানের শিক্ষা সুরু হয়ে গেছে সে কথা আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেও জানেন না বা চিন্তা করেন না।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। শিশুর জীবন এবং প্রয়োজন পর্যালোচনা ক'রে সে দেশের শিক্ষাবিদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ ও পিতামাতার এ জ্ঞান থাকা

আবশ্যক ; বিলাতের বিশিষ্ট শিশুমনোবিজ্ঞানী ডক্টর সুজান আইজ্যাক-সের পর্যবেক্ষণ বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছে। এর থেকে শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

ডক্টর আইজ্যাকস্ বলেছেন, শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে দরকার আমাদের স্নেহ এবং সহানুভূতি ; শুধু তাই নয়, এজন্য চাই আমাদের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়। শিশুর মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশের নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানও অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের ওপর একাজের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া চলে না, কেননা সাধারণতঃ যে বয়সে শিশুকে শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তার পূর্বেই শিক্ষার বহু সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

আমাদের ঘরেই শিশু দিন দিন বেড়ে ওঠে বটে, কিন্তু তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারা আছে তা আমরা অনেকেই লক্ষ্য করিনে।

দুই প্রকারে আমরা ভুল করি। আমরা মনে করি কচি শিশুদের মন ব'লে কোন কিছু নাই, দেহের পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখলেই আমাদের কর্তব্য মিটে গেল। তারপর তিনচার কি পাঁচ বছর বয়স হলেই আমরা ধ'রে নিই যে, তারা বয়স্ক ব্যক্তির মতই দায়িত্বসম্পন্ন হয়ে গেছে। দুই বৎসর বয়স্ক শিশুরও যে পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে, তার মা-বাবার প্রতি গভীর এবং তীব্র আবেগ আছে তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। পক্ষান্তরে, শিশু যখন কথা বলতে পারে, আদেশ পালন করতে পারে, কিছু স্বার্থ-ত্যাগ করতে পারে আমরা মনে করি বয়স্কদের রীতিনীতি বুঝে কাজ করার সামর্থ্য তাদের হয়েছে। শিশুর জগৎ যে বয়স্কদের জগৎ থেকে পৃথক সে কথা আমরা ভুলে যাই। শিশুর ক্রমবিকাশে সাহায্য করতে হলে আমাদের জানতে হবে শিশুর মনোরাজ্যের খবর, বুঝতে হবে তার সমস্যা এবং স্নেহ ও ধৈর্য সহকারে তার বৃদ্ধির অনুকূলে সহায়তা করতে অগ্রসর হতে হবে।

শিশুর জন্ম ও প্রথম অনুভূতি

জন্মের পূর্বে যেমন মায়ের সঙ্গে শিশুর দৈহিক এবং মানসিক সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, জন্মের পরও কিছুকাল পর্যন্ত জননীই এর একমাত্র বস্তু, সম্বল বা অবলম্বন। জননী বললে, ঠিক বলা হবে না ; জননীর স্তনের

সঙ্গেই তার পরিচয়, সে চেনে কেবল মায়ের স্তন্যসুধারস ও স্নেহকরুণ হাত দুখানি। কান থাকলেও কানে সে শোনে না, চোখ থাকলেও কোন বস্তুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে না। কিন্তু তার মন অচল হয়ে নেই। সুজান আইজ্যাকস্ বলেছেন, চক্ষু কর্ণ বা গতির মাধ্যমে বাইরের জগতের ধারণা আনার অপেক্ষায় শিশুর মন বসে থাকে না; মন তার মাতৃস্তনে নিবদ্ধ হয়ে সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে; দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি যখন বৃদ্ধি পায় নাই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন দুর্বল, তখন শিশুর মন মুখকে কেন্দ্র ক'রে কাজ করতে থাকে। মুখ তার কেবল পুষ্টি সংগ্রহ করার উপায় নয়, বহির্বিশ্বের প্রথম জ্ঞান অর্জনের উপায়ও বটে। কিছুকাল পর্যন্ত শিশু হাতে যা পায় তাই মুখে পুরে দেয়। মুখ দিয়ে সে কেবল খায় না, মুখ দিয়ে চিন্তাও করে।

ক্রমে শিশুর জ্ঞান মাতৃস্তন থেকে সমগ্র মাতা'তে ব্যাপৃত হয়। মায়ের চোখের চাহনি, তাঁর স্পর্শ, তাঁর কণ্ঠস্বর শিশুকে আনন্দ দেয়, শিশুর ভালবাসা মাতৃস্তন থেকে সমগ্র মাতৃদেহে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুর জ্ঞানের পরিধি বেড়ে চলে।

শিশুর খেলা

শিশুর দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধির পক্ষে খেলা অপরিহার্য। এটি প্রকৃতিরই বিধান। খেলার মধ্য দিয়েই সে বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। উজ্জ্বল বর্ণ, শব্দ, গতিশীল জিনিস তাকে আকৃষ্ট করে। সে শব্দ অনুকরণ করে—তাতেই কথা শেখে, শব্দের সঙ্গে জিনিস মিলিয়ে দেখে জিনিসের নাম শেখে। প্রকৃতির পাঠশালায় তার শিক্ষা সুরু হ'য়ে গেছে। সে চলতে অভ্যস্ত হয় ধীরে ধীরে; প্রথমে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে, পরে দুই পায়ে এক পা, দুপা ক'রে। কোন জিনিস তুলে ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে আনন্দ পায়। এও একটা খেলা; এ খেলার ভিতর দিয়ে জিনিসের ওজন সম্বন্ধে ধারণা ক্রমে গড়ে ওঠে, ছুড়ে দেওয়ায় হাত চালনা করার অভ্যাস হয়। এক বছরের শিশু ছোট ছোট টুকরা জিনিস, যেমন ইঁট পাথরের কুচি, বালি, ধান, চাল প্রভৃতি ছিটাতে খুব পছন্দ করে। ছুড়ে ফেলার সময় তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, হাত ছোড়া আর হাতের মুঠি আল্‌গা ক'রে দেওয়া এ দুটি কাজের মধ্যে সমতা না থাকায় প্রথম প্রথম শিশু যেদিকে জিনিসগুলি ছুড়তে চায় সেদিকে যায় না, এদিকে

ওদিকে পড়ে, কতক বা নিজের গায়ের উপর পড়ে। পরে অবশ্য তার হাত জিনিস ছুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

চঞ্চলতা শিশুর স্বভাবগত। যে শিশু নিরীহ, খেলাধূলায় মোটেই উৎসাহ বোধ করে না, এই রূপ, রস, শব্দ গন্ধময় ভুবনের প্রতিটি জিনিস দেখে বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না তার শারীরিক পুষ্টির অভাব দূর করবার দিকে পিতামাতার নজর দিতে হবে। সুস্থ সবল শিশুর পক্ষে নিক্রিয়তা স্বাভাবিক নয়। যে শিশু মোটেই খেলে না, সে হয় অত্যন্ত জড়বুদ্ধি আর না হয় রুগ্ন। তার দেহ ও মনের বিকাশ স্বাভাবিক হতে পারে না।

ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শিশুর প্রথম পরিচয় তার মায়ের সঙ্গে। মায়ের স্নেহ ও স্তন্য সে তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব'লে মনে করে। সেখানে যখনি কেউ ভাগ বসাতে আসে, শিশু উত্যক্ত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। মায়ের স্নেহকক্ষ থেকে শিশু বিচ্যুত হয় তার পরবর্তী ভাই বা বোনের আগমনে। মনে মনে সে তার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে থাকে। এই ঈর্ষা অনেক সময় এমন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায় যে, বাল্যকাল পার হয়ে গেলেও পিঠাপিঠি ভাইবোনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব থেকেই যায়। আমাদের মা পিসিমারা একথা জানেন; তাই শিশুর আবির্ভাবের দিন তার অগ্রজের শুভেচ্ছা লাভের উদ্দেশ্যে নবজাতকের পক্ষ থেকে উৎকোচ স্বরূপ কিছু খাবার বা খেলনা তাকে দিয়ে থাকেন; বলা হয় 'ছোট ভাইটি তোমার জন্য এগুলি এনেছে।' আমাদের নিজেদের পরিবারে এবং আত্মীয় স্বজনদের পরিবারেও এ রীতি দেখেছি; নিজের শৈশবের কথাটি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

কেবল যে ছোট ভাইবোন এসে শিশুকে মায়ের স্নেহের পূর্ণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তা নয়। শিশু যখন দেখে তার মায়ের স্নেহ-যত্নের অধিকারী সে একাই নয়, তার বাবাও তার অংশীদার সে তখন থেকে মনে মনে পিতার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে।

অন্যের প্রতি ঈর্ষা

বাবার সেবাযত্নের জন্য মা তাকে ফেলে যাবেন বা সে যখন তাঁকে চাইবে তখনি পাবে না, শিশু তা সহ্য করতে চায় না। কোন জিনিস সে যখন দাবী করে, সমস্ত অন্তর দিয়েই করে, তা পূরণে অন্যপক্ষের দেরী তার কাছে অসহ্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে তার দাবী মিটতে পারে, এ বুদ্ধি বা

কালজ্ঞান শিশুর প্রথমে আসে না, প্রত্যেক পিতামাতার এ কথা জানা থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে অজ্ঞতার ফলে আমরা জেদী বা বদমেজাজী বলে শিশুকে ধমকিয়ে তার মুখ বন্ধ ক'রে দিই, তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করি। এর ফল ভাল হয় না।

কোন উৎস থেকে প্রবাহিত জলস্রোত রুদ্ধ ক'রে অন্তর্মুখী ক'রে দিলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ে শেষে কোন স্থানে তা আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর মানসিক বৃদ্ধির প্রবাহ সম্বন্ধেও একথা খাটে। বৃদ্ধির এই ধারাকে স্বাভাবিক পথে চালিত করা শিক্ষক এবং প্রধানতঃ পিতামাতার কর্তব্য। এর ব্যতিক্রম হলে শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে মানসিক বা দৈহিক বিকৃতিতে। শিশুমনোবিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে পেয়েছেন যে, শিশুর কতকগুলি আচরণ যেমন শয্যামূত্র, আঙুল চোষা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করার অভ্যাস, করমৈথুন, তোতলামি বা বাক্যহীন হয়ে যাওয়া এ সবের প্রকৃত কারণ শিশুর মানসিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে না পারার ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে প্রসূত।

শিশুর মিথ্যা বলার অভ্যাস

সকল শিশুই কোন-না কোন সময়ে মিথ্যা কথা বলে। এ মিথ্যার প্রকার ভেদ আছে। এর মূল কারণ দেখতে হবে। নেহাৎ শিশু অবস্থা থেকে যখন বাস্তব ও কল্পনার পার্থক্য বুঝতে পারে না কিম্বা তার কল্পনা-বিলাসী মন কিছু ভাণ করতে ভালবাসে, তখন সে মিথ্যা কথা বলে। সে হয়ত মুখে 'হালুম' শব্দ ক'রে বলে—আমি বাঘ হয়েছি। এ ভাণ মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে না। একটু বেশী বয়সে শিশু মিথ্যা বলে দুই কারণে—আত্মরক্ষার জন্য কিংবা আত্মগৌরব প্রচারের মানসে। এর উৎপত্তি ভয় থেকে আর না হয় গর্ব থেকে। বালকের ভয়ের কারণ যে অমূলক তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে; দৈহিক শাস্তি দিয়ে এ অভ্যাস ছাড়াতে গেলে বালক মিথ্যাভাষণে আরো কৌশলী এবং সতর্ক হয়ে উঠবে যাতে ধরা না পড়ে।

গর্বপ্রকাশের উপায় হিসাবে শিশু যখন মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন বোঝা যায় হীনম্মন্যতা বা আত্মদীনতার ভাব কাজ করছে; ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার অসামর্থ্যই এর প্রকৃত কারণ। বালককে বুঝতে দিতে

হবে যে, অনেকখানি সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু মিথ্যা মিশিয়ে দিলে লোকে তার সব কথাই মিথ্যা বলে ধ'রে নেবে ; উপকারের চেয়ে এতে অপকারই বেশী হবে, যে উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ সব সত্ত্বেও যদি শিশুর মিথ্যা ভাষণের অভ্যাস সংশোধিত না হয়, তবে বুঝতে হবে তার সঙ্গে তার পিতামাতার আচরণ এবং পরিবেশের পরিবর্তন আবশ্যক।

অনেক ক্ষেত্রে ছেলের মিছাকথা বলার অভ্যাসের জন্য দায়ী তার পিতামাতা। বাট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন, শিশু যখন মিথ্যা কথা বলে তখন পিতামাতার কর্তব্য শিশুর ত্রুটি দেখার চেয়ে নিজেদের ত্রুটির প্রতি বেশী সচেতন হওয়া, নিজেদেরই এর জন্য দায়ী করা। তারা এর কারণগুলি দূর করতে যত্নবান হবেন, শান্তভাবে যুক্তির সাহায্যে বালককে বোঝাবেন কেন মিথ্যা না বলা ভাল। শাস্তি দিয়ে এ অভ্যাস ছাড়াতে যাওয়া ঠিক হবে না, এর ফলে ভয় এবং মিথ্যাবলার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। তখন হয়ত সে মিথ্যার প্রয়োগে অধিকতর কৌশলী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে যাতে ধরা পড়তে না হয়। জ্বলন্ত আগুনে জল না ঢেলে আঘাত দিয়ে ছড়িয়ে দিলে যেমন হয়, তেমন ফলও হতে পারে।

সন্তানের অভ্যাসগঠনের দায়িত্ব প্রধানতঃ পিতামাতার এইজন্য যে, তাঁদের সঙ্গেই শিশুর প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত ; তাঁদের আচরণ দেখেই সে অভ্যাস গঠন করতে সুরু করে। তাই তাঁদেরও সত্যভাষণে অভ্যস্ত হতে হয়। তাঁরা যদি অসত্য বলেন বা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা না রাখেন শিশু মনে মনে সিদ্ধান্ত করে যে, সব কথাই যে সত্য হবে বা কোন প্রতিশ্রুতি দিলেই যে তা পালন করতে হবে এমন কোন নিয়ম নাই। পিতামাতা যদি মনে করেন যে, শিশুর এত বুদ্ধি হয়নি যে সব কথাই মনে রাখবে বা তা থেকে তাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা ক'রে নেবে তবে তা নিতান্ত ভুল করা হবে। ছেলেকে সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত করাতে হলে অভিভাবককে শিশুর প্রতি আচরণে সত্যবাদী হতেই হবে। শিশুকে কোন শাস্তির ভয় দেখানো উচিত নয় ; যদি দেখান, তবে সে শাস্তি তাকে দিতেই হবে, নতুবা আপনার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা থাকবে না। শিশুদেরও বিচারশক্তি আছে, ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা আছে। তাদের এই শুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে ধৈর্য, স্নেহ ও প্রীতির সোনার কাঠির পরশ দিয়ে। এইজন্য শিশুর জীবনগঠনে ভাল খাঁটি লোকের সাহচর্য এতবেশী প্রয়োজন।

করমৈথুন

যৌন অনুভূতির আবেগে নয়, অনেক সময় দেখা যায় শিশু এমনি জননেন্দ্রিয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে। পিতামাতার পক্ষে এটি বিব্রতকর, কিন্তু এর কারণ কি এবং প্রতিকারই বা কি? কারণ—শিশুর মানসিক শক্তির বহিঃপ্রকাশে বাধা। সুজান আইজ্যাকস্ বলেছেন, তিনচার বছর বয়সের শিশু তার মায়ের ওপর পূর্ণ অধিকার বজায় রাখতে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছে যখন এই রুদ্ধ দ্বন্দ্ব কোন অঙ্গের আত্ম-উত্তেজনায় কিছুটা তৃপ্তি লাভ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতা শিশুর মানসিক শক্তির, পর্যবেক্ষণ শক্তির, অনুভব শক্তির তীব্রতা সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। তাঁরা অনেক সময় তিনচার এমন কি তারচেয়ে বেশী বয়সের ছেলের সঙ্গে একই বিছানায় শয়ন করেন। তাঁদের এই ভুল ধারণা আছে যে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ বিষয়ে শিশু উদাসীন বা কিছু বুঝবার বয়স তার হয়নি। কিন্তু, এরূপ ক্ষেত্রে শিশু—এমন কি দুবছরের কম বয়সী শিশু ও—এতখানি সচেতন ও পর্যবেক্ষণক্ষমতাসম্পন্ন যে, পিতামাতা তা কল্পনাও করতে পারেন না। অনেক সময় ঘুমের ভাণ ক'রে থেকে তারা মা বাবার কথা শোনে, কখনো বা হঠাৎ জেগে উঠে দেখতে চায় তাঁদের আচরণ। কল্পনার সঙ্গে বিস্ময়, ওৎসুক্য এবং গোপনীয়তা মিশে তার মনে এক রহস্যময় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। কখনো বা বালক মা-বাবার এই আলো আঁধারির রহস্যঘন সম্বন্ধের সঙ্গে তার ভাইবোনের আগমনের যোগসূত্র অনুমান ক'রে নেয়। অনেক সময় সে মাকে স্পষ্ট জিজ্ঞেসই করে, আমি কোত্থেকে এলাম? ভাইটিকে বা বোনটিকে কোথায় পেলে?

যথার্থ পন্থায় শিশুর এ কৌতূহল নিবৃত্ত করতে হবে; মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া পিতামাতার পক্ষে ঠিক হবে না, কেননা দুদিন আগে পাছে বালক এ জ্ঞান লাভ করবেই। মা বাবার কাছ থেকে মিথ্যা উত্তর শুনলে তাদের প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। যৌনজ্ঞান এবং যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল নিবৃত্ত করা কঠিন ব্যাপার; এর সঙ্গে সংকোচ মিশে বিষয়টিকে আরো জটিল ক'রে তুলেছে। শিশুর বয়স, পারিপার্শ্বিক এবং প্রকৃতির ওপর লক্ষ্য রেখে তাকে বুঝাবার জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন সরল সত্যভাবে সেটুকু বলা দরকার। শিশুর কৌতূহল কোন এক বিষয়ে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না এবং

কোন বিষয়কে সে বহুদূর পর্যন্ত জেরা ক'রে টেনে নিতে পারে না। অত্যধিক কৌতূহল দেখিয়ে আরো প্রশ্ন করতে থাকলে তাকে ধমক না দিয়ে কিংবা কিছু লুকানোর মত ভাব না দেখিয়ে বরং বলা যায়, এখন যা শুনলে এর বেশী আর বুঝবে না ; পরে বুঝবে। শিশুর চোখমুখের হাবভাব, প্রশ্ন করার ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় সে জিনিসটি সরল ভাবেই জানতে চায়, না এ সম্বন্ধে আগেই সে কিছু জ্ঞান লাভ করেছে।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য সুজান আইজ্যাকস্ পিতামাতাকে কতকগুলি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রত্যেকটি উপদেশ শিশু মনোবিজ্ঞান-সম্মত। শিশুকে পালন করার এবং শিক্ষা দেওয়ার ভার যাঁদের হাতে তাঁদের পক্ষে কথাগুলি ভেবে দেখবার এবং অনুসরণ করবার যোগ্য ঃ

(১) শিশুকে বলবেন না, ওকাজ কখনই ক'রোনা ; বরং বলবেন, এইটি করো।

(২) বলবেন না, একাজটি খারাপ। বরং বলতে পারেন, এটা আমার পছন্দ হয় না।

(৩) ছোটদের সাক্ষাতে তাদের বিষয়ে আলোচনা করবেন না। ধারণা ক'রে নেবেন না যে, তারা শোনে না, লক্ষ্য করে না বা বোঝে না।

(৪) কোন কাজে বা খেলায় রত শিশুকে কিছু পূর্বে সতর্ক ক'রে না দিয়ে হঠাৎ বাধা দেবেন না।

(৫) বাহ্যিক আদর দেখিয়ে শিশুকে আপনার স্নেহের প্রমাণ দেবেন না ; যাতে তার উৎসাহ আসে এবং যা তার দেহ-মনের পক্ষে উপকারী এমন জিনিস দিন।

(৬) শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন না, আপনিই বরং তার সঙ্গে যান।

(৭) মাঝে মাঝে ছুটি উপভোগ করতে ভুলবেন না।

(৮) শিশু অসুস্থ হলে কিংবা না খেলে চিন্তিত বা বিব্রত হয়ে পড়বেন না ; হৈচৈ না ক'রে যা করণীয় ক'রে যান।

(৯) শিশুকে নিয়ে বিদ্রূপ করবেন না বা তাকে বিরক্ত করবেন না। তার সঙ্গে হাসি উপভোগ করুন, তাকে হাস্যাস্পদ করবেন না।

(১০) অন্যের কাছে ছেলের বাহাদুরী দেখাবেন না ; তাকে একটা খেলনায় পরিণত করা ঠিক নয়।

(১১) ছেলের কাছে নৈতিক উপদেশ দেবেন না। আপনি যা করেন, ছেলেকে যদি তা করতে দেখেন, তা হ'লে বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হবেন না।

(১২) অনুমান ক'রে নেবেন না যে, আপনি যা বলেন শিশু তা সবই বোঝে যেহেতু আপনি বোঝেন।

(১৩) যদি রাগের বশে কোন কাজ করেন, তবে ভাণ করবেন না যে শিশুর মঙ্গলের জন্যই ওরূপ করেছেন; ভণ্ডামি রাগের চেয়ে বেশী অপকারী।

(১৪) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না কিংবা যা করতে পারবেন না, তেমন আশ্বাস দেবেন না।

(১৫) মিথ্যা কথা বলবেন না কিংবা কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যাবেন না।

বংশের ধারা

পিতামাতার সঙ্গে যে সন্তানের অনেকখানি দৈহিক সাদৃশ্য থাকে তা লক্ষ্য করতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না ; এ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। তাই আমরা ব'লে থাকি—ছেলেটির চোখ মায়ের মত, গায়ের রঙ বাপের মত, দেহের গড়ন কতকটা ঠাকুরদাদার মত ইত্যাদি। পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সন্তানে সঞ্চালিত হয় কিন্তু সন্তান সকল দিক দিয়ে হুবহু তার বাবা বা মায়ের মত হয় না, কিছু পার্থক্য থাকে। এই সাদৃশ্যের ধারা যা পূর্ব পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়, তাকে বলি বংশের ধারা বা বংশগতি।

কি ক'রে যে পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য সন্তানে ও তার ভিতর দিয়ে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। প্রকৃতির রাজ্যে এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা কিভাবে সাধিত হচ্চে তা অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক। তাঁরা প্রকৃতির অন্তঃপুরের অতি গোপন রহস্যের ওপর আলোকপাত করেছেন, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে হাজার হাজার গুণ বেশী ক'রে এমন সব ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন যা ছিল ধারণার অতীত।

বংশগতি সম্বন্ধে ডারুইনের মতবাদ

চার্ল্স্ ডারুইন পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদের জীবনধারা পরীক্ষা ক'রে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছেন কিভাবে পৃথিবীতে প্রাণের প্রবাহ বিস্তৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে বর্তমান জগতের জীবজন্তু, তরুলতা কীটপতঙ্গ তাদের দৈহিক আকার ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এই ক্রমবিবর্তন চলেছে অতি ধীরগতিতে এবং নিগূঢ় শৃঙ্খলার সঙ্গে। প্রাণিজগতে, বিশেষ ক'রে ইতরপ্রাণীর স্তরে পিতামাতার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রায় নিখুঁতভাবে সন্তানে সঞ্চালিত হয়। ডারুইন বংশগতির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা প্যান্‌জেনেসিস্ (Pangenesis) মতবাদ নামে পরিচিত। তাঁর ধারণা ছিল, প্রাণীর দেহের ভিতরে তার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে সঞ্জাত সার অংশ নিয়ে যে বীজ তৈরি হয় তা থেকে উৎপন্ন হয় সন্তান ; কাজেই পিতামাতার দেহের ও

স্বভাবের ছাপ থাকে সন্তানে। কিন্তু এই অভিমতের স্বপক্ষে ডারুইন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন নি। তবে এজন্য তাঁর কৃতিত্ব কিছুমাত্র কমে না এই কারণে যে, সে-যুগে এমন যান্ত্রিক উন্নতি ঘটেনি যাতে অতি সূক্ষ্মবস্তুর স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হতে পারে।

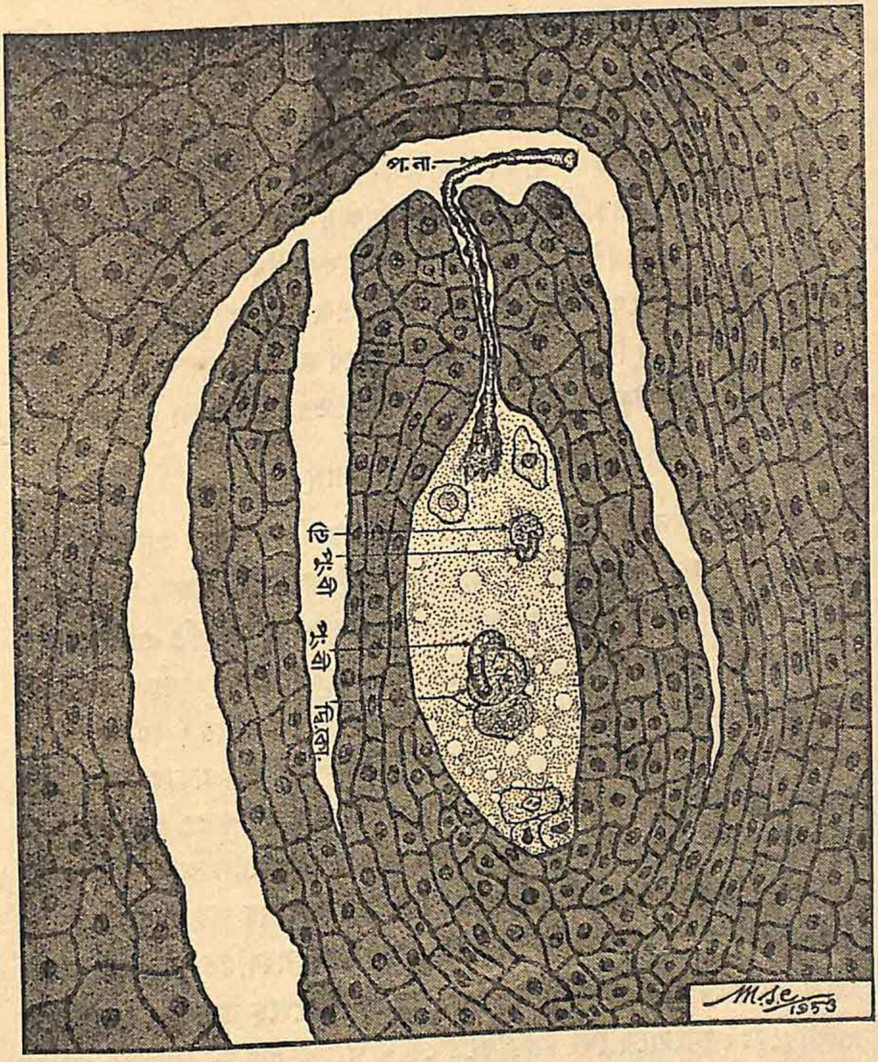
জার্মাণ অধ্যাপক অগাষ্টাস্ ভাইস্‌ম্যান ডারুইনের মতবাদ খণ্ডন ক'রে যে জার্ম-প্লাজম মতবাদ প্রচার করেন তা কেবল সুযুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তার সত্যতা অনেকখানি পরীক্ষিত। তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস যে-বীজ থেকে সন্তানের জন্ম তা সকল-দেহ নিঙরানো কোন রস থেকে উৎপন্ন নয়; সন্তান উৎপত্তি লাভ করে এক প্রকার অতি জটিল, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে যার নাম দেওয়া হয়েছে জার্ম-প্লাজ্‌ম। এই পদার্থ প্রতি দেহে নূতন ক'রে প্রস্তুত হয় না; কেবল এর বহুগুণ বৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটে এবং এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়।'

জার্ম-প্লাজম মতবাদ

বংশগতির রহস্য

অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, যে-বীজ কোষ থেকে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার ভিতরে অতিমিহি পদার্থকণা বিদ্যমান; এই পদার্থটুকুর মধ্যেই ভবিষ্যৎ শিশুর উপাদান নিহিত রয়েছে। ভাইস্‌ম্যান বলেন এই পদার্থ জীবন্ত এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর। এর এক অংশ দিয়ে তৈরি হয় দেহ, যে দেহ ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে এবং অবশেষে জীর্ণ হয়ে বিনষ্ট হয়; আর অন্য অংশের বিনাশ নেই, দেহের মধ্যে অবস্থান ক'রে তা এক থেকে বহুধা হয়, লক্ষ লক্ষ বীজকণায় পরিণত হয় এবং উপযুক্ত কালে এই বীজকণা থেকে নূতন শিশু জন্মগ্রহণ করে। কাজেই দেহের বিনাশ ঘটলেও বংশধারা-বাহী বীজকণিকার বিনাশ নাই; দেহ থেকে দেহান্তরে সঞ্চারিত হয়ে তা প্রাণের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে, যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে নূতন আলোক জ্ব'লে ওঠে আবার তার স্ফুলিঙ্গ থেকে নূতন দীপ জ্বালানো যায়; আধার পরিবর্তিত হলেও একই উৎস থেকে আলোর বিস্তৃতি ঘটেছে; প্রকৃতির রাজ্যে ক্রমবিবর্তনের মধ্যেও চলেছে এমনিধারা জীবনদীপায়ন।

উদ্ভিদ ও কতক নিম্নস্তরের প্রাণীর জীবনে, যেখানে একদেহ থেকেই সন্তানের উৎপত্তি হয়, স্ত্রী-পুরুষে মিলনের বা পরাগ-সংযোগের প্রয়োজন হয় না



অনুবীক্ষণের যন্ত্রচক্ষুতে বৃক্ষশিশুর জন্মলীলা। লিলি ফুলের ভ্রূণকোষের মধ্যে ডিম্ব ও বীজকণিকার মিলন। পরাগনালি (প না) দিয়ে পুংবীজ ভ্রূণকোষের মধ্যে এসে পৌঁছেচে; ডিম্ব (ডি) ও পুংবীজ (পুং বী) একত্র মিলিত হচ্ছে, এ থেকে উৎপন্ন হবে ভাবী বৃক্ষশিশু; এটি ফুলের মধ্যে থাকবে গাছের ভ্রূণরূপে। দ্বি-মেরু কোষের (দ্বি কোঃ) সঙ্গে পুং বীজ (পুং বী) মিলিত হচ্ছে; এ দিয়ে তৈরী হবে বীজের ভিতরকার সঞ্চিত খাদ্য; মাটি থেকে শিকড় দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করার আগে বৃক্ষশিশু এই খাদ্য গ্রহণ ক'রে প্রথম অবস্থায় পুষ্টিলাভ করে। উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, মানুষ সকলের জন্মব্যাপারে সৃষ্টির নিভৃত রহস্য বোধ হয় এই একই প্রকার।

সেখানে বাজকণিকার অভ্যন্তরস্থ উপাদান অপরিবর্তিত থেকেই যে একদেহ থেকে অন্য নূতন দেহ ধারণ করতে পারবে তা অনুমান করা সহজ। কিন্তু যেখানে পুরুষ এবং স্ত্রার দেহনিঃসৃত দুইটি পৃথক বীজকণিকার মিলনে শিশুর উৎপত্তি, সেখানে জার্ম-প্লাজম কেমন রূপান্তর গ্রহণ করে? ভাইস্‌ম্যান বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে দুইটি বীজকণিকা প্রত্যেকে কিছু অংশ পরিত্যাগ ক'রে একত্র মিলিত হ'য়ে একটি সম্মিলিত বীজকণিকায় পরিণত হয়। এই সম্মিলিত কণিকা থেকে নূতন শিশুর উদ্ভব। এর অর্ধেকখানি পিতার এবং বাকী অর্ধেক মায়ের দেহ থেকে পাওয়া। পিতা এবং মাতা ঠিক অনুরূপভাবে তাদের পিতামাতার নিকট থেকে অর্ধেক-অর্ধেক ক'রে-পাওয়া সম্মিলিত বীজকণিকা থেকে উদ্ভূত। এইভাবে সন্তানের ভিতর দিয়ে চ'লে বংশের ধারা।

ক্রোমাটিন ও ক্রোমোসোম্‌

বিজ্ঞানী যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বীজকণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি থাকে না এই দেখে যে, মানুষ, গরু, তিমি বা একটি গাছের বীজ প্রথম অবস্থায় এদের সকলের আকৃতি একই প্রকার, দেখে বুঝবার উপায় নাই কোন্‌টি থেকে তিমি হবে, কোনটি মানুষ হবে বা কোন্‌টি থেকে হবে গাছের উৎপত্তি! কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা ক'রে ভাইসম্যান দেখতে পেলেন বীজকোষের কিছু অংশকে একপ্রকার রঙ দিয়ে রাঙিয়ে নেওয়া যায়, অন্য অংশে রঙ ধরে না। যে অংশে রঙ ধরে তার নাম দেওয়া হয়েছে ক্রোমাটিন। ক্রোমাটিন আবার কতকগুলি অতিমিহি অংশে বিভক্ত হয়—এদের নাম ক্রোমোসোম। এগুলিই জীবনের বাহক, এদের ভিতর দিয়েই জীব ও উদ্ভিদের সকল বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হচ্ছে। মানুষ আজ পর্যন্ত যেরূপ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছে তাতে বিভিন্ন জীবের ও উদ্ভিদের ক্রোমোসোমের আকৃতিতে কোন পার্থক্য ধরা না পড়লেও পার্থক্য যে রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নাই। সৃষ্টির লীলায় বিশালত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে যেমন মানুষ সীমা পায় না, ক্ষুদ্রত্বের পরিমাপ করাও তার পক্ষে অসাধ্য; বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এ দুইদিকেই সৃষ্টি যেন অনন্তপ্রসারী।

জীবের পরিবর্তন সাধিত হল কি ক'রে?

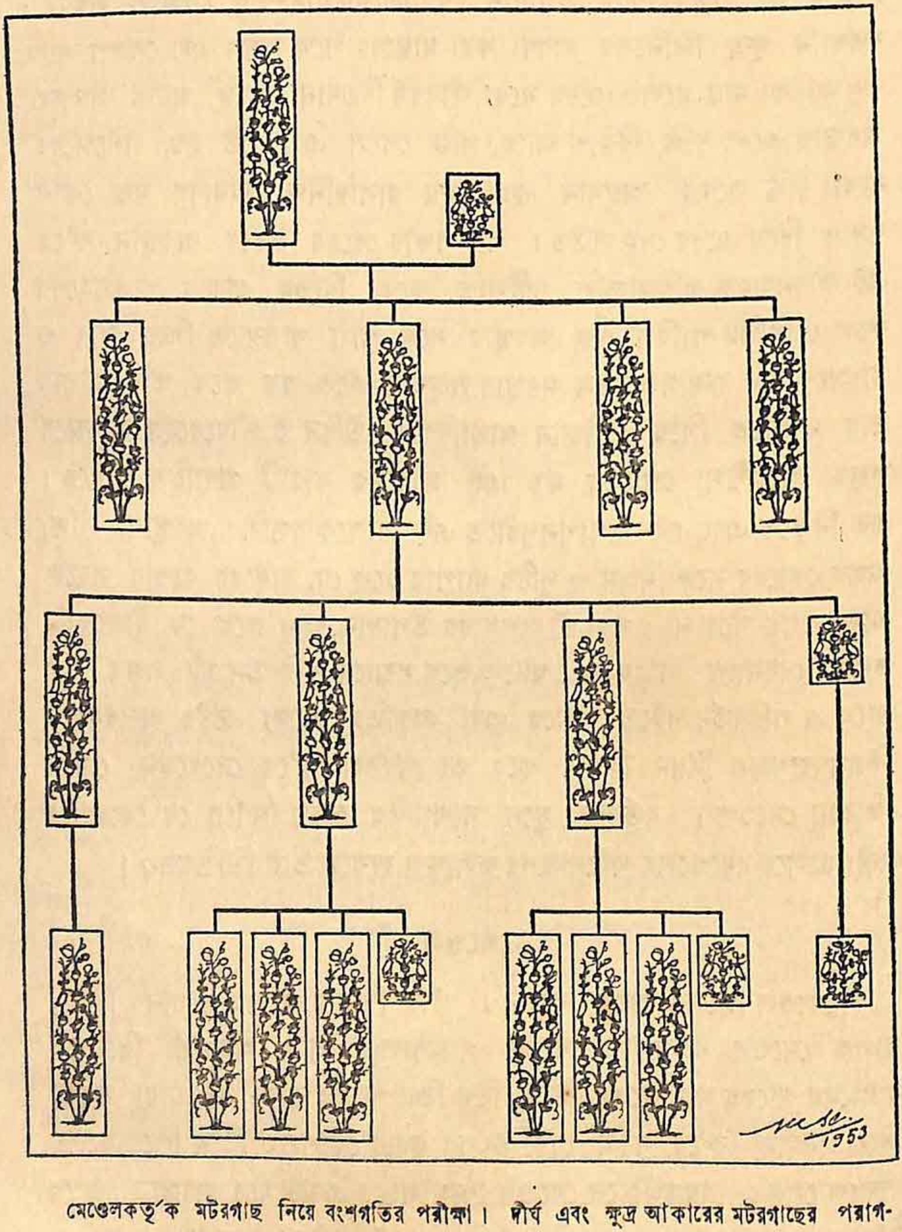
একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্রোমোসোমের ভিতর দিয়ে যদি পূর্বপুরুষের সব রকম বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হ'তে থাকে তবে

পরিবর্তনের সুযোগ কোথায় ? তবে এক প্রাণ থেকে লক্ষকোটি বিভিন্ন প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব হল কি ক'রে? এর উত্তরে বলা যায়—জার্ম্-প্লাজ্ম বা বীজকণিকার উপাদান যে-ক্রোমোসোম-সূত্র সেগুলি সজীব ; যতখানি ক্ষুদ্র জিনিসের ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব এরা সেরূপ অণুর অণু কণিকা মাত্র হলেও এদের মধ্যে জীবধর্ম বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ অনুকূল অবস্থায় এদের বৃদ্ধি, বিকাশ আছে, খাদ্য পেলে এরা পুষ্ট হয়, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অনুমান করা হয় রাসায়নিক পরমাণুর মত কোন পদার্থ দিয়ে এদের দেহ গঠিত। যে সজীব দেহের ভিতরে অবস্থান ক'রে এই জীবনবাহক কণিকাগুলি পুষ্টিলাভ করে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যগ্রহণের ফলে ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জীব ও উদ্ভিদকে যদি ক্রমাগত নূতন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তবে তার প্রভাব তার মজ্জাতে গিয়ে পৌঁছান স্বাভাবিক। উদ্ভিদ ও জীবদেহের অভ্যন্তরে ফল্গুর অন্তঃশীলা স্রোতের মত এই জীবনের ধারাটি প্রবাহিত রয়েছে। এত নিভৃতে এবং এমন গোপনপুরীতে এই বীজকোষগুলির অবস্থান, বৃদ্ধি, অপর কোষের সঙ্গে মিলন ও পুষ্টির ব্যাপার চলে যে, বাইরের প্রভাব সহজে এদের ওপর পড়ে না ; পরবর্তী বংশধরের উপাদান বহন করে যে বীজকোষ, তাতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটলে তবে সন্তানে পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। কি ভাবে এ পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং প্রকৃতির রাজ্যে সৃষ্টির অন্দরমহলে কিরূপ সুশৃঙ্খল নিয়ম বিরাজ করে তা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন গ্রেগর জোহান্ মেণ্ডেল। বর্তমান যুগে বংশগতির স্বরূপ নির্ণয়ে যে বৈজ্ঞানিক চেষ্টা চলেছে মেণ্ডেলের পর্যবেক্ষণের ফলাফল হয়েছে তার ভিত্তিস্বরূপ।

মেণ্ডেল

মেণ্ডেল ছিলেন কৃষকের সন্তান। তাঁর পিতার ফলের বাগান ছিল ; বালক মেণ্ডেল বাল্যকাল থেকেই গাছপালার প্রতি অনুরাগী ছিলেন ; বাগানের গাছের যত্ন নিতেন তিনি, ভিন্ন ভিন্ন গাছের ডাল বা চারা জুড়ে' দিয়ে 'কলম' ক'রে নূতন চারা উৎপন্ন করার কৌশলও তিনি শিখেছিলেন বাল্যকালেই। বয়স্কজীবনে মেণ্ডেল ব্রুন্ সহরে একটি মঠে অবস্থান ক'রে শিক্ষকতার কাজ করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর ধৈর্য, আগ্রহ ও কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। বাল্যে-অর্জন-করা উদ্ভিদ-প্রীতি মেণ্ডেলের জীবনে স্থায়ী

হয়েছিল ; তাই মঠের বাগানে ফল ও ফুলের চাষ নিয়ে অবসর সময়টুকু কাটাতেন, এতে ছিল তাঁর নিবিড় আনন্দ।



মেণ্ডেলকর্তৃক মটরগাছ নিয়ে বংশগতির পরীক্ষা। দীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র আকারের মটরগাছের পরাগ-সংযোগ ক'রে যে বর্ণসঙ্কর গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে বংশের ধারার ছন্দোময় প্রকাশ দেখান হয়েছে।

বংশগতির পরীক্ষা

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডারুইনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন্ অব স্পিসিজ' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি জীবজগতের ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করেন তা নিয়ে সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আলোড়ন ও বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। ডারুইন বলেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে জীবের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হওয়ার ফলে ক্রমে নূতন নূতন উদ্ভিদের ও জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়েছে ; প্রকৃতির রাজ্যে যে এত বৈচিত্র্য দেখতে পাই—যত পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদ পৃথিবীময় বিরাজিত রয়েছে এদের বিকাশ ও বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে পুরুষপরম্পরাগত সামান্য পার্থক্যটুকুর পরিবর্তন ঘটতে ঘটতে ক্রমে নূতন জাতির উদ্ভবে। ডারুইন জীব ও উদ্ভিদজগৎ এবং ভূ-স্তর পরীক্ষা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, নিজে বংশগতির ধারা পর্যবেক্ষণ করেননি। মেণ্ডেল তাঁর মঠের বাগানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের কৃত্রিম উপায়ে মিলন ঘটিয়ে বংশগতির ধারা পরীক্ষা করেছেন।

মেণ্ডেল তাঁর বাগানে ৩৪ রকমের মটরগাছ রোপণ করেছিলেন ; এদের কোনটির ফুল সাদা, কোনটির হলদে বা নীল, কোনটি খাটো, কোনটি লম্বা। পিতামাতার গুণ কিভাবে সন্তানে সঞ্চারিত হয় তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি দুইটি বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরগাছের পরাগমিলন ঘটিয়ে চারা উৎপাদন করলেন। যে জাতের মটরগাছ ছয় ফুট লম্বা হয় তার সঙ্গে যে জাতের মটরগাছ মাত্র ১ ফুট লম্বা হয় তার মিলন ঘটালেন। ফুলটি সম্পূর্ণ বিকশিত হবার আগে অতি যত্নের সঙ্গে তার পাপড়ি খুলে মিহি চিমটের সাহায্যে পরাগদণ্ডটি সরিয়ে ফেলে অন্য জাতের গাছের ফুলের পরাগকোষ থেকে কিছুটা পরাগ উটের চুল দিয়ে তৈরি অতিমিহি তুলির সঙ্গে মাখিয়ে এনে আগের ফুলটির গর্ভকোষে মিশিয়ে দিতেন। এইভাবে এক জাতের ফুলের গর্ভকোষে অন্য জাতের মটরফুলের পুংপরাগ সংযোগ ক'রে নিষিক্ত ফুলটি কাপড় দিয়ে জড়িয়ে পৃথক ক'রে রাখতেন যাতে অন্য কোনপ্রকার রেণু বা পরাগ এতে আর পড়তে না পারে। ফলটি পাকলে তা পৃথক ক'রে রেখে পরবর্তী মরশুমে তা থেকে চারা উৎপন্ন করা হল। ৬ ফুট দীর্ঘ আর ১ ফুট

দীর্ঘ জাতের গাছের মিলনে যে বীজ উৎপন্ন করা হল তা থেকে জাত গাছগুলি মাঝারি-গোছের লম্বা হবে এমনি অনুমান করা হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল সবগুলি চারা হয়েছে পুরা ৬ ফুট দীর্ঘ। মেণ্ডেল এই চারাগুলির নাম দিয়েছিলেন প্রথম পুরুষ ; এদের বাবা লম্বা, মা খাটো ; মা লম্বা, বাবা খাটো—সকল অবস্থাতেই প্রথম পুরুষে সন্তানগণ সবাই হল দীর্ঘ। দেখা গেল পিতামাতার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ ক্ষেত্রে দীর্ঘত্ব তাই সঞ্চারিত হল সকল সন্তানে।

এই দীর্ঘ গাছগুলি থেকে বীজ সংগ্রহ ক'রে রাখা হল ; এবার আর অন্য জাতের গাছের সঙ্গে পরাগ সংযোগ করা হল না ; প্রতি মটর ফুলের ভিতর যে পুং-পরাগ আছে তা থেকেই ফল হল। পর বৎসর এই সকল বীজ থেকে ১০৬৪টি গাছ উৎপন্ন করা হল, তার মধ্যে ৭৮৭টি হল দীর্ঘ, ২৭৭টি হল খাটো ; অর্থাৎ প্রায় চার ভাগের তিনভাগ লম্বা, এক ভাগ খাটো। এবার দেখা গেল প্রথম পুরুষে যে বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যেই প্রকাশ পায়নি দ্বিতীয় পুরুষে তা এক চতুর্থাংশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। আরো মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল ; এই দ্বিতীয় পুরুষের গাছগুলি থেকে পৃথক পৃথকভাবে বীজ সংগ্রহ ক'রে পরের বছর চারা উৎপাদন করা হল। যে একচতুর্থাংশ খাটো ছিল তাদের সবগুলি চারা হল খাটো, ঠিক প্রথমবারকার খাটো গাছটির মত ; এর পর থেকে এদের সব চারাই খাটো হতে লাগল। আর যে তিন-চতুর্থাংশ গাছ লম্বা হয়েছিল তাদের তিন ভাগের এক ভাগ হল লম্বা এবং এদের সবগুলি চারাই হতে লাগল ঠিক প্রথমবারের লম্বা গাছটির মত ; এদের গোষ্ঠী হল লম্বা—পর পর সব চারাই লম্বা হ'তে লাগল ; আর তিন ভাগের দুই ভাগ থেকে যে চারা উৎপাদন করা হল তাদের মধ্যে ঠিক দ্বিতীয় পুরুষের বৈশিষ্ট্য দেখা দিল, অর্থাৎ যত চারা উৎপাদন করা হল তার চারভাগের তিনভাগ হল লম্বা, একভাগ হল খাটো। আবার এদের বীজ থেকে যে গাছ জন্মান হল তাতে তৃতীয় পুরুষের মত অনুপাত ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে লাগল। এখানে যে চিত্র দেওয়া হল তা থেকে জিনিসটি বোঝার সুবিধা হবে।

মেণ্ডেলের পরীক্ষার ফলাফল

অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে মেণ্ডেল যে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন

তার খুঁটিনাটি বিবরণ তিনি লিখে রেখেছেন। এ থেকে বংশগতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক নূতন বিষয় শেখা গেছে। পিতা বা মাতার যে গুণ প্রবল এবং প্রথম পুরুষে ও পরবর্তী পুরুষেও অধিকাংশ সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায়, মেণ্ডেল তার নাম দিয়েছেন 'ডোমিন্যান্ট' অর্থাৎ প্রধান বৈশিষ্ট্য, যেমন মটর গাছের দীর্ঘত্ব ও ফুলের রঙ। যে গুণ অপ্রধান এবং প্রথম পুরুষে মোটেই প্রকাশ পায় না, পরবর্ত্তী পুরুষেও অল্পসংখ্যকের মধ্যের প্রকাশ লাভ করে তার নাম দেওয়া হয়েছে রিসেসিভ্ অর্থাৎ পিছিয়ে-পড়া অপ্রধান বৈশিষ্ট্য, যেমন মটরগাছের হ্রস্বতা।

প্রকৃতির যে-নিভৃত মহলে সৃষ্টির কারখানা সেখানকার কিছু খবর জানা গেছে মেণ্ডেলের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে। প্রথমতঃ দেখা যায়, পিতার বা মাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানে সঞ্চারিত হয় অমিশ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ পিতার ও মাতার বৈশিষ্ট্য একত্র মিশে নূতন কোন গুণ রূপে প্রকাশ পায় না বা দুটির গড় ফল দেখা দেয় না। মানুষের জীবনেও এইরূপ দেখতে পাই। বাবা ও মায়ের গায়ের রঙে তারতম্য থাকলে সন্তান সাধারণতঃ এদের একজনের দেহবর্ণ লাভ করে কিংবা মা-বাবার আগের পুরুষের কারো গায়ের রঙ পায়। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধেও তাই।

দ্বিতীয়তঃ পিতা ও মাতার কাছ থেকে পাওয়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তানসন্ততির ভিতর দিয়ে ক্রমশ পৃথক হ'য়ে যেতে চায়। মেণ্ডেল বলেছেন: বিপরীত গুণবিশিষ্ট জনক জননীর সন্তানগুলির অর্ধেক হয় পিতামাতার গুণ-যুক্ত বর্ণসংকর; বাকী অর্ধেকের মধ্যে বিপরীত গুণ দুইটি পৃথক হ'য়ে যায়—এই অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ সমগ্রের এক চতুর্থাংশ হয় পিতার মত এবং অপর একচতুর্থাংশ হয় মাতার মত।

কেন এরূপ হয়? বিপরীত গুণবিশিষ্ট দুইটি গাছের পরাগ-সংযোগ ক'রে যে ফল উৎপাদন করা হল তার সন্ততিদের নির্দিষ্ট এক অংশ পৃথক হ'য়ে পিতার গুণের অধিকারী হল, নির্দিষ্ট অপর অংশ পৃথক হ'য়ে কেবল মাতার গুণের অধিকারী হল, বাকী অর্ধেকের মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য এমন মাত্রায় র'য়ে গেল যে তাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হ'লে বলতে হয়—পিতার ও মাতার কাছ থেকে পাওয়া জার্মসেলের অর্থাৎ বীজকণিকার মধ্যে উপাদানগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে নিজেদের

বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে না, তারা পৃথক অবস্থাতেই বিরাজ করে; কোন্ সন্তান কিরূপ হবে তা নির্ভর করে জার্মসেলের উপাদানের ওপর; এই উপাদান-নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নাই, মানুষের যন্ত্রচক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির খেয়ালখুশি মত একাজ হয়ে থাকে।

তবে প্রকৃতির খেয়ালের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। ভাইসম্যান অণু-বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে জার্ম-সেলের স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; তাঁর পূর্বে মেণ্ডেল ফুলের পরাগ মিলন সাধন ক'রে বংশগতির যে ধারা পরীক্ষা করেছিলেন তা ভাস্‌ম্যানেরই আবিষ্কারের ফলে সমর্থিত হয়েছে কিন্তু মেণ্ডেলের জীবনকালের মধ্যে তাঁর গবেষণার ফলাফল সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বর্তমানকালে এঁদের তুজনের পরীক্ষালব্ধ ফল বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে; অনেক সুফলও লাভ করা গেছে। একজাতীয় কিন্তু বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট উদ্ভিদের মিলন ঘটিয়ে উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে; গৃহপালিত পশুপক্ষীর সন্তানসন্ততির উন্নতিবিধানেও এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চলেছে।

মানুষের জীবনে কতক পরিবারের তথ্য সংগ্রহ ক'রে বংশগতির প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এ থেকে দেখা যায়, বাবা-মা তুজনেই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হলে সন্তানরাও সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হয়; এদের কারো বংশে উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন কেউ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকলে অল্প কিছু সংখ্যক সন্তান উন্নতবুদ্ধিও পাবে। আবার তেমনি কারো বংশে হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোক থাকলে সন্তানের কতকের মধ্যে হীনবুদ্ধি সঞ্চারিত হবে। বাপ বুদ্ধিসম্পন্ন, মা হীনবুদ্ধি হলে অর্ধেক সন্তান হবে বুদ্ধিহীন। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্না মা যদি হীনবুদ্ধি ঘরের মেয়ে হন তবে সন্তানসন্ততির চারজনের মধ্যে একজন হীনবুদ্ধিযুক্ত হবে। বাবা ও মা তুজনেই হীনবুদ্ধিযুক্ত হলে সব সন্তানই হবে হীনবুদ্ধি। সন্তানে মানসিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চারের এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি সন্তানের কল্যাণকামী পিতা মাতার এবং বিশেষ ক'রে অবিবাহিত যুবক যুবতীর মনে রাখা আবশ্যক, কারণ যখন বর ক'নে নির্বাচন করা হয় তখনই অজানিতে ও পরোক্ষভাবে ভাবী বংশধরদেরও নির্বাচন করা হল!

শিশুর জগৎ

আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরা এই বিশ্বজগৎ যে দৃষ্টিতে দেখি শিশুরা ঠিক সেভাবে দেখে না। তাদের কাছে দৃশ্যমান সবকিছুই অদ্ভুত ও রহস্যময়। ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞানের এবং অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়তে থাকে। দেখে, শুনে, স্পর্শ ক'রে, ঘ্রাণ নিয়ে, আস্বাদন ক'রে—এক কথায় সবগুলি ইন্দ্রিয় দিয়ে রূপরস-শব্দগন্ধ-স্পর্শ অনুভব ক'রে তারা বিবিধ বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ক'রে নেয়। শিশুর মানসিক শক্তি বিকাশের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় আছে। টিকটিকি যেমন কয়েকবার খোলস বদলিয়ে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীতে পরিণত হয়, মানুষও তেমনি শৈশব ও বাল্য অতিক্রম ক'রে আসার সময় কয়েকবার যেন মনের খোলস বদলিয়ে বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা সঞ্চয় করে। আমরা সবাই শৈশবের এইরূপ রহস্যঘন দিনগুলি পার হ'য়ে এসেছি ; কিন্তু বয়স্ক জীবনের রৌদ্রকিরণদীপ্ত দিনে বাল্যের দিনগুলি অস্পষ্ট মনে হয় , তখনকার মানসিক অবস্থার কথাও মনে থাকে না। তাই শিশুরা যখন আমাদের চোখের সামনেই আমাদেরই অতীত শৈশব ও বাল্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে দিন দিন বেড়ে উঠতে থাকে, তখন সব সময় আমরা তা'দের মনের গতিবিধি বুঝতে পারিনে, তাদের মনোরাজ্যের খবরও রাখিনে।

শিশুর প্রথম বছর

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার মধ্যে মানুষের সবগুলি প্রকৃতি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যেমন বীজের মধ্যে ভাবী গাছের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে তেমনি। জল মাটির দাক্ষিণ্য পেলে, উপযুক্ত সূর্যকিরণ পেলে বীজ থেকে বৃক্ষশিশু অংকুরিত হয়ে ওঠে, ক্রমে শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে দেয়। মানবশিশুও ভাবী জীবনের সমস্ত সম্ভবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; কিছুকাল ধ'রে গৃহের পরিবেশের ভিতর দিয়ে তার দেহের ও মনের শক্তিগুলি ক্রমে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। মানুষের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয় শৈশবে—এক থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে তার ভাবী জীবনের কাঠামো অনেকটা রূপ গ্রহণ করে এবং এ সময় সে যেরূপ আচরণে অভ্যস্ত হয় তার অলক্ষিতে তার প্রভাব থেকে যায় শিশুর জীবন ও ব্যক্তিত্বের ওপর।

প্রাণিজগতে দেখা যায়, যে-জীবের শৈশবকাল যত দীর্ঘয়িত তার বুদ্ধি ও দৈহিক পরিপূর্ণতা তত বেশী। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষের শৈশবই বেশী দীর্ঘ, যদিও এমন জীবও আছে যারা মানুষের চেয়ে অনেক বেশীদিন বাঁচে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারা শৈশব পার হয়ে বয়স্ক জীবে পরিণত হয়।

সংসারে জীবন-বিকাশের পথে শিশু কি ভাবে এগিয়ে যায় দেখা যাক। জন্মের পর থেকে মাস দুই পর্যন্ত শিশুর বর্হিজগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না; পেট ভরা থাকলে দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় সে ঘুমিয়ে কাটায়। এরূপ ঘুম তার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সুস্থ শিশু বিশেষ কাঁদে না; বিছানা ভিজে গেলে, ক্ষিধে পেলে বা অন্য কোন প্রকার অসুবিধা বোধ হলে সে কেঁদে ওঠে। তার কান্না মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আবেদন মাত্র।

দু মাসের পর শিশুর দৃষ্টিতে কতকটা স্থিরতা আসে, কারো চোখে চোখে পড়লে হাসে। মাতৃস্তনের সঙ্গে তার এ বিশ্বে সর্বপ্রথম পরিচয়, তারপর পরিচয় তার মায়ের চোখের সঙ্গে। রঙিন জিনিস, বিশেষ করে লাল রঙ শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চলমান জিনিস দেখে সে বিস্মিত হয়। তার জানাশোনার পরিধি ক্রমশঃ বেড়ে চলে। প্রথম প্রথম শিশু আপন মনেই মুখ দিয়ে 'তা তা', 'বুবু' 'মা মা' প্রভৃতি নানারকম শব্দ করে, পরে অনুকরণ করতে শেখে। অন্যের দেখাদেখি হাততালি দিতে, হাত নেড়ে পাখী ডাকতে, পা নাচাতে পারে। কৌতূহল ও অনুকরণ—এর ভিতর দিয়ে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এক বছরের শিশু এক-পা দুপা হাঁটতে চেষ্টা করে, হামগুড়ি দিয়ে বেশ চলতে পারে, মাটিতে ছোট ছোট জিনিস লক্ষ্য করে; বালি, ছোট ছোট টুকরা জিনিস ছিটাতে ভালবাসে, কাগজ ছিঁড়তে জল নিয়ে খল্‌বল্ ক'রে খেলা করতে পছন্দ করে; নিজে হাতে খাবার জিনিস তুলে মুখে পুরে দিতে পারে; তখন তার দুই পাটিতে সামনের দিকে কয়েকটা দাঁত উঠেছে, চিবোতে চায়, কখন কখন মায়ের স্তনে কামড় বসিয়ে দেয়।

শিশুর চরিত্র গঠনে কান্নার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শিশূনাং রোদনং বলম্—রোদন শিশুর বল, তার কাজ আদায় করবার ফন্দি। প্রথমে শিশু কাঁদে কোন অসুবিধা বোধ করলে। যখনি কাঁদে তখনি সে তার প্রতিকার পায়। ক্ষিদে পেলে কাঁদে খাবার আদায় করল, বিছানায় থাকার ইচ্ছা নাই, কেঁদে কোলে ওঠার ব্যবস্থা

শিশুর কান্না

করল, কোন কিছু পেতে হবে, আকার ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে কাঁদতে পারলে তা লাভ করার সুবিধা হল—এই ভাবে সে বুঝে নেয় কান্নার সুবিধা কি। কান্নার জোরে শিশু যদি তার সব মতলবই হাসিল করতে পারে তবে সে ক্রমশঃ অত্যন্ত জেদী ও স্বার্থপর হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে মা বাবাকে, বিশেষ ক'রে মাকে কিছুটা কঠোরতা দেখাতে হবে। শিশুর কান্নার উপযুক্ত কারণ থাকলে তা দূর করতেই হবে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে সে যেন শুধু কান্নার জোরে আবদার ক'রে কোন কিছু আদায় করতে অভ্যস্ত না হয়। অন্যায় আবদার ক'রে কিছুক্ষণ কাঁদলে ক্লান্ত হয়ে শিশু আপনিই ক্ষান্ত হবে এবং একথা বুঝবে যে কান্না দিয়েই সবকিছু লাভ করা যায় না।

দুই থেকে পাঁচ বছর

দুই থেকে পাঁচ বছর বয়সে শিশুর জগতের পরিধি অনেকখানি বাড়ে; তখন গৃহই তার একমাত্র পরিচিত স্থান নয়, জননীই তার একমাত্র আকর্ষণের বস্তু নয়। কে পরিচিত, কে অপরিচিত ব্যক্তি তা সে বুঝতে পারে, পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে সে সকলকে সমানভাবে পছন্দ করে না। এখন থেকেই তার ব্যক্তিত্ব গ'ড়ে উঠতে সুরু করেছে। এই বয়সে শিশু অত্যন্ত স্বার্থপর হয়ে থাকে, নিজের জিনিস কাহাকেও দিতে চায় না; সংগ্রহ প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে—নিজে যা সংগ্রহ করে, রঙিন কাচের টুকরা, পাখীর পালক, রঙিন কাগজ, খেলনা প্রভৃতি পৃথক ক'রে রাখে। সেগুলি তার কাছে মূল্যবান সম্পত্তি।

কল্পনার যুগ

শিশু চেতন অচেতন পদার্থের পার্থক্য বুঝতে পারে না। সে ভাবে সব কিছুরই অনুভব ক্ষমতা আছে; সে নিজে যেমন ব্যথা পায়, কথা বলতে পারে তেমনি গাছপালা, চন্দ্র সূর্য, টেবিল চেয়ার, পশুপক্ষী—সবই এক গোত্রের; তাদেরও অনুভব ক্ষমতা আছে; তারাও কথা বলতে পারে, কথা বুঝতে পারে। শিশুর মন কল্পনার রঙে রঙিন; প্রকৃতির সন্তান সে, প্রকৃতির সবকিছুর সঙ্গে তার মিতালি; বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুমনের এই কল্পনাবিলাস সব সময় বুঝতে পারে না, শিশুর মন যে প্রকৃতির সঙ্গে রহস্যঘন সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ঐ নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে তারও খোজখবর রাখে না। কবির অন্ত-

দৃষ্টির কাছে এ বিষয়টি অজানা ছিল না। খোকার অন্তর রাজ্যের রহস্য রবীন্দ্রনাথ অবগত ছিলেন ; তাই তিনি লিখেছেন ;

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসে সে-নিভৃতে।
তার রবি শশী তারা
জানিনে কেমন ধারা
সভা করে আকাশের তলে,
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবস রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।
শুনেছি আকাশ তারে
নামিয়া মাঠের পারে
লোভায় রঙিন ধনু হাতে,
আসি শালবন প'রে
মেঘেরা মন্ত্রণা করে
খেলা করিবারে তার সাথে।
যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে,
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে॥

—শিশু

শিশু কল্পনা প্রবণ ; মন নিয়ে তার খেলা। তার চেয়ে বেশী বয়সীরা যা করে সেও তাই করতে চায় কিন্তু দৈহিক সামর্থ্যে কুলায় না ব'লে কল্পনায় তা পূরণ ক'রে নেয়। এ সময় শিশু একা একা খেলতেই ভালবাসে, নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে তন্ময় হয়ে। একথাগুলি এলোমেলো পাগলের প্রলাপের মত নয়, এর ভিতর দিয়ে শিশুর কামনার পূর্ণরূপটি ধরা পড়ে ;

তার বাসনা নিজের কথা ও কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে সার্থকতা লাভ করে ; কাজেই বয়স্কব্যক্তির কাছে শিশুর আপনমনে বকবকানি আর আজেবাজে জিনিস নিয়ে খেলা নিরর্থক মনে হলেও শিশুর কাছে তা বিশেষ অর্থপূর্ণ এবং তার আনন্দ ও মানসিক শক্তিবিকাশের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

খেলা

বয়স্কব্যক্তিরা যখন কোন কাজ করে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে তার ভিতর দিয়ে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু শিশুরা একা একা বা নিজেদের মধ্যে যে কাজে মেতে থাকে তাতে এমনি কোন লাভের ব্যাপার নাই। বয়স্কদের কাছে শিশুর খেলা তাই নেহাৎ ছেলেখেলা, অকেজো, অর্থহীন কিন্তু খেলা শিশুর জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ ! সব ছেলেপেলেই খেলে ; এমন কোন বয়স্কলোক নাই যে শৈশবে ও বাল্যে খেলেনি ; খেলার ভিতর দিয়ে শিশু তার জীবন গড়ে তোলে।

শিশুরা খেলে কেন

মানব শিশু এবং অন্যান্য প্রাণীর শিশু কেন খেলে এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। জার্মাণ কবি শীলার খেলার কারণস্বরূপ যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, হার্বার্ট স্পেন্সার তার বিস্তৃত আলোচনা ও ভাষ্য করেন। এ সিদ্ধান্তের মূল কথা হল এই যে, শিশুকে খাদ্যসংগ্রহের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না, তার ভাবনা চিন্তা কিছু নাই ; তার মা-বাবা প্রতিপালনের সব ব্যবস্থা করেন। কাজেই সুস্থ সবল শিশুর দেহে যে অতিরিক্ত বল সঞ্চিত থাকে খেলার পরিশ্রমের ভিতর দিয়ে সে তা ব্যয় করে। এঁদের মতে খেলা শিশুর দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তির উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশ। স্বাস্থ্যবান শিশু প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে খেলাধূলায় উৎসাহিত হয় বেশী এ কথা ঠিক, তবে রুগ্ন শিশু ও তো খেলায় আনন্দ প্রকাশ করে ; খেলার আনন্দে অনেকে দেহের ক্লান্তির কথা ভুলে যায়। কাজেই শিশু যে কেবল অতিরিক্ত দৈহিক শক্তির জন্য খেলে তা নয়।

কেহ কেহ মনে করেন শিশু খেলার ভিতর দিয়ে মানবজাতির ক্রম-বিকাশের পথে বিভিন্ন পর্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে। শিশু প্রথমে জলকাদা, ইটপাথর, গাছের ডাল পাতা প্রভৃতি দিয়ে খেলতে সুরু করে, পরে ক্রমে তার

খেলায় উন্নত ধরণের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই কতকের ধারণা যে, মানুষ যেভাবে আদি গুহা মানবের অবস্থা থেকে ক্রমে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছে, শিশু তার খেলায় যেসব জিনিস ব্যবহার করে, যেরূপ বুদ্ধির পরিচয় দেয় তার ভিতরে যেন মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। অনেকেই এমত সমর্থন করেন না।

আবার অধ্যাপক কার্ল্ গ্রুসের মতে খেলা মানবশিশুর এবং অপর প্রাণি-শিশুর ভাবী কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুতির উপায়; খেলার ভিতর দিয়ে এরা বয়স্কজীবনের কাজের জন্য প্রস্তুত হয়, যেমন বিড়াল ছানা ইঁদুর ধরার অভিনয় করার মত খেলে, কুকুরছানা পরস্পারের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে, পাল্লা দিয়ে ছুটাছুটি করে—এও যেন ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি; মেয়েরা রান্না-বান্না খেলে, পুতুল খেলে, অসুখ হ'লে পুতুলকে ওষুধ খাওয়ায়; ছেলেরা মেয়েদের পুতুল খেলার ঘরকন্নায় সাহায্য করে, হাট বাজার করে, লড়াই-লড়াই খেলে।

অতিরিক্ত দৈহিক শক্তির বহিঃপ্রকাশই হোক, পূর্ব জীবনের কর্মের অনু-বৃত্তিই হোক, কিংবা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্যই হোক খেলা শিশুর দেহের ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। বিভিন্ন বয়সের শিশুর খেলা পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা যায়, ছুটাছুটি, অকারণে হৈ-হুল্লোড়, অনেকে মিলে দৌড়াদৌড়িতে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রকাশ ঘটে অন্য কোন উপায়ে শিশু তা লাভ করতে পারে না। শিশুর জীবনে ছুটাছুটি খাদ্যগ্রহণের মতই প্রয়োজনীয়; এর ভিতর দিয়েই শিশুরা মাংসপেশীর পুষ্টি, দেহের ভারসাম্য গতির ক্ষিপ্রতা লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে অনুকরণের ভিতর দিয়ে। শিশু তার পরিবেশে যা লক্ষ্য করে, বয়স্কব্যক্তিদের যে কাজ করতে দেখে খেলার ভিতর দিয়ে সে তাই অনুকরণ করে; মন তার সজাগ ও গ্রহণশীল, কল্পনা তার উদ্দাম। অনুকরণ করতে গিয়ে মেয়েরা রান্না-রান্না খেলে, পুতুলের বিয়ে দেয়, ছেলেরা ট্রেন মোটর উড়োজাহাজ চালায়, দোকানদারি করে, ডাক্তার মাষ্টার সাজে, চোর-পুলিস খেলে। দেখি, প্রদর্শনী দেখে এসে ছেলেরা নিজেদের টুকরা জিনিসপত্র দিয়ে প্রদর্শনী খুলে রীতিমত বিজ্ঞাপন লাগিয়ে, টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে, প্রবেশের বহির্গমনের পথ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে এমনকি টিনের কৌটা পিটিয়ে উঠানে চক্কর দিয়ে 'সহর' ঘুরে এসেছে। একদিন দেখি পাঁচ বছরের ছেলে দেশলাইয়ের খোলের

মধ্যে কয়েকটা কাঠি আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কয়েকটা শিশিতে রঙিন জল ভরে নিয়ে এ্যালোপ্যাথ ডাক্তারবাবু হয়ে বসেছে; ওসব হল তার ইন্‌জেকসন দেবার সরঞ্জাম! তার চেয়ে বয়সে ছোট শিশুদের সে তার কথায় 'ইষ্টন্' (ইন্‌জেক্‌সন) দিয়ে রোগ সারাবার ব্যবস্থা করছে! এর কয়েকদিন আগে গৃহে সত্যই একজনের ইন্‌জেক্‌সন দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। শিশু তা লক্ষ্য করেছিল এবং তার খেলায় দেখা গিয়েছিল চিকিৎসকের কার্য-কলাপের নিখুঁত অনুকরণ।

শিশুর গল্প শোনার ঝোঁক

সাড়েতিন বছর চার বছর থেকে নয় দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও বালক বালিকার রূপকথার যুগ বলা যায়। এ সময় তারা রীতিমত কল্পনা প্রবণ; প্রকৃতির রাজ্যে তাদের কাছে অসম্ভব ব'লে কিছু মনে হয় না। রাক্ষস খোক্কস, তেপান্তরের মাঠ, পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাজপুত্র কোটাল পুত্রের অসাধারণ বীরত্ব সাত ভাই চম্পা, বেঙ্গমা বেঙ্গমীর গল্প শিশুদের মনকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করে। একবার দুবার শুনে তাদের তৃপ্তি হয় না। বক্তার কথার সঙ্গে তাদের মনের চোখের সামনে দৃশ্যগুলি ফুটে উঠতে থাকে; তন্ময় হয়ে যায় তারা। তাদের মনের ওপর গল্পের প্রভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। কাহিনী শুনে কখন তারা উল্লসিত হয়ে ওঠে কোন বীরত্বের ও বুদ্ধির পরিচয় পেলে, কখন ও বা করুণ কাহিনী শুনলে ব্যথার চিহ্ন ফুটে ওঠে তাদের চোখে মুখে। এণ্ডারসনের রূপকথা শিশুদের কাছে চিরদিন চিত্তাকর্ষক। গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও রবিনসন ক্রুশো শিশু বালক কিশোর সকলকেই মুগ্ধ করে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে এই রূপকথায় যুগের প্রথম দিকে শিশুরা মানুষের কাহিনীর চেয়ে তাদের পরিচিত জীবজন্তুর কাহিনী শুনতে বেশী ভালবাসে। ইঁদুর, বিড়াল, খরগোস, বাঘ, ভাল্লুক, শিয়াল, হাঁস—এ সবের গল্প শিশুদের বিশেষ প্রিয়, তার কারণ কল্পনায় গাছপালা জীবজন্তু সম্বন্ধে তারা যে ধারণা ক'রে নেয় গল্পের ভিতর দিয়ে তারা যেন তারই সমর্থন পায়। রূপকথার মধ্যে বিভিন্ন পশুপক্ষীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে শিশুরা যা শোনে তা থেকে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা গড়ে ওঠে তাদের মনে, তাছাড়া

গল্পের ব্যক্তিদের আচরণ থেকে শিশুরা কোন্‌টি ন্যায় কোনটি অন্যায়, কি ভাল কি মন্দ, কি কাজ প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় এ সম্বন্ধে নিজেদের মনে অভিমত গ'ড়ে তোলে। কল্পনায় তারা গল্পের প্রিয় নায়কের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে আনন্দ অনুভব করে। সাহস, বুদ্ধির জোর ও গায়ের জোর শিশুদের বিশেষ ক'রে আকর্ষণ করে।

দশ থেকে ষোল সতর বছর পর্যন্ত বালক ও কিশোরদের মানসিক যুগকে বলা যায় এ্যাডভেঞ্চার বা মানুষের বীরত্বের যুগ। বালক পশুপক্ষীর কাহিনীতে আর আগের মত আনন্দ পায় না, পশুপক্ষী যে মানুষের মত আচরণ করতে পারে না সে ধারণা তাদের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রূপকথাকে তখন মনে হয় নেহাৎ ছেলেমানুষী ব্যাপার। মানুষের বিশেষ করে কিশোর ও তরুণের রোমাঞ্চকর কীর্তি কলাপের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়। শিকার, কাহিনী, ডিটেক্‌টিভ গল্প, দুর্গম স্থান জয় করার জন্য বিপৎসংকুল অভিযানের বিবরণ তাদের কাছে প্রিয়, কেননা এর ভিতর তারা পায় নির্ভীক মানুষের শৌর্যের পরিচয়। বালক ও কিশোর শক্তির পূজারী। তারা নিজেরা শক্তির পরিচয় দিয়ে বাহাদুরি নিতে চায়; রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ গল্পের নায়ক যে অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেয় বালক-কিশোরেরা যেন তার মধ্যে নিজেদের অভিলাষকে রূপায়িত হতে দেখে। তাই তাদের আনন্দ।

কৈশোর পার হয়ে মানুষ যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন রোমাঞ্চকর কাজের জন্য মানসিক উত্তেজনা কমে যায়; বিচার বুদ্ধিতে যা মনে হয় অবাস্তব এবং অসম্ভব তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকে না। মানুষের সত্যকার জীবনের সমস্যা, মন-দেয়া-নেয়ার কাহিনী, আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ যে সব গল্প-উপন্যাসের প্রধান বিষয় বস্তু বয়স্ক পাঠক তা পাঠ ক'রে আনন্দ পায়। কাব্য নাটক গল্প উপন্যাসের চিরন্তন বিষয়বস্তু হল মানুষের প্রেম, মানুষের মনের জটিল কামনা বাসনার ঘাত প্রতিঘাত, মানুষের জীবনের সমস্যা। বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যাও এই জাতীয়, কাজেই এর মধ্যে তারা নিজেদের মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়।

কিন্তু, মানুষ যখন সংসারে সুখ দুঃখ, আশানিরাশার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় তখন অনেকের মন আকৃষ্ট হয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব বা এমন কোন বিষয়ের প্রতি যার ভিতর দিয়ে তারা সৃষ্টি ও

স্রষ্টার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ও অর্থের সন্ধান পেতে পারে।

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ কি ধরণের কাহিনী পছন্দ করে তা দেখে মানুষের মনের ক্রমপরিণতির ধারাটি স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। যে-শিশু দৈত্যদানব রাক্ষস খোক্ষসের গল্প শুনে আত্মহারা হয়ে যেত কিছুটা বয়স বাড়লে তার কাছে এগুলি আর আকর্ষণীয় থাকে না, মানুষের বীরত্ব কাহিনী তখন তার কাছে প্রিয়; সেই শিশুই যখন যৌবনে উপনীত হয় তখন তার বাল্যের ও কৈশোরের প্রিয় বইগুলি আর আনন্দ দিতে পারে না, মন তার তখন মন নিয়ে খেলতে ভালবাসে। আরো বেশী বয়স হলে তখন মানুষ ভাবে এ জীবন তো দেখা হল, এর পর কি? কাল সমুদ্রের বুকে জীবন কি একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ? নশ্বর দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি মানুষের পূর্ণ বিলুপ্তি, না এর পরও কিছু আছে? এই ধরণের বহু প্রশ্ন ও সমস্যা এসে ভীড় করে তার মনে।

তাই আমরা দেখতে পাই, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মনের দিক থেকে এক একটি স্তর বা যুগ পার হয়ে যায়; পিছনে ফেলে যাওয়া যুগের প্রতি তার কোন মোহ থাকে না। এইজন্যই শিশুর জগৎ ও শিশুর কল্পনা সম্বন্ধে বয়স্ক ব্যক্তিরা এমন উদাসীন। তাদের নিজেদের কাছে ঐ জগতের কোন মূল্য নাই কিন্তু শিশুদের কাছে যে তা যথেষ্ট মূল্যবান সে কথাটি খুব কম লোকেই মনে রাখে।

পিতামাতা ও ছেলেমেয়ে

গাছের পুরাণো পাতা ঝ'রে পড়ে ; নূতন কচি পাতা তার স্থান পূরণ করে, গাছকে সজীব সতেজ রাখে। মানব-সমাজেও শিশুর দল মানব-জাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা ক'রে চলেছে। সকল দেশের সমাজেই মানবজাতির ধারাবাহক হিসাবে পিতামাতা গৌরবের স্থান লাভ ক'রে থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমং তপঃ। পিতা জন্মদাতা, সন্তানের গুরু। মাতা সন্তানকে তিলে তিলে নিজদেহের পুষ্টিরসধারা দিয়ে গ'ড়ে তোলেন, মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী।

কিন্তু, সন্তানের জন্ম দিয়েই পিতামাতার কর্তব্য শেষ হল না ; তখনই বরং বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হল তাঁদের ওপর। শিশু যে-পরিমাণ স্বাভাবিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার বিকাশ সাধন ক'রে তাদের সমাজের ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক ক'রে গ'ড়ে তোলা পিতামাতার একটি মহান কর্তব্য। প্রায় দুশো বছর আগে ফরাসী চিন্তানায়ক রুশো এবিষয়ে জনক জননীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশুর ক্রমবিকাশের ওপর তিনি যে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিশুদের শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে তিনি যে আন্দোলন সুরু করেন তা থেকেই বর্তমানকালের শিশুমনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত।

পিতামাতার দায়িত্ব—রুশোর অভিমত

শিশু স্বাস্থ্যবান নানা গুণসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হোক পিতামাতার তাই কাম্য। কিন্তু এজন্য বয়স্কব্যক্তির ভাব ও চিন্তাধারা প্রথম থেকেই তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে এ উদ্দেশ্য সফল হবে না। শিশুর জগৎ আর বয়স্ক-ব্যক্তির জগতে অনেক পার্থক্য। বয়স্কব্যক্তিরা তাঁদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুদের জীবন, তাদের স্বপ্নকল্পনা ও আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয় বিচার করতে গেলেই ভুল করেন। বয়স্কব্যক্তিরা অনেক দেখে, অনেকবার ঠ'কে, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে শিখেছেন ; দৈহিক শক্তি ও মানসিক শক্তি তাঁদের শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী। শিশুর মায়াকাজলমাখানো চোখে তার পরিচিত পরিবেশ, ফুলপাখী, মেঘ আকাশ, নদীপর্বত, নানা জীবজন্তু যে

স্বপ্নজাল বোনে, কল্পনায় এদের নিয়ে সে যে মায়ার স্বর্গ রচনা করে, বয়োবৃদ্ধ খুব কমলোকই তাঁদের ছেলেবেলাকার মোহমুগ্ধ দিনগুলি স্মরণ ক'রে এরূপ মনোবিলাস উপলব্ধি করতে পারেন। শিশুদের মানসিক শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধেও তাঁরা সঠিক অনুমান করতে পারেন না। তৎকালীন অভিভাবকদের সম্বন্ধে রুশো যা বলেছিলেন আমাদের দেশে এখনো তা প্রযোজ্য। তাঁর প্রসিদ্ধ 'এমিল' পুস্তকে রুশো বলেছেন ঃ

মানুষে পরিণত হবার আগে শিশু শিশুই থাকবে এই হল প্রকৃতির বিধান। এর ব্যতিক্রম ঘটালে অর্থাৎ শিশুকেই বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য শিক্ষা দিতে গেলে ফল হবে অকালপক্কতা। অকালে পাকানো ফল স্বাদহীন এবং অল্পদিনেই পচে' ওঠে। শৈশবের নিজস্ব চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভব ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে পিতামাতা ও অভিভাবকে সচেতন হতে হবে।

শিশুর জীবনগঠনে পিতার দায়িত্ব অনেকখানি। তাঁর স্নেহ ও উপযুক্ত পরিচালনা শিশুর আত্মবিকাশে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। সন্তান পালনে পিতার দায়িত্বকে রুশো 'পবিত্র কর্তব্য' বলে অভিহিত করেছেন ; বলেছেন এ বিষয়ে পিতার তিনটি ঋণ আছে। আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় এদের বলতে পারি মানব-ঋণ, সমাজঋণ ও রাষ্ট্র-ঋণ। রুশো বলেন ঃ *

মানবজাতির প্রতি কর্তব্য—মানুষের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মানুষ দান করা ; সমাজের প্রতি কর্তব্য—সমাজজীবনের পক্ষে উপযোগী মানুষ দান করা ; রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য—নাগরিক দান করা। যাঁর এই তিনপ্রকার দান করার ক্ষমতা আছে অথচ করেন না তিনি অপরাধী ; তিনি যদি এই কর্তব্য আংশিকভাবে সম্পন্ন করেন তবে তিনি আরো বেশী অপরাধী। যিনি পিতার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, তাঁর সন্তানের জনক হওয়ার কোন অধিকার নাই।

---

* To the human race he owes men ; to society, men fitted for society ; to the state, citizens. Every man who can pay this triple debt, and does not pay it, is a guilty man ; and if he pays it by halves, he is perhaps more guilty still. He who cannot fulfil the duties of a father has no right to be a father.

—*Rousseau's Emile*

রুশোর কথাগুলি পিতামাতার কাছে কঠোর মনে হলেও এগুলি নিষ্ঠুরভাবে সত্য। ইতরপ্রাণীর মত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে পশুর মত জীবন যাপন করা মানুষের কাম্য নয়। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে সমাজে বাস করে; তাকে সভ্যসমাজের নিয়মকানুন, বাধানিষেধ মেনে চলতে অভ্যস্ত হতে হয়; মানব-সভ্যতার যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করে শুধু তার উপযুক্ত হওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়, যোগ্য নাগরিক রূপে সমাজের কল্যাণকর কাজ করা ও আত্মশক্তির বিকাশ সাধন ক'রে মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করাও তার নৈতিক দায়িত্ব। কাজেই পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে মানুষকে যেরূপ জীবন যাপন করতে হবে, যে পরিবেশে বাস করতে হবে, যেরূপ আত্মশক্তির পরিচয় দিতে হবে তার উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা পিতামাতারই সর্বপ্রধান কর্তব্য। মানবশিশুর দলকে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিকে পরিণত করবার শিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে; প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্র এ দায়িত্ব অনেকটা গ্রহণ করে সত্য, তবে এ বিষয়ে প্রাথমিক দায়িত্ব পিতামাতার।

স্বল্পকালস্থায়ী সুযোগ

আমাদের পরিবারের মধ্যে শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে; সে পরিবারে একজন ক্ষুদ্র ও 'অকেজো' সদস্য। বয়স্কব্যক্তির সাংসারিক জীবনের সমস্যায় সে কোন অংশ গ্রহণ করতে পারে না; কাজেই পারিবারিক জীবনে তার গুরুত্ব বিশেষ নাই। শিশু এবং বালক ব'লে সে যেন কতকটা উপেক্ষার পাত্র। এ উপেক্ষা মুখে প্রকাশ না করলেও কার্যতঃ আমরা তাই ক'রে থাকি। একথাটি আমরা খুব কম লোকেই মনে রাখি যে, শিশু তার অজ্ঞাতসারে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিনকার আচরণের ভিতর দিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন গ'ড়ে তুলছে। আমরা ভাবি—শিশু নেহাৎ শিশু; তার বুদ্ধি কতটুকু, শক্তিই বা কতটুকু! কিন্তু প্রকৃতই তা নয়! তার বুদ্ধি রীতিমত সজাগ ও ক্রমবিকাশমান, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অনুভূতি রীতিমত তীক্ষ্ণ। দর্শক যেমন মাঠের বাইরে ব'সে দুইপক্ষের খেলোয়াড়দের খেলাই ভালভাবে দেখতে পায়, শিশু ও বালক তেমনি তাদের পরিজনদের কার্যকলাপ, মেজাজ, আচরণ, রীতিনীতি সবই লক্ষ্য করে

এবং এর ভিতর দিয়ে যে পারিবারিক প্রভাব পড়ে তার মনের ওপর, তাই হয় তার জীবনগঠনের মূলভিত্তি।

আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান শিশু ছাড়া বেশীর ভাগই অযত্ন ও উপেক্ষার ভিতর দিয়ে বাল্যকাল অতিবাহিত করে; তাদের দেহের ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্য পূর্বপরিকল্পিত কোন প্রণালী প্রয়োগ করা হয় না। অবস্থার চাপে শিশু যেরূপ তরুণ বা বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তাকেই তার ভাগ্যলিপির বিধান ব'লে মেনে নেওয়া হয়। অভিভাবক চান শিশু তাড়াতাড়ি তার অসহায় অবস্থা কাটিয়ে সাবালক হ'য়ে উঠুক; তাহলেই তাঁরা অপোগণ্ডদের তদারক করার ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে পারেন।

কিন্তু, একটু চিন্তা করলেই আমরা দেখতে পাই মানুষের বাল্যকাল কত সংক্ষিপ্ত, কত অল্পকালস্থায়ী। কচি কোমল অসহায় শিশু অল্প কিছুদিনের মধ্যে বালকে পরিণত হয়; আমরা বয়স্ক লোকেরা যখন নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, তখন বালক চুপ ক'রে ব'সে নেই; সেও জীবনপথে এগিয়ে চলেছে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে। বাল্যকাল ও তারপর আর পাঁচ ছয়টি বছর দেখতে দেখতে কেটে যায়, কৈশোর পরিণত হয় তরুণ যুবায়। শিশুর প্রথম পাঁচ ছয় বছর সময় তার জীবন ও চরিত্রগঠনের উপযুক্ত কাল। আমরা অনেকে নিজেদের অজ্ঞতার হেতু এই মূল্যবান সময়টির সদ্ব্যবহার করিনে, তার ফলে এমন সুযোগ আমাদের হাতছাড়া হ'য়ে যায় যা আর পরে ফিরে আসে না। সব পিতাই চান তাঁর ছেলে বিনয় ও সদাচরণে অভ্যস্ত হোক, উন্নত বলিষ্ঠ হোক, উচ্চ আদর্শ অনুসরণ ক'রে কীর্তির অধিকারী হোক, কিন্তু কি উপায়ে এ আশা সার্থক হতে পারে তা কয়জনে ভেবে দেখেন? যাঁদের গৃহে শিশু সন্তান আছে তাঁরা শিশুর ভাবে ভাবিত হয়ে প্রতিদিন কতখানি সময় অতিবাহিত করেন? তাসপাশা গল্পগুজবে, খেলাধূলায় ও পরচর্চায় প্রতিদিন যে পরিমাণ সময় ব্যয়িত হয় তার তুলনায় আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর, আমাদের সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারীদের কল্যাণের জন্য কতখানি সময় ব্যয় ক'রে থাকি?

মানবশিশু প্রকৃতিদেবীর অতি জটিল এবং বিস্ময়কর সৃষ্টি; তাকে মানুষ ক'রে তুলতে অভিভাবকের পক্ষে প্রয়োজন শিশুর স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান, নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা, সহানুভূতিপূর্ণ উপযুক্ত পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধান। কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে যেরূপ অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে তা

এক রকম অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। অধিকাংশ মানুষ, এমন কি অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও, তার নিত্যব্যবহার্য সামান্য জিনিসটির যেমন যত্ন নেয়, তা অকেজো হলে মেরামতের জন্য যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তা ভালভাবে চালু রাখার জন্য যেমন চেষ্টা ক'রে থাকে, নিজের সন্তানের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য ততখানি আগ্রহ বা আন্তরিকতা প্রকাশ করে না।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা পিতামাতাকে মনে রাখতে হবে; উপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা তাঁরা শিশুর চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিতে পারেন, কোন একটি ছাঁচে গড়ে তুলতে পারেন কিন্তু শিশুর অন্তর্নিহিত মূল শক্তির কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেন না। শিশু তার মা বাবার কাছ থেকে যে-পরিমাণ মানসিক শক্তি নিয়ে, যে ধরণের দেহের কাঠামো নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে বাইরে থেকে আমরা তার অদলবদল করতে পারিনে। মানুষের মেজাজ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি, সেক্ষেত্রেও মানুষের কোন হাত নাই।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা

ছেলেকে কেন্দ্র ক'রে পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নূতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি নিজে জীবনে যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন পুত্রের সাফল্যের ভিতর সফলতার গোরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান; আর, তিনি নিজে যদি কর্মজীবনে সফল হয়ে থাকেন তবে কামনা করেন তাঁর পুত্র অধিকতর সাফল্য অর্জন করুক। কিন্তু অনেকেই ভেবে দেখেন না যে, সব মানুষের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভবপর নয়। শিশু পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া যে শক্তি নিয়ে আসে তারই স্বাভাবিক বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর হতে পারে, নূতন কোন ক্ষমতা ও স্বভাব তার মধ্যে সঞ্চার করে চলে না; চেষ্টা করলেই কেউ গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন বা বিধান রায় হতে পারে না। অনেক বুদ্ধিমান পিতাও এই বাস্তব সত্যটি ভুলে' যান, ছেলের কাছ থেকে আশা করেন অনেক কিছু এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ভাগ্যে জোটে নিরাশাজনিত মনোবেদনা। কেহ বা এই মনোবেদনা নিজের অন্তরে লুকিয়ে রেখে একা একাই তুষানলের জ্বালা সহ্য করেন; কিন্তু যাঁরা এই ব্যর্থতার জন্য ছেলেকে দায়ী করেন তাঁদের অন্যায় অত্যাচারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, কেননা যার পক্ষে যা অসাধ্য

তার কাছে তা দাবী করা এবং সে দাবী না মিটলে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা শুধু অন্যায় নয় নিষ্ঠুরতারও পরিচায়ক।

শিশুর জীবনে পিতামাতার প্রভাব

শিশু পিতামাতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মানসিক শক্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ শক্তিগুলির বিকাশ হ'তে থাকে। সুযোগের অভাবে, চর্চার অভাবে অধিকাংশ মানুষেরই সবগুলি শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে' ওঠে না ; অনেকে আবার প্রধান শক্তিগুলির বিকাশের সুযোগও পায় না। চেষ্টা ও সুযোগের অভাবে মানবশিশুর আত্মবিকাশ যাতে ব্যাহত না হয় সে ব্যবস্থা করার মুখ্য দায়িত্ব পিতামাতার, গৌণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিভাবে পিতামাতা এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তাঁদের প্রভাব কিভাবে শিশুর জীবন গ'ড়ে তুলতে সহায়তা করে তা সন্তানের কল্যাণকামী বাপ-মাকে জানতেই হবে।

শিশুর প্রথম পরিচয় তার মায়ের সঙ্গে, তার পরে তার বাবা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে। পরিবারের আওতায় থেকে শিশু অন্য সবাইকে যেমন আচরণ করতে দেখে, যেমন ব্যবহার পায় সেই অনুসারেই তার অভ্যাস গ'ড়ে ওঠে। এই অভ্যাসগুলির সমষ্টিই মানুষের চরিত্রের উপাদান। চরিত্র বলতে মানুষের মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, তার আচরণ—সমাজের প্রতি আচরণ, কর্তব্য কর্মের প্রতি মনোভাব, অপর ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, এ সবই বুঝি। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে, খেলার সাথীদের সঙ্গে প্রতিদিনকার আচরণের ভিতর দিয়ে শিশুর অভ্যাস ও মনের কাঠামো গঠিত হতে থাকে। শিশুর প্রথম পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে তার যে স্বভাব গ'ড়ে ওঠে, যে অভ্যাসে সে অভ্যস্ত হয়, পরবর্তীকালে তার পরিবর্তন ঘটানো বড়ই কঠিন। শিশুর বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির কমবেশী থাকতে পারে, তার ওপর পিতামাতার কোন হাত নেই ; কিন্তু শিশু বিনয়ী শিষ্টাচারী হবে, না দুর্বিনীত হবে, নির্ভীক সত্যবাদী হবে, না ভীরু মিথ্যাচারী হবে, অপরের সঙ্গে মিলেমিশে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত হবে, না জেদী স্বার্থপর হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে পিতামাতার আচরণের ওপর।

শিশু ও তার মা

শিশু স্বভাবতই অত্যন্ত স্বার্থপর ; তার মায়ের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাও স্বার্থের সম্বন্ধ—সে কেবল নিজের তৃপ্তি চায়, মায়ের স্তনধারা, মায়ের কোল, মায়ের আদর সে একান্ত নিজের ক'রেই পেতে চায়। শিশু যদি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বার্থপরতা ত্যাগ ক'রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে না শেখে তবে সে অন্য সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে তখন সমাজের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের সমাজ ও সভ্য জীবন চলেছে সকলের সমবেত চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ফলে। স্বার্থপর মানবশিশুকে সভ্য মানবসমবায়ে বাসের উপযুক্ত হবার ট্রেনিং দেবার প্রধান দায়িত্ব তার মায়ের। কেননা তিনিই শিশুর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী। ডক্টর অ্যাড্‌লার মানসিক রোগগ্রস্ত কিশোর তরুণ ও বয়স্কব্যক্তির জীবন পর্যালোচনা ক'রে দেখতে পেয়েছেন যে, শৈশবের শিক্ষার ত্রুটির ফলে এদের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে; সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের পথ না ধ'রে এদের অনেকে চুরিডাকাতি, জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কুটিল কুপথ অনুসরণ করে। এরূপ লোক পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সেবা ও স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে আনন্দময় জীবনযাপনের শিক্ষা পায়নি ; তারা অত্যন্ত স্বার্থপর এবং ক্ষুদ্রচেতা ; মানুষের সভ্যতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত সুশৃঙ্খল জীবন যাত্রার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নাই, তাই নিজের হীন স্বার্থের জন্য অপরকে আঘাত করতে বা বঞ্চিত করতে এদের মমতা জেগে ওঠে না, তার কারণ এরা চিরদিন কেবল নিজের স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখেছে, অন্যের দিকটা ভেবে দেখেনি।

মনের বিকৃতি

সরস উপযুক্ত মাটিতে পরিপক্ক বীজ থেকে জাত কোন গাছের চারা রোপণ করলে তা পুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠে। তার চারিদিক যদি ফাঁকা থাকে, সবদিক থেকেই যদি আলো বাতাস পাবার সুবিধা থাকে তবে সতেজ গাছটি সকল দিকেই ডালপালা বিস্তার ক'রে দেয়, তার বিকাশ হয় পরিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস ; যেমন দেখা যায় ফাঁকা জায়গার বটপাকুড় গাছ। কিন্তু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে কোন দিকে বাধা পেলে গাছ যে দিকে আলো পাওয়া যায় সেইদিকে বেঁকে যায় ; সমগ্র গাছের ঝোঁক যে আলোর দিকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আলোর দিকে বিকাশ গাছের ধর্ম বা স্বভাব।

মানুষের জীবধর্মেও রয়েছে এই বিকাশের প্রেরণা। কোন্ এক অজ্ঞাত রহস্যময় শক্তি প্রতিনিয়ত মানব দেহের স্ফুরণ ঘটাতে ঘটাতে তাকে এক নির্দিষ্ট আকার দান করছে। মানবদেহের বিকাশ যদি সুসমঞ্জস না হয়, কোন অঙ্গ যদি হয় বিকল বা পঙ্গু তবে দেখা যায় অপর কোন অঙ্গের বা ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। দেহ যেন এক অঙ্গের শক্তির অভাব অন্য অঙ্গের অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে পূরণ ক'রে নেয়। তাই দেখা যায় অন্ধের শ্রবণ শক্তি ও অনুভব ক্ষমতা প্রায়ই অন্যের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। বাহুবিহীন ব্যক্তি দুই পায়ের সাহায্যে দুই হাতের অভাব পূরণ করেছে, এমন কি পা দিয়েই বেহালা বাজানোতে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে এমন উদাহরণও আছে। গাছের মতই বিকাশধর্মী দেহ এক অঙ্গের অভাব ও দুর্বলতা অন্য অঙ্গের অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে পুষিয়ে নেয়।

দেহের এই ক্ষতিপূরণের ক্ষমতার পরিচয় আমরা চোখের ওপর দেখতে পাই। মানবমনেরও যে এই ক্ষমতা রয়েছে, মানুষের মন এক দিকে বিকাশে বাধা পেলে অন্য দিকে অতিরিক্ত বিকাশ ঘটিয়ে যে তা পূরণ ক'রে নেয় মনোজগতের এই তথ্যটির ওপর আলোকপাত করেছেন ভিয়ানার চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী ডক্টর আলফ্রেড অ্যাড্‌লার। মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি তাদের শৈশব ও বাল্যজীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করতে থাকেন এবং সকল ক্ষেত্রেই দেখতে পান যে, তাদের রোগের বা মানসিক বিকৃতির মূল কারণ নিহিত রয়েছে বাল্যের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ও

পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে। একদিকে বাধা পেয়ে গাছ যেমন অন্যদিকে বেঁকে যায়, এক প্রত্যঙ্গের হীনতা যেমন দেহের অন্য প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি দ্বারা পূরণ ক'রে নেয় তেমনি মানুষের মন তার একদিকের দীনতা পূরণের জন্য অপর দিকে এমন কতকগুলি মানসিক বৈশিষ্ট্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায় যার সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে সে ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের ওপর। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

হীনম্মন্যতার প্রকাশ

কর্মজীবনে, অন্যের সঙ্গে আচরণে অহংবোধকে তৃপ্ত করার কামনা মানুষের মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে থাকে। অহং তার কাছে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে প্রিয় ; অহংবোধ ক্ষুণ্ণ হ'লে তীব্র ব্যথার সঞ্চার হয় তার মনে। আত্মদীনতার ভাব ঢাকা দেবার জন্য আত্মগৌরব দেখানোর দিকে তার ঝোঁক পড়ে বেশী। অপরের সঙ্গে তুলনায় সে যদি নিজের দীনতা বুঝতে পারে কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার মত মানসিক উদারতা যদি তার না থাকে তবে সে আত্মপ্রাধান্য প্রকাশের জন্য অধীর হয়ে উঠবে। এরূপ লোক আত্মসম্মান সম্বন্ধে হয় অতিরিক্ত সচেতন, তার কেবলই মনে হয় অন্যে বুঝি তাকে হীন মনে করল তাকে বুঝি অসম্মান করল। এর কারণ, নিজের দীনতা সম্বন্ধে অন্তরে অন্তরে সে সচেতন কিন্তু অন্যের কাছে তা মানতে রাজী নয়। বয়স্কব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই হীনম্মন্যতা আত্মপ্রকাশ করে যে, অনেক সময় সাধারণ লোক এর আসল কারণ ধরতে পারে না, যেমন কোনব্যক্তি যখন অপরের অযথা নিন্দা করে, অন্যের যথার্থ গুণের যোগ্য সমাদর করতে কুণ্ঠা বোধ করে, অপরের বিরূপ সমালোচনা ক'রে নিজের গুণপনা ফলাও করে তখন বুঝতে হবে হীনম্মন্যতা তার মনের গভীরে বিদ্যমান থেকে অন্যদিকে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চার করেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন প্রকার বিকলতা না থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যক্তি অনেক সময় তোতলামি ক'রে থাকে। দাম্ভিক ও বদরাগী—এই হল তার স্বভাবের বিশেষণ। জীবনে যারা কৃতিত্ব বা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি তাদের মধ্যেই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বেশী। আত্মদীনতা থেকেই যে এরূপ আচরণের উৎপত্তি তা অনেক সময় তাদের সজ্ঞান মনে জানা থাকে না।

বয়স্ক ব্যক্তির জীবনে

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিবেচনা করবার আছে। কোন ব্যক্তির মধ্যেই মানুষের যাবতীয় গুণের পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটে না। কাজেই মনে হতে পারে সকল মানুষেই কিছু-না কিছু হীনম্মন্যতা দেখা যাবে ; কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে-স্বাভাবিক শক্তিকে মানুষ অন্তরের প্রীতিরস দিয়ে বিকাশ ক'রে তোলে তাকে কেন্দ্র ক'রেই তার অহংবোধ প্রবল হয়ে ওঠে ; সেটি তৃপ্ত হলেই সে খুশী, অন্য গুণ নিয়ে পাল্লা দিয়ে হারলেও কষ্ট নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র আমার চেয়ে গল্প লেখেন ভাল কিন্তু আমি তাঁর চেয়ে ভাল কবিতা লিখি। এই একটি কথায় কবির আত্মদীনতামুক্ত উজ্জ্বল বলিষ্ঠ মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

শিশুর জীবনে আত্মদীনতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। সে নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন, বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনায় নিজের অসামর্থ্য সে বুঝতে পারে এবং মনে মনে কামনা করে দাদা বাবার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে। শিশু যদি পরিবারের অন্য শিশুর তুলনায় লাঞ্ছিত অবহেলিত হয়, তার অহংবোধ যদি নিপীড়িত হয় তবে বিকৃত উপায়ে সে এর পূরণ করতে চেষ্টা করে ; সে তখন এমন সব আচরণ করতে থাকে যাতে বয়স্ক ব্যক্তিরা তার প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে বাধ্য হয় ; অবিরত অন্যের নামে নালিশ ও উৎপাত, একগুঁয়েমি, রাগ, মিথ্যাকথা বলা, চুরি করা—এগুলি হল তার আচরণের সক্রিয় দিক ; নিষ্ক্রিয় দিকে দেখা দেয় অমনোযোগ, কোন কিছু শেখার অসামর্থ্য, বিস্মৃতি, উৎকণ্ঠা, ভয়, লজ্জা, নির্জনতাপ্রীতি। মনোবিজ্ঞানী বলেন, বালক যখন ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করতে সুরু করে তখন বুঝতে হবে এই বিকৃত উপায়ে নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজের প্রতি অন্যের মনোযোগ ও পরিচর্যা আদায়ের পন্থা গ্রহণ করেছে।

শিশুর জীবনে

মানসিক বিকৃতির কারণ

বালক কিশোর ও বয়স্কব্যক্তির জীবনে যদি কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় এবং তা আকস্মিক ব্যাপার না হয়ে যদি আচরণের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় তবে বুঝতে হবে তার প্রকৃত কারণ নিহিত রয়েছে জীবনের মূলে। শৈশবে শিশু যেরূপ আচরণ পায়, যেরূপ পরিবেশে লালিত পালিত হয় তার ছাপ থেকে যায় তার জীবনে। শৈশবে তার জীবনবিকাশে কোন

প্রতিবন্ধক এলে তা তার মানসিক গঠনকে বিকৃত ক'রে দেয়; সে-প্রভাব কাটিয়ে জীবনকে আবার স্বাভাবিক সুস্থ ক'রে তোলা কঠিন হয়ে ওঠে। ডক্টর অ্যাড্‌লার মানসিক বিকৃতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভিন্ন বয়সের বহু মনোরোগীর জীবন ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে, শৈশবকালীন শিক্ষার ত্রুটিই মনের সুস্থ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। শিশুর জীবনে এই ত্রুটি বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে, যেমন ঃ

১। দৈহিক বিকলতা
২। শৈশবে অতিরিক্ত আদর
৩। অতিরিক্ত কঠোরতা
৪। অবাঞ্ছনীয় পারিবারিক পরিবেশ

এই কারণগুলি কিভাবে মানুষের মনকে পঙ্গু করে এবং একদিকের ক্ষতি অন্যদিকের বৃদ্ধি দ্বারা পূরণ ক'রে নেয় তা আলোচনা করা যাক।

দৈহিক বিকলতা

শিশুর অহংবোধ যখন জাগরিত হয় তখন সে নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে, দৈহিক শক্তি ও প্রতিপত্তিতে বয়স্কব্যক্তিদের মত হবার কামনা জাগে তার মনে। কিন্তু দেহ যদি তার হয় চিরপঙ্গু, কোন অঙ্গ যদি হয় একেবারে বিকল, ও অকর্মণ্য, কিংবা তার আকৃতি যদি হয় কুৎসিৎ কদাকার তবে মানসিক সুস্থতা লাভ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যার অভাব সে অনুভব করে তা পূরণ করে কল্পনায়, উৎকট মনোবিলাসে। আত্ম-শক্তির দীনতা তার কাছে কষ্টদায়ক; অন্য সুস্থ সবল বালক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের তুলনায় সে যে নিকৃষ্ট সে বোধ তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট ক'রে ফেলে। দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষা ও রঙিন দিবাস্বপ্ন—এই হয় তার প্রধান অবলম্বন এবং কর্মজীবনে সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়।

অতিরিক্ত আদর

কতক পিতামাতা সন্তানের প্রতি ভ্রান্ত স্নেহের বশে আদরের আতিশয্য দেখিয়ে তাদের স্বভাব বিকৃত ক'রে তোলেন। এই সব আলালের ঘরের দুলালরা জেদী, স্বার্থপর, কাজকর্মে অপটু, ক্ষুদে অত্যাচারী হয়ে ওঠে।

শৈশবে ও বাল্যে কোন কামনা বাসনাই যদি মানুষের অপূর্ণ না থাকে, পিতামাতা যদি তাদের সকল অভাব, সকল দাবীই পূরণ করেন তবে তাদের সংযম শিক্ষার সুযোগ আসে না। পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন তারা বৃহত্তর সমাজের কর্মক্ষেত্রে উপনীত হয় তখন তারা নিজেদের অসহায় ও অবহেলিত মনে করে, কেননা কর্মক্ষেত্রে স্নেহান্ধ পিতামাতার সাহায্য মেলে না ; সেখানে পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, সহযোগিতার ভিতর দিয়ে স্থান লাভ করতে হয়। মা-বাবার অতিরিক্ত আদরে যারা অকর্মণ্য হয়ে ওঠে তারা কেবল কামনা করে অন্যে তাদের সকল অভাব পূরণ করবে, তাদের সেবা করবে, তাদের অহংবোধ তৃপ্ত করবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তখন অন্যের সঙ্গে তুলনায় আত্মশক্তির দীনতা উপলব্ধি ক'রে অন্তরে অন্তরে তারা সংকুচিত হয় কিন্তু হামবড়া ভাব ছাড়তে পারে না। এই মানসিক দ্বন্দ্ব তাদের সুস্থ জীবনবিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

অতিরিক্ত কঠোরতা

এ অবস্থা হল অতিরিক্ত আদরের বিপরীত অবস্থা। অনেক পরিবারে শিশু স্নেহহীন, প্রীতিহীন কঠোর শাসনের ভিতর দিয়ে শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করে। তাদের জীবন হয় নিরানন্দ ; ভয় তাদের মনের ওপর সব সময় একটা কালো ছায়ার মত বিরাজ করে, কামনা বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে, অনেকে মানসিক গুণ বিকাশের সুযোগ পায় না। ভারী জিনিস দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলে চারাগাছ যেমন স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, তার বৃদ্ধি হয় বিকৃত, তেমনি কঠোর নিপীড়নের মধ্যে শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক হতে পারে না। অতিরিক্ত আদুরে বালক নিজের চেষ্টায় কোন গুণের বিকাশ ঘটায় না কিন্তু অহংকারী হয়ে ওঠে ; অতিরিক্ত কঠোর শাসনের মধ্যে প্রতিপালিত বালক আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে পারে না এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তার ফলে কর্মজীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য যখন আত্মনির্ভরতা, উৎসাহ ও উদ্যম প্রয়োজন তখন সে পড়ে পিছিয়ে। জীবন সংগ্রামে সে নিজেকে মনে করে পরাজিত ও লাঞ্ছিত।

অবাঞ্ছিত পারিবারিক পরিবেশ

পরিবার বা গৃহ শিশুর জীবনগঠনের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান স্থান। প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি মানবশিশুটি ক্রমবৃদ্ধির পথে নিজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে ; এর জন্য সে অন্য কারো ওপর নির্ভর করে না। এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই সে নিজের জীবনের কাঠামো গ'ড়ে তোলে। শিশু যা দেখে, যেরূপ ব্যবহার লাভ করে, পরিবারের অন্যান্য সকলকে যেরূপ আচরণ করতে দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই তা তার মনে ছাপ রেখে যায়। গৃহে যদি পরিজনদের স্নেহ প্রীতি, সহযোগিতা, আন্তরিকতা, উপযুক্ত শাসন না থাকে তার জীবন ছন্নছাড়া হয়ে উঠে। সংসারে যদি তার মা বাবা বা অন্যদের মধ্যে মনোমালিন্য, ঝগড়াঝাটি থাকে তবে শিশুর চোখে তা এড়ায় না। এরূপ পরিবেশে শিশু অস্বস্তি বোধ করে, কোন বিষয়ে একাগ্রতার সঙ্গে মনোনিবেশ করতে পারে না। তার বাবা যদি হয় মাতাল মিথ্যাবাদী বা দুষ্ট প্রকৃতির কিংবা তার মা যদি হয় মুখরা কলহ পরায়ণা এবং তাঁদের মধ্যে যদি প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে তবে পিতামাতার দ্বন্দ্ব সন্তানের মানসক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। যাঁদের ওপর শিশু সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে, যাঁদের আচরণ থেকে সে অভ্যাস করে নিজের আচরণ সেই পিতামাতার জীবনে যদি শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভব্যতা না থাকে তবে তার মানসিক বিকাশে যে বিঘ্ন ঘটবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

কিশোর ও তরুণ

কৈশোর মানুষের জীবনে দিবাস্বপ্নের যুগ। এ স্বপ্নে বাস্তব কামনা বাসনার রঙিন ছায়া মনের ওপর মোহজালে বিস্তার করে। শৈশবে ও বাল্যে যে শিশু রূপকথা আর রোমাঞ্চকর কাহিনীর দিকে আকৃষ্ট হত, তাতে আর তরুণ তেমন আনন্দ পায় না। দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে সে তখন এমন এক অবস্থায় এসে পৌছে যখন শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সে নিজিকে বিলিয়ে দিতে চায় সমাজের কাজে। গুটিপোকা স্বরচিত ক্ষুদ্র গুটি কেটে বেরিয়ে এসে উদার আকাশের তলে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উড়ে' বেড়ায় গাছে গাছে, ফুলে ফুলে, বাল্যের সংকীর্ণ পারিবারিক গণ্ডী পার হয়ে তরুণও তেমনি বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এসে পড়ে। শৈশবে সে নিজেকে খাপ খাইয়েছে পারিবারিক জীবনের সঙ্গে, কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে তাকে খাপ খাওয়াতে হয় বৃহত্তর সমাজের ধারার সঙ্গে, সমাজের অপর লোকের সঙ্গে। এ যুগের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

দিবাস্বপ্ন

তরুণ স্বপ্ন দেখে ভবিষ্যৎ জীবনের। সে যা হতে চায়, যা করতে চায়, যা পেতে চায় নিজেকে কেন্দ্র ক'রে কল্পনায় তারই ছবি আঁকে নিজের মনে। কেউ কল্পনা করে সে যেন সেরা খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছে—ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন যার যেটা ভালো লাগে সেই সেইটিতেই যেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে ; কেউ ভাবে সে যেন বক্তা লেখক হিসাবে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে, কত তার সুনাম, কত তার সম্মান ! কেউ ভাবে সে হয়েছে দেশ-আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক, উচ্চপদস্থ চাকুরে, শাসক ; কেউ ভাবে স্কলারশিপের পর স্কলারশিপ পেয়ে সে শ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে যশের শিখরে উঠেছে, একটি সুন্দরী তনুদেহা কিশোরী যেন তাকেই চায় তার সমস্ত অন্তর দিয়ে—তাকে ছাড়া আর কাউকে নয় ! কিশোরীর মনেও চলে এমনি দিবাস্বপ্নের লীলা ; সে ভাবে এমন সৌন্দর্য ফুটে উঠবে তার দেহে, তার টানা কাজলকালো চোখে, তার দীর্ঘ গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের রাশিতে যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। কামনা করে সে মনের মত সাজানো বাড়িঘর,

ঘরে ফুলের মত সুন্দর শিশু ; সে-সবই তার নিজস্ব ; সেখানে সে কর্ত্রী, তার হুকুমেই সব চলে।

যৌন পরিণতি

বাল্যে দেখা যায় বালক বালকদের সঙ্গে মেশে, বালিকা তার সমবয়সী বালিকাদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করে। এ সময় তাদের প্রীতি স্বজাতীয়ের প্রতি। বালকেরা পরস্পরের সঙ্গে মিতালি করে, বালিকারা পরস্পরের মধ্যে সই সম্বন্ধ পাতে। কৈশোর পার হয়ে এলে এই প্রীতির আদান প্রদানের ব্যাপারে ওলটপালট ঘটে' যায়। তরুণ তার বন্ধুর চেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয় কিশোরীর দিকে, তরুণীর তার সই এর প্রতি আকর্ষণ যায় ক'মে, সে কামনা করে পুরুষের সঙ্গ। মিতায় মিতায় প্রাণের মিল ঢিলে হ'য়ে যায় ; সই 'গঙ্গাজল' এর আবেগ শুকিয়ে আসে।

সমাজ সেবা

তরুণের মানসিক যুগ উন্মাদনার যুগ। সংসারে বাস্তব জীবনের সম্মুখীন সে হয়নি, জীবনে ব্যর্থতার আঘাত খেয়ে তার প্রাণের আবেগ কোথাও রুদ্ধ হয়নি, নিজের স্বার্থকে সে বড় ক'রে দেখতে শেখেনি। সমাজের কল্যাণকর কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, রাজনৈতিক উত্তেজনায় সহজে সাড়া দেয়, পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপন ক'রে, সমবয়সীদের সঙ্গে মিশে পরিশ্রমের কাজে আনন্দের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করে ; সাহিত্যবাসর, শিল্পসংগীত চক্র গ'ড়ে তোলে। কেউ বা আকৃষ্ট হয় আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে। প্রাণের আবেগকে উর্ধ্বমুখী ক'রে তারা ত্যাগ ও দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে ধর্মজীবনে সাফল্য লাভ করতে চায়। তরুণের অন্তরে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়েছে কিন্তু সে-শক্তির সীমা কতদূর তা সে বুঝতে পারেনি। প্রাণের আবেগে সে ছুটে যেতে চায় সর্বত্র। স্বপ্নভঙ্গের পর উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের মত তরুণের অন্তরের অন্তস্থল হতে চিরনবীন চির মোহময় সুর ধ্বনিত হয় ঃ

এত কথা আছে, এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥

সমাপ্ত

বিষয় সূচী

আপনি নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কি সেখানে রয়েছে কী রহস্যময় জগৎ? নিয়ত সেখানে কামনা বাসনা উঠছে বুদ্‌বুদের মত, কথার খই ফুটছে যেন! আমাদের আচরণের গোপন উৎস কোথায়...ভয় ক্রোধ, কৌতূহল যৌন-প্রবৃত্তি কী প্রভাব বিস্তার করে আমাদের জীবনে...আমরা হাসি কেন...শিশুর জীবনবিকাশ কি ভাবে ঘটে,...শিশুকে মানুষ করে তুলতে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কি কি জানা আবশ্যক...এ সব কথা ও আরো অনেক কথা গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন তাঁর নিজস্ব সরস রচনা-শৈলীতে।

* * *

হঠাৎ-আবেগের-ঝলকানি-লাগা আচরণ ছাড়াও আমরা মানুষের আচরণে একটা স্থায়ী নিত্যকার রূপ দেখতে পাই...এই মানসিক গঠনকে বলি মেজাজ। মেজাজ সব মানুষের এক রকম নয়—কতকের আছে খোশমেজাজ; তারা আশাবাদী, জীবনের উজ্জ্বল দিকটা দেখে; কতক আবার নৈরাশ্যবাদী, গম্ভীর, বেশী-মাত্রায় চিন্তাশীল।...আপনি কোন্ দলে? ...নিজেকে জানার এবং সেই জানার আলোকে অপরকে বুঝবার ইঙ্গিত পাবেন এ বইতে।

* * *

কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড।
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২